সাহেবধনী সম্প্রদায় তাদের গান

সুধীর চক্রবর্তী

পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা-৯

SAHEBDHANI SAMPRADAYA TADER GAN

[A study of the Sahebdhani sect and their songs]

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৮৫

প্রকাশক
অনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
সুনীল চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ
বিজন ভট্টাচার্য

মুদ্রক
এস. সি. গাতাইত
দি বি. জি. প্রিণ্টার্স
১৯ গোয়াবাগান স্ট্রিট
কলকাতা ৭ ০০০৬

উৎসর্গ

দীর্ঘদিনের সাহিত্যসঙ্গী ও অভিভাবক

শ্রীঅজিত দাস

অগ্রজপ্রতিমেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই

রবীন্দ্রনাথ : মনন ও শিল্প (সম্পাদিত)

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ও মৃৎশিল্পীসমাজ

গানের লীলার সেই কিনারে

(রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে নিবন্ধ সংকলন)

অধ্যায়ক্রম

গান

স্বীকৃতি

❏ কুবির গোঁসাইয়ের গানের পুথি ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছেন :

শ্রীরামপ্রসাদ ঘোষ। বৃত্তিহুদা। নদীয়া।

❏ যাদুবিন্দু গোঁসাইয়ের গানের পুথি ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছেন :

স্বর্গত দেবেন্দ্রলাল গোস্বামী। পাচলখি। নসরৎপুর। বর্ধমান।

❏ সাহেবধনীদের গুপ্তমন্ত্র ও গুহ্যতত্ত্বের পুথি ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছেন :

স্বর্গত শরৎচন্দ্র পাল। বৃত্তিহুদা। নদীয়া।

❏ কর্তাভজা গুরুবংশের বিস্তারিত বংশতালিকা প্রণয়ন করে দিয়েছেন :

শ্রীসত্যশিব পাল দেবমহান্ত। ঘোষপাড়া। কল্যাণী। নদীয়া।

❏ সাহেবধনীদের কবচ তাবিজের ব্লক ব্যবহার করতে দিয়েছেন :

শ্রীনির্মালা আচার্য। সম্পাদক : 'এক্ষণ'। কলকাতা ৭০০০০৯

❏ গবেষণার ব্যয় নির্বাহের আর্থিক সহায়তা করেছেন : ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ। নয়া দিল্লী ১।

❏ গ্রন্থমুদ্রণের আংশিক অর্থসহায়তা করেছেন : তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার। মহাকরণ। কলকাতা ৭০০০০১

❏ আলোকচিত্র তুলেছেন : শ্রীদীপক ভট্টাচার্য ● শ্রীসত্যেন মণ্ডল

❏ মানচিত্র এঁকেছেন : শ্রীমিলনেন্দু বিশ্বাস

সাহেবধনী সম্প্রদায় সম্পর্কে গবেষণা করার
বিশেষ অনুমতি পত্র

আমি শ্রীশরৎচন্দ্র পাল, গ্রাম বৃত্তিহুদা, পোঃ তালুকহুদা, থানা চাপড়া, নদীয়া সাহেবধনী ঘরের সেবাইতরূপে এতদ্দারা ঘোষণা করিতেছি যে, অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী (কৃষ্ণনগর কলেজ, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া) আমাদের সম্প্রদায় সম্পর্কে গবেষণা করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ অধিকারী। আমাদের ধর্মসংক্রান্ত তথ্যাদি ও ৺কুবির গোঁসাইয়ের গীতাদি প্রকাশের অনুমতি তাঁহাকে স্বেচ্ছায় দিলাম।

ইতি

শ্রীশরৎচন্দ্র পাল

২২.৭.৭৩

আত্মপক্ষ

সাহেবধনী সম্প্রদায় এবং তাদের গান সম্পর্কে লেখা এই বই আলাদাভাবে আত্মপরিচয় দাবী করে না; কেননা বইটি আদ্যন্ত পড়লেই এর উদ্দেশ্য আর বক্তব্য খুব স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে। তবু যে এই ভূমিকার অবতারণা করতে হ'ল তার কারণ কিছু ঘটনা ও দৃষ্টিভঙ্গীগত অনুপুঙ্খ বোঝানো। সেই সঙ্গে এই বিচিত্র বিষয়ে বই লেখার পেছনের কারণটাও জানানো জরুরী। আমি আগাগোড়া সাহিত্যের ছাত্র এবং বাংলা গান সম্পর্কে উৎসাহী। লক্ষ করেছি, বাংলা ভাষায় লোকসংগীতের যত সংকলন বেরিয়েছে অথবা লোকসংগীত সংক্রান্ত প্রবন্ধ পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে তাতে নানা সীমাবদ্ধতা আছে। সেই সীমাবদ্ধতার একটা বড় দিক হ'ল সংকলনকর্তা বা লেখকদের গানবিষয়ে অজ্ঞতা। তাই লোকসংগীত এদেশে সাহিত্যরূপেই শুধু পাঠ্য কিংবা বিষয়গতরূপেই বিবেচ্য। কিন্তু গানের ভিতর দিয়ে খোঁজ করলে লোকজীবনের অন্তরে একটা আলাদা ইতিহাস, বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতার একটা নতুন বিশ্ব উঁকি দেয়। ১৯৬০ থেকে ১৯৮৪ এই চব্বিশ বছর ধ'রে আমি খুব ঘনিষ্ঠভাবে বাংলার গ্রাম্য-গানের অতলে নেমে খুঁজে পেয়েছি এমন সব জীবনসত্য আর অভিজ্ঞতার দিকদর্শন, যা আমার পুথিপড়া-জীবনের সংকীর্ণতাকে বারে বারে ভেঙে দিয়েছে।

এই ভাঙন শুধু যে আমার বিশ্বাস আর অহমিকার সীমায়িত জগৎকে ভেঙেছে তাই নয়, ভেতরে ভেতরে গ'ড়ে তুলছে এক সমান্তরাল অস্তিত্বের প্রত্যয়। এই ভাঙা গড়ার কাজে আমার দুটো সুবিধা ছিল। প্রথমত, যখন স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পড়েছি, দীর্ঘকাল আগে, তখন লোকসাহিত্য পাঠ্য হয়নি, ফলে লোকজীবন বিষয়ে কোনো পুথিপড়া-ভাষ্য বা মেথডোলজির যান্ত্রিকতা

আমাকে গ্রাস করেনি। সেইজন্যে আমি একেবারে খোলা মনে আর সাদা চোখে গ্রামে ঢুকে পড়েছিলাম। কোনো জানা-তত্ত্বের আদলে আমাকে তথ্য সাজাতে হয়নি, বরং পুঞ্জিত তথ্য থেকে স্বতই গড়ে উঠেছে কিছু নতুন তত্ত্ব যা আগে বুঝিনি বা শুনিনি। দ্বিতীয়ত, চিরকালের বাংলা গানের ধরন আর গড়ন সম্পর্কে আমার একটা স্পষ্ট ধারণা ছিল ব'লে গ্রাম্য-গান মাত্রকেই আমি লোকসংগীত বলে মেনে নিতে পারিনি। মনসুরউদ্দিনের 'হারামণি', মতিলাল দাসের 'লালন গীতি', উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' কিংবা আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলার লোকসংগীত রত্নাকর' সংকলনের অন্তর্ভুক্ত বিপুল সংখ্যক গান যে আসলে লোকসংগীতই নয়, বরং ধর্মসংগীত, সেসব আমি ক্রমশই বুঝতে আরম্ভ করি। তখনই আমি ধরতে পারি, আমাদের দেশে বাউল সুর বলে যে-কথাটা প্রচলিত আছে তার সংজ্ঞা খুব ধূসর। রাতের পর রাত গ্রাম্য-গানের আসরে ব'সে মাঝে মাঝে এমনও মনে হয়েছে গ্রামের সাধারণ অশিক্ষিত মানুষ যেমন ক'রে আগ্রহ নিয়ে গানগুলি শুনছে বা রস পাচ্ছে, গান জেনে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ তকমাধারী হয়েও আমি তেমন ক'রে গানগুলি বুঝছি না, ধরতে পারছি না তার রহস্য।

ফলে পাঁচবছরে কায়ক্লেশে প্রায় তিনহাজার গান সংগ্রহ করেও আমার এ অস্বস্তি কাটে না যে, গানগুলির অন্দরমহল আমার অজানাই রয়ে যাচ্ছে। আমি শুধু তার সাহিত্যিক ভাষ্য করে যাচ্ছি অথবা বিন্যাস করতে চাইছি তার কাব্যিক উৎকর্ষ, যা অন্যায়। ক্রমে বুঝতে পারি গানগুলির ভেতরে রয়ে গেছে নানা নিগূঢ় সাংকেতিকতা, বিশেষ গৌণধর্মের বিশ্বাস ও আচরণবাদ এবং সমাজ ইতিহাসের একটা স্তরান্বিত পরম্পরা। গ্রামভিত্তিক বাঙালীজীবনের গভীরে বহুদিন ধ'রে প্রবাহিত এক ভাবস্রোত যেন এসব গানের অন্তঃস্থল থেকে কেবলই আভা ছড়াতে লাগল। মনে হল আমাদের ইংরাজি বিদ্যালয়কেন্দ্রিক লেখাপড়া আর উচ্চ শ্রেণীর মানুষের লেখা অভিজাত শিষ্ট সাহিত্যপাঠের বাইরে একটা উদার আত্মনির্ভর অথচ প্রতিবাদী জীবনের ছক লুকিয়ে আছে। যারা এসব গান লিখেছে তারা প্রছন্ন, হয়ত খানিকটা ছদ্ম প্রচ্ছদের আড়ালে রয়ে গেছে আমাদেরই আশেপাশে।

এই সন্দেহ অথচ দৃঢ়বিশ্বাস থেকে শুরু হ'ল সত্তরের দশকে আমার অনুসন্ধানের দ্বিতীয় পর্যায়। যারা এসব গান লেখে, যারা গায়, যাদের সমবেত মনের ভাষ্য এসব গান—আমি খুঁজতে লাগলাম তাদের, সেই আত্মগোপনকারী

গৌণ ধর্মসম্প্রদায়গুলিকে। রবীন্দ্রনাথ, ক্ষিতিমোহন থেকে শশিভূষণ দাশগুপ্ত পর্যন্ত মনীষা এদের গানে বেদান্ত মধ্যযুগের সন্তবাণী এমনকি হিন্দুমুসলমানের মিলনমন্ত্র খুঁজে পান কিন্তু খোঁজেন না সেই মানুষগুলিকে, যারা উচ্চবর্ণের নিষ্পেষণে ব্রাত্যজীবন মেনে নেয় যুগে যুগে, ঢুকে যায় সর্পিল পথে প্রত্যন্ত গ্রামের গুপ্ত সাধনমার্গে অথচ প্রতিবাদের শস্ত্রটি রাখে উদ্যত তাদের গানে গানে মনের মানুষের গভীর নির্জন পথের পথিক ব'লে তাদের শুধু শ্রদ্ধা জানালেই তো হবে না, সমাজ-ইতিহাসের কোন্‌খানে তাদের স্থান, আমাদেরআবহমান গ্রামজীবনের জনবিন্যাসে কেমন ক'রে তারা গজিয়ে ওঠে আবার মিলিয়ে যায়, এসবও তো দেখতে হবে। আমার বাড়ি নদীয়া জেলায়। ঘনিষ্ঠ আশ্লেষে যেহেতু জানি তার অনেক গ্রাম জনপদ, বেছে নিই তাই বিভাগপূর্ব নদীয়াজেলার পাঁচটি গৌণধর্ম আর তাদের গানের জগৎ। এই পাঁচটি গৌণধর্ম হ'ল : কর্তাভজা, সাহেবধনী. বলরামী, লালনশাহী আর খুশি বিশ্বাসী সম্প্রদায়। আশ্চর্য যে, লালনশাহী সম্প্রদায় বাদে বাকি চার সম্প্রদায় সম্পর্কে তথ্যানির্ভর প্রাথমিক কিছু প্রতিবেদন রয়ে গেছে একশো বছর আগে লেখা নানা বইয়ে, উইলসনের, যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের এবং অবশ্যই অক্ষয়কুমার দত্তের রচনায়। সেই প্রাথমিক প্রতিবেদন আর একশতাব্দী পরে এখন তাদের ভীরু ক্ষীয়মাণ অস্তিত্ব, এর মাঝখানে রয়ে গেছে নানা অনুমান আর কিংবদন্তী, মেলা আর পার্বণ, ব্রত মানসিক আর রোগ আরোগ্যের মিথ। অনুসন্ধানের এই পর্বে প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্ ডঃ সুরজিৎ সিংহ নিতান্ত স্নেহবশে নৃতত্ত্বে অদীক্ষিত মূলত সাহিত্যের ছাত্র আমার দিকে এগিয়ে দিলেন আনুকূল্যের হাত। দিল্লীর ICSSR সংস্থা থেকে এনে দিলেন সচ্ছল এক গবেষণা-অনুদান। শুরু হ'ল পাঁচবছরের পরিক্রমা, নদীয়া মুর্শিদাবাদ আর বর্ধমানের অগণন গ্রামে আর মেলা মহোৎসবে, এমনকি অখণ্ড নদীয়ার সেই সব অংশে (মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া) যা এখন বাংলাদেশভুক্ত।

ICSSR-এর পূর্বশর্ত অনুসারে ১৯৭৮ সালে 'Minor Religious Sects of Nadia' শিরোনামে এক প্রকল্প-প্রতিবেদন ইংরাজিতে লিখে জমা দেওয়া গেল এবং তাঁরা সে-প্রতিবেদন ছাপলেন। কিন্তু সমগ্র অনুসন্ধানের ভেতরের সত্য নির্যাসটুকু এবং এসব সম্প্রদায়ের গড়ে-ওঠার নেপথ্যভূমিকে সাবলীল বাংলাভাষায় আলোকিত করার একটা ব্যাপক ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে গেল সেসময়ে। বর্তমান রচনা সেই অপূর্ণ ইচ্ছার একটি সামগ্রিক রূপায়ন। তবে অনুসন্ধানের ব্যাপকবৃত্তের অন্তর্গত পাঁচটি সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে এখানে বেছে নেওয়া হয়েছে

একটি মাত্র সম্প্রদায় 'সাহেবধনী' এবং তাদের গান। তাতে অসম্পূর্ণতা নেই, কেননা অন্যান্য সম্প্রদায়গুলির ইতিহাস, আচরণ ও বিশ্বাসের আলো ফেলেই উদ্ভাসিত করা হয়েছে সাহেবধনীদের বিচিত্র জগৎ।

এ বই সাহিত্য সংস্কৃতিকে ধরতে চেয়েছে সমাজ, ইতিহাস আর জনবিন্যাসের সূত্রে। লৌকিক ধর্মসম্প্রদায়কে বুঝতে চেয়েছে তাদের গানের চাবি দিয়ে। যুদ্ধবিগ্রহ সমাকীর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস রচনার অন্য বাঁকে সাধারণ মানুষের বেঁচে বর্তে থাকার একটা আলাদা স্পন্দন আছে। যার প্রতিফলন থাকে তাদের কবোষ্ণ গানে, লৌকিক মন্ত্রে, চিত্রিত শিল্পে বা মুখর প্রবাদে। ফরাসী ঐতিহাসিক ইউজিন ওয়েবার সম্প্রতি এমন ইঙ্গিত করেই বলেছেন যে, কৃষিজীবী মানুষের মনে প্রবেশ করবার অন্যতম পথ হ'ল গ্রামীণ গানের সূত্র। এই দৃষ্টি-ভঙ্গী থেকে দেখলে ধরা পড়ে যে, সাহেবধনীদের গানে রয়ে গেছে আঠারো শতক থেকে প্রবাহিত প্রচ্ছন্ন এক জনবিন্যাসের আলেখ্য। তাদের অস্তিত্ব ও সংগ্রাম, প্রতিবাদ ও পলায়ন, ধর্মগত শ্রেণীবিন্যাসের উল্টো ছক, কবচ-তাবিজ মন্ত্র-তন্ত্র আর সহজ প্রজননতত্ত্ব। সেই সব মিলিয়ে দেখে, বিশ্লেষণ ক'রে, এখানে লেখার চেষ্টা হয়েছে এক অন্য ইতিহাস, যাকে বলা যায় 'history from below'। সেই প্রয়াসে কেবলই দেওয়া-নেওয়া করতে হয়েছে প্রাসঙ্গিক নানা বিস্তার। সমাজতত্ত্বের সঙ্গে ইতিহাসের, সামাজিক নৃবিজ্ঞানের সঙ্গে জাতিতত্ত্বের, সাহিত্যের সঙ্গে সংগীতের। আধুনিক বিদ্যাচর্চায় এই অন্যোন্য বিনিময় যে খুবই সংগত, আত্মপক্ষে এই পর্যন্ত বলা যায়। কেমন ক'রে গ্রামীণ গবেষণার মালমশলা জুটে যায়, কোন্ অসম্ভাব্য নাটকীয় সমাপতনে হাতে এসে যায় গোপন পুঁথি, কতদিনের সদাজাগ্রত অভিনিবেশ পুরস্কৃত হয় গ্রাম্যগুরুর আকস্মিক সহৃদয়তায় এসব নেপথ্য কথা এ-বইয়ের যেসব উচ্চাভিলাষী পাঠক জানতে চান তাঁদের পড়তে অনুরোধ করি আমার অন্য একটি বড় লেখা। লেখাটি বেরিয়েছে এ বছরের (১৩৯১) শারদসংখ্যা 'এক্ষণ' পত্রিকায়, 'মনের মানুষের গভীর নির্জন পথে' শিরোনামে। সে-লেখাটি এই বইয়ের পরিপূরক অংশ।

বর্তমান বইটি রচনা ও প্রকাশের নেপথ্যলোকে অনেকগুলি সহৃদয় মানুষের সাহায্য ও সহানুভূতি রয়ে গেল। প্রথমেই উল্লেখ্য সাহেবধনী সম্প্রদায়ের স্বর্গত সেবাইত শরৎচন্দ্র পালের নাম। অগ্রদ্বীপের মেলায় বেশ ক'বছর দিয়েছেন অন্ন

ও আশ্রয়, বৃত্তিহুদার পাল বাড়িতে দেখিয়েছেন দীনদয়ালের ঐশী প্রকোষ্ঠ। বৃত্তিহুদাগ্রামের স্বর্গত দ্বিজপদ প্রামাণিক এবং তাঁর পুত্র আমার ছাত্র শ্রীমান্ তাপস প্রামাণিক আমাকে অনেকবার সহৃদয় আতিথ্যে তাঁদের বাড়িতে আহার ও আশ্রয় দিয়েছেন। ঐ গ্রামের স্বর্গত সুশান্ত কর্মকারের সক্রিয় সাহায্যে আমি কুবির গোঁসাইয়ের গানের সমগ্র খাতা পাই। খাতা দেন শ্রীরামপ্রসাদ ঘোষ। তাঁদের সাহায্য না পেলে এ বই লেখা যেত না।

বাংলাদেশের মেহেরপুরে আশ্রয় পাই শ্রীগোপাল ভট্টাচার্যের বাড়ি। কুষ্টিয়ার অধ্যাপক আনোয়ারুল করীম ও শ্রীমান্ আবুল আহসান চৌধুরী বই দিয়ে আর আলোচনা ক'রে সাহায্য করেছেন। ঘোষপাড়ার মেলায় সঙ্গ দিয়েছেন ডঃ সনৎকুমার মিত্র। আহার ও আশ্রয় দিয়েছেন সত্যশিব পাল দেবমহান্ত। নিশ্চিন্তপুরের গবেষণাকাজে আতিথ্য দেন বন্ধু বীরেন গাঙ্গুলী। গান জোগাড় ক'রে দিয়েছেন বহিরগাছি গ্রামের নুর ইসলাম মণ্ডল। গানের তত্ত্ব আলোচনায় সাহায্য পেয়েছি হাঁসপুকুর গ্রামের আবু তাহের ফকিরের কাছে। প্রাক্তন ছাত্র এবং ছাত্রপ্রতিম ডঃ শ্যামল রায়, শ্রীমান্ মিলনেন্দু বিশ্বাস, শ্রীমান্ রামকৃষ্ণ দে, শ্রীমান মনোরঞ্জন রায় ও শ্রীমান সুবীর সিংহরায় নানাস্তরের কাজে গ্রামে ও মেলায় ভ্রমণসঙ্গী ছিলেন। অজস্র গানের অনুলিখন করেছেন শ্রীশ্যামল রায় ও শ্রীমতী পম্পা তরফদার। সাহেবধনীদের সমাজতত্ত্ব ও ধর্মচিন্তা বিষয়ে নানা আলোচনায় এবং একটি বিশেষ গানের অর্থবোধে সাহায্য করেছেন শ্রীঅজিত দাস। গবেষণার নানা পর্যায়ে পরামর্শ দিয়ে এবং দিল্লীর জন্য ইংরাজি প্রতিবেদন লেখায় সাহায্য করেছেন একান্ত স্নেহভাজন প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান্ ধীরেন দেবনাথ।

বইটি প্রকাশের ব্যাপারে সবচেয়ে সাহায্য করেছেন সাহিত্য অকাদেমির আঞ্চলিক সচিব ডঃ শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়। প্রকাশের সামগ্রিক দায়িত্ব হাসিমুখে বহন করেছেন উদ্যমী প্রকাশক শ্রীমান অনুপকুমার মাহিন্দার। কলকাতা-কৃষ্ণনগর প্রুফ দেওয়া-নেওয়ার বিরক্তিকর কিন্তু দায়িত্বপূর্ণ কাজ করেছেন প্রাক্তনছাত্র শ্রীমান আশিস ভট্টাচার্য ও শ্রীমান প্রবীর বসু এবং সহকর্মী ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

রামচন্দ্র মুখার্জি লেন কৃষ্ণনগর। ৭৪১১০১ — সুধীর চক্রবর্তী

আঠারো শতকের নদীয়ায় ধর্মকেন্দ্র

সাহেবধনীদের উদ্ভব কেন্দ্র

বাণ কুভান লাগেনা এবং লাগিলে আরোগ্য হয়

ওঁ রাম	ওঁ সীতা
শ্রী হনুমান	ওঁ লক্ষণ

তারকব্রহ্ম কবচ স্বপ্নদোষ নাশ হয়

স্ক	স্ক	স্ক	স্ক
শং	শং	শং	শং
হ্রুং	হ্রুং	হ্রুং	হ্রুং
রং	রং	রং	রং

কালদৃষ্টি ছাড়ে তাহার কবচ

১	৮	হুঁ	৪
১৩	৩২	০	৩০
৭	৩০	৩৩	বল
১৩	৩	৪	১

শত্রু ক্ষয় হয়

হ্রিং দিনাদয়াময় সাহেবধনি তোয়াবানাক্ত সত্ত জাপ ৩ বার

হু	হু	হু
ওঁ	ল	অ

স্বামী ভালবাসে

মায়াধরার কাগজ

১০	৫৬	৯
১৫	২	২৪
২১	২২	১৭

পিরিতি লাগে

১১	৮	।৴	৯০
দ্দ	৶৮	৬	৩
৭	২	৯০	দ্য৮
দ৵	১৫	৫	৪

পিরিতি ছাড়ে

সাহেবধনীদের কবচ তাবিজ

নবদ্বীপের মেলায় সাহেবধনী ফকিরের আস্তানার পথ

সাহেবধনী ফকির। তাকে ফকিরিমতে [illegible]

রামলাল সেনের অক্ষরলিপির কুড়িটি চিত্র

যাদুবিন্দুর পাণ্ডুলিপি [দ্র. পৃষ্ঠা ১২৩]

'পিতা আল্লা মাতা আহ্লাদিনী'

'সাহেবধনী' বাংলার এক লোকধর্মসম্প্রদায়ের নাম, যাদের উদ্ভব নদীয়া-জেলার দোগাছিয়া-শালিগ্রাম অঞ্চলে আঠারো শতকের গোড়ায়। ঐ সময় বা তার কিছু পরে নদীয়া-যশোহর-মুর্শিদাবাদ-বর্ধমান-হুগলী এই বিস্তৃত জনপদের অনেক অখ্যাত গ্রামে গ'ড়ে উঠেছিল নানা গৌণ ধর্মসম্প্রদায়। যাদের সাধারণ আদর্শ ছিল পরিত্রাতা শ্রীচৈতন্য ও তাঁর উদার বৈষ্ণব মত, যাদের ধর্মসাধনায় কমবেশি প্রভাব পড়েছিল সুফিতত্ত্ব ও ইসলামি বিশ্বাসের, যাদের আচার ও শাস্ত্রদ্রোহে স্পষ্টত বাউলমতের সংক্রাম ছিল। কথাগুলি যত সহজে বলা গেল তত সহজে প্রমাণসিদ্ধ করা কঠিন, কেননা বর্তমানে আমাদের দেশে লোক-সংস্কৃতি-চর্চা এমন এক তরল জনপ্রিয়তায় পর্যবসিত হয়েছে এবং সহজিয়া, সুফি, বাউল, রেলিজিয়াস সেক্ট্, ফকিরিতত্ত্ব ইত্যাদি শব্দ নানা প্রবন্ধে ও বইয়ে এমন বিবেচনাহীনভাবে ব্যবহার হচ্ছে যে ঐসব শব্দ বা গৌণ ধর্মবিশ্বাসের সত্যিকারের মর্ম ও ধারণার ব্যাপ্তি অনেকসময়ই অস্পষ্ট থেকে যায়। আমাদের দেশের হিন্দু মুসলমান খৃস্টান জাতীয় বড় বড় ধর্মসম্প্রদায়গুলির (যাদের প্রধান লক্ষণ শাস্ত্রনির্ভরতা) বাইরে বহুদিন থেকে অনেক ছোট ছোট ধর্মসম্প্রদায় তৈরি হয়ে উঠেছিল। তার সবটাই দ্রোহ থেকে জন্ম নেয়নি। অনেকটাই পাল্টা চিন্তা থেকে এসেছে, অনেকটা গড়ে উঠেছে শাস্ত্রের বদলে গুরুবাদকে প্রাধান্য দিতে। কিংবা অন্ত্যজ ব্রাত্য অনেক সাধারণ গ্রাম্য মানুষ একসময়ে তাদের সমাজ বা অর্থনীতির বিপন্ন সময়ে হয়ত বড় ধর্মের কাছে পায়নি আশ্রয়, এমনকি সাধারণ মানবস্বীকৃতি। তাই সম্ভবত অনেকটাই নিজেদের বাঁচাতে আত্ম-নির্ভরতার কারণে গড়ে নিয়েছে নিজেদের ধর্ম, নিজেদের আচার আচরণ বিশ্বাস মন্ত্র ও গুরু। এরা সমাজের মূল জনস্রোতের তালে নিজেদের মিশিয়ে দিয়ে-ছিল তাই সহসা তাদের সনাক্ত করা যেত না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তাদের একটা নিজস্ব লয় ছিল যা গোপন। নিরাপত্তার কারণেই এই গোপনতা। আলাদা অঙ্গচিহ্ন, আলখাল্লা বা তসবী এরা অনেকেই ব্যবহার করত না। অন্তঃশীলভাবে এরা সম্প্রদায়ীদের ভেতরে আচরণ করত নিজেদের গুপ্তসাধনা, যার সব শেষ স্তরে ছিল নরনারীর মৈথুনাত্মক জটিল দর্শন। প্রারম্ভের সাধনা

ছিল নাম ও রূপ সম্পর্কে সম্যক প্রতীতি আনা, দেহ ও দেহজাত সব বস্তু (মল মূত্র রজ বীর্য) সম্পর্কে ঘৃণাবিহীন হয়ে-ওঠা, শাস্ত্র-মূর্তি-মন্ত্র ও জাতিবর্ণ সম্পর্কে প্রতিবাদী চেতনা জাগিয়ে তোলা, গুরু ও গুরুবাদ সম্পর্কে অভ্রান্ততার বোধ সৃষ্টি করা এবং ধর্মসাধনার ভিত্তিমূলে অনুমানের বদলে বর্তমানের আলো-ফেলা। 'অনুমান' বলতে বোঝায় কৃষ্ণ রাধা গোলক বৃন্দাবন মথুরা সখী এইসব, আর 'বর্তমান' মানে বাস্তব নরনারী, তাদের দেহ ও দেহধর্ম, কাম ও কাম থেকে উত্তরণ, রজস্রাব, প্রজনন ও তার নিবৃত্তির পথ। এই দেহের ভেতরকার সবকিছুকে তারা রূপক দিয়ে ঢেকে নিয়েছিল। মাটি আর বীজ, আগুন হাওয়া আকাশ জল, কাম আর প্রেম, জীবন মরণ, জমি আর কর্ষণ, নদী ও জোয়ার এমনই সব প্রতীকে ভরে ওঠে তাদের গান। লোকধর্মের এই আরেক সজীব দিক। তারা দুর্বোধ্য মন্ত্রে বা মহাপুরুষদের আপ্তবাক্য আউড়ে প্রায় কিছুই বলে না। বলে গানের মধ্যে দিয়ে সুরের সন্নিপাতে। রূপকে প্রতীকে মোড়া সেসব দুর্মর জীবনসত্যের গান সাধারণ মানুষকে নির্দেশ দেয় সঠিক পথের। তার মধ্যে যেটুকু নির্মাণের কৌশল তার গভীরে রয়ে যায় জীবন-অভিজ্ঞতার ছাপ, তাই শতাব্দীর পর শতাব্দী সেগুলি বয়ে চলে গ্রহণের স্রোতে। এই কারণেই একজন শীলিত পাঠক যদিওবা ক্লান্ত বোধ করে আধুনিক আর্টের কালপরিমিতিতে, ভাষণের শব্দ বৈপরীত্যে, একজন লোকগায়ক কখনও ক্লান্ত হয় না তাদের গানের উচ্চারণে। তাদের গানে ভরা থাকে পুঞ্জিত বিশ্বাস আর অনুশীলিত অভিজ্ঞতা। তার শক্তি রূপবন্ধে নয়, থীমে।

এই গানের ভিতর দিয়ে যদি লোকধর্মসম্প্রদায়গুলির দিকে নজর দেওয়া যায় তবে একথা স্পষ্ট হয় যে, প্রায় দুশো বছরের পুরানো এই সব অগণন ধর্ম-বিশ্বাসীরা যদিও ক্রমেই বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে আধুনিক নাগরিক ও যান্ত্রিক জীবনের অনিবার্য পেষণে, তাদের মন্ত্রতন্ত্র বিশ্বাস হয়ে যাচ্ছে অলৌকিক সামগ্রী, কিন্তু তাদের গানের মূল্য আর তাৎপর্য ক্রমেই বাড়ছে সমাজতাত্ত্বিকের চোখে, গবেষকের চেতনায়, সাহিত্যের আঙিনায়। এ ব্যাপারে, বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথই পুরোধা। তিনিই প্রথম উত্তরবঙ্গ ঘুরে এসে খুঁজে পান লালন ফকিরের গানে মানবতার সত্যদর্শন। বিপুল কিরণে ভুবন আলোকিত ক'রে আবার শিশির-টুকুকেও ভালবাসবার প্রতিভা তাঁরই ছিল। তাঁর প্রদর্শিত পথে মনসুরউদ্দিন ক্ষিতিমোহন সেন উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মতিলাল দাস আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রভৃতিরা যে বিপুল গান সংগ্রহ করেন তা অবশ্য এখনও আমাদের সঞ্চয়ের

গোলাবাড়িকেই ভরিয়েছে, তার যথার্থ সনাক্তকরণ, ধর্মবিশ্বাসের স্বরূপ নির্ণয় করা হয়নি।

ছোটখাট নানা মাপের লোকগীতিকারের অজস্র রচনার পাশ কাটিয়ে আমরা যদি বাংলা লৌকিক গানের বড় কয়েকটি নমুনা খুঁজি তবে তিনটি নাম খুব উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কালক্রমের দিক থেকে প্রথম নাম লালন শাহ, দ্বিতীয় রামদুলাল পাল এবং তৃতীয় কুবির গোঁসাই। এই তিনজনকে আলাদা ক'রে বেছে নেওয়ার তাৎপর্য এই যে, লালনের গানে প্রতিফলিত হয়েছে বাংলা বাউল মার্গের সবচেয়ে স্পষ্ট মতামত, রামদুলাল বা দুলালচাঁদের গানে কর্তাভজাদের ধর্ম ও সাধনতত্ত্বের মূলসত্তা এবং কুবির গোঁসাইয়ের গানে সাহেবধনী সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস।

বাংলা লোকসংগীতের প্রধান অংশ যে আসলে কোনো-কোনো লৌকিক ধর্মের তাত্ত্বিক ভাষ্য তা অনেকসময়ে আমাদের মনে থাকে না। সেই গৌণ ধর্মের অনুষঙ্গ থেকে আলাদা ক'রে গানগুলি শুনলে বা সাহিত্যিক আলোচনা করলে তার অঙ্গহানি ঘটে। সেই ভুল কিছুটা করেন রবীন্দ্রনাথ, অনেকটাই করেন ক্ষিতিমোহন সেন এবং 'লালন গীতিকা'র ভূমিকায় শশিভূষণ দাশগুপ্তের রচনা তো নিছক দর্শন। মনসুরউদ্দিন উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বরং অনেকাংশে ক্ষেত্রগবেষণার কাদামাটিমাখা সত্য দেখেছেন।

আসলে লোকধর্মের ভেতরকার ছোটখাট মতান্তর খুব সূক্ষ্ম। যেমন কর্তাভজাদের সঙ্গে সাহেবধনীদের অনেক বিষয়ে মিল আছে বিশ্বাসের দিক থেকে, কিন্তু আচরণের দিক থেকে আছে বেশ তফাৎ। লালনপন্থীদের সঙ্গে ফকিরি তন্ত্র ও বাউল মতবাদের ছোটখাট অনেক তফাৎ আছে। সাঁই-মত আর দরবেশীতন্ত্র এক নয়। খাঁটি ইসলামের সঙ্গে ফকিরদের সম্পৃক্ততা যতখানি, বাউলদের সঙ্গে বৈষ্ণবদের সম্পৃক্ততা ততটা নয়। এসব স্পষ্ট ক'রে বুঝতে গেলে তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা অর্জন করতে হয়, তাদের সঙ্গে ঘুরতে হয়। তারা শাস্ত্র মানে না কিন্তু তাদের মৌখিক আচরণবিধিতে স্পষ্ট করে নির্দেশ দেওয়া আছে : 'আপন সাধন কথা, না কহিও যথা তথা।' এটা সব মরমী সাধক মেনে চলে, এমনকি সাধারণ অজ্ঞ জিজ্ঞাসুকে তারা খানিকটা উল্টোপাল্টা ব'লে অনেক সময় বিভ্রান্ত ক'রে দেয়। তাদের গানের ভাষা ও প্রতীক আমাদের অচেনা তাই প্রহেলিকাময়। তাদের মৈথুনাত্মক কায়াসাধনার গুপ্ত ব্যাপার সম্পর্কে শহুরে গবেষকের জানবার আগ্রহ অসীম। একবার একজন খুদে গবেষক

আমাকে উদাসীনদের কাছ থেকে সন্থ-আবিষ্কৃত এক গান পড়ে শোনান, যাতে বলার কথাটা এই যে : 'যোনি-লিঙ্গে সাধনা চিরকালের এই ঘটনা'। তাঁকে বোঝাতে হয় যে এর জবাবী গানে মূল সত্যটা আছে, অর্থাৎ 'গুরু-বাক্য লিঙ্গ হয় শিষ্যের যোনি কান'। তার মানে গানটা মৈথুনতত্ত্বের নয়, গুরুতত্ত্বের। যুগে যুগে এমন ভুল অনেক হয়ে চলেছে। বস্তুত আমাদের দেশে যতগুলি জিনিসের অপব্যাখ্যা হয়েছে তার মধ্যে লোকধর্ম একটি। উন্নতমনস্ক উচ্চবর্ণের অনেক মানুষ ও পণ্ডিত বারে বারে লোকধর্মকে অনাচারবাদী, বিকৃতরুচি ও কামসর্বস্ব ব'লে বুঝিয়েছেন। অথচ তাদের সত্য কথাটা এই ভাবে ফুটেছে একটা গানে :

> প্রেমের রসিক যেজন পর আর আপন সে তো ভাবে না!
>
> সে প্রেম হয় যার—
>
> তার আর কামের ব্যবহার থাকে না।

এইসব বিভ্রান্তি ভুলবোঝাবুঝি অপব্যাখ্যা প্রভৃতি বিতর্কিত ব্যাপারগুলি সরিয়ে রেখে লৌকিক ধর্মসম্প্রদায়গুলির সবচেয়ে চিরজীবী অংশ অর্থাৎ তাদের গানগুলি আমরা যদি বুঝে নিতে পারি তবে আমাদের একটা সারস্বত উত্তরাধিকার লাভ হয়। সে কাজে গান জানার দিকটি যেমন জরুরি তেমনই গুরুত্বপূর্ণ গানগুলির ধর্মতত্ত্বগত বিষয় ও প্রকরণ বুঝে নেওয়া। সে-প্রয়াসের সূচনায় আমাদের স্পষ্টত জেনে রাখতে হয় যে বাউলধারা আর সহজিয়াধারা এক নয়। বাউলমতে ইসলাম-সুফিতত্ত্ব-ফকিরিতত্ত্ব সূক্ষ্মভাবে মিশে আছে। সহজিয়া মতে মিশে আছে তন্ত্র-বৈষ্ণবধর্ম-নাথপন্থ। অথচ উভয়ের গানে শব্দ তত্ত্ব প্রতীক অনেকসময় এক।

এই দুই ধারায় বিশ্বাসের বিচ্ছিন্নতা যেমন সত্য, তেমনই সত্য ভাবের সম্পৃক্ততা। যেমন বাউল ঘৃণা করে শাস্ত্র কোরান মসজিদ মোল্লাতন্ত্রকে, তাদের আস্থা মুর্শেদ আর মারফতী পথে। তেমনই সহজিয়াদের ঘৃণা বেদাচার মূর্তিপূজা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রতি, তাদের ভরসা গুরু আর ভাবের মানুষের উপর। অথচ আবার বাউলরা অবতারবাদে বিশ্বাসী নয় কিন্তু সহজিয়াদের বিশ্বাস অবতারতত্ত্বে। আমাদের দেশে একসময় যে অজস্র গৌণধর্ম গড়ে উঠেছিল তার বেশির ভাগের মূলে একজন ধর্মপ্রবর্তক ছিলেন। এক একটি ধর্ম একেক জনের নামে গড়ে উঠেছে। এদের একটা লম্বা ফিরিস্তি পাওয়া যায়

নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী বিদ্যারত্নের লেখা 'বৈষ্ণব ব্রতদিন-নির্ণয়' বইতে। সেই তালিকা যেমন উত্তেজক তেমনই কৌতূহলপ্রদ। যেমন :

সাধ্বিনীপন্থী, খুশি বিশ্বাসী, রাধাশ্যামী, জগবন্ধু-ভজনীয়া, রৈদাসী, সেনপন্থী, রামসনেহী, কর্তাভজা, সাহেবধনী, বলরামভজা, রূপ কবিরাজী, রামবল্লভী, হজরতী, গোবরাই, পাগলনাথী, তিলকদাসী, দর্পনারায়ণী, বাধাবল্লভী, চরণদাসী, হরিশ্চন্দ্রী, মাধবী, চুহড়পন্থী, কুড়াপন্থী, জগমোহিনী, গুরুদাসী বৈষ্ণব, রামপ্রসাদী, চামারবৈষ্ণব, হরিব্যাসী, নস্করী, পল্টুদাসী, আপাপন্থী, দরিয়াদাসী, বুনিয়াদদাসী, কুলিগায়েন, নরেশপন্থী, বেউড়দাসী, ফকিরদাসী, মুলুকদাসী।

প্রবর্তক বা প্রবর্তিকার নামধারী এত যে সহজিয়া-সম্প্রদায় গত দুশো বছরে জেগে উঠেছিল তাদের নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবরা 'পাষণ্ড' নাম দিয়েছিল এবং 'পাষণ্ডীদলন' জাতীয় গ্রন্থ লিখে তাদের আচারমার্গকে জানিয়েছিল ধিক্কার। ঠিক এই-ভাবেই নৈষ্ঠিক শরিয়তী ইসলামসমাজ ধিক্কার জানিয়েছিল লালনশাহী মত এবং অন্যান্য ফকিরি বা বাউল তত্ত্বকে। তাদের তারা চিহ্নিত করেছিল 'বেশরা' নামে। তবে নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবরা শুধু গ্রন্থরচনা ক'রে ধিক্কার জানিয়ে ক্ষান্ত হয়েছিল, আর নৈষ্ঠিক মুসলমানরা কেবল পুঁথিগত ধিক্কার নয়, জারি করেছিল 'বাউলধ্বংস ফতোয়া'। বাউলদের শারীরিক নির্যাতন, কেশকর্তন এমনকি ইসলামিকরণ পর্যন্ত হয়েছিল ব্যাপক বলদর্পিতায়। 'পাষণ্ডীদলন' বইতে নবগঠিত সহজিয়ামত সম্পর্কে শুধু প্রশ্ন রাখা হয়েছিল :

কি জন্য প্রবীণ মতে বিরত হইয়া।
অভিনব মতে রত কি সুখ দেখিয়া॥
স্বর্গের সোপান কি এ মতে গাঁথা আছে।
দড়বড়ি চলি যাবে শ্রীহরির কাছে॥
না জানি কি লাগি সবে ভ্রান্ত হায় মতি।
নবপথে পদার্পণ কেন ও দুর্মতি॥

আর বাউলমত সম্পর্কে কট্টর মুসলমান গর্জে উঠেছিল :

ঠেঁটা গুরু ঝুটা পরে
বালা হাতে নেড়ার ফকির
এরা আসল শয়তান কাফের বেইমান।

*কিংবা এতদূর লেখা হয়েছে যে,

লাঠি মারো মাথে দাগাবাজ ফকিরের।*

ইতিহাসের এইজাতীয় সন্ত্রস্ত নিষ্পেষিত সমাজচিত্র মনে রাখলে বোঝা যাবে কেন গৌণধর্মসম্প্রদায়গুলি অত্যন্ত সতর্কভাবে ঢুকে গেছে প্রত্যন্ত গ্রামের গহ্বরে, কেন তারা ক্রমে ত্যাগ করেছে বহির্বাস আর নিজধর্মের অঙ্গচিহ্ন, কেন তারা গুপ্তসাধনার আসনে নিজেদের অর্গলবদ্ধ করেছে। এই সূত্রেই বোঝা যাবে কেন তাদের সংখ্যা যাচ্ছে কমে, কেন তারা আমাদের জিজ্ঞাসার জবাবে তৈরি করে ইচ্ছাকৃত বিভ্রান্তি, কেন তারা সচরাচর প্রহেলিকাভরা গান করে। 'লোকমধ্যে লোকাচার' তারা মেনে চলে। তাই হঠাৎ তাদের সঠিক সনাক্তকরণ কঠিন। অথচ এইসব গৌণধর্ম সম্প্রদায় এক অত্যন্ত সজীব সত্য। আমাদের বহির্মুখী নগরকেন্দ্রিক জীবনচর্যার উল্টো বাঁকে রয়ে গেছে এক অন্তঃশীল অতল রহস্যের গভীর নির্জন জগৎ।

সেই জগৎ নানা কিংবদন্তী, অলৌকিক কাহিনী, বিচিত্র রোগারোগ্যের বিবরণে রোমাঞ্চকর। প্রবর্তককেন্দ্রিক এই সব গৌণধর্ম আজও নানা খাতে বইছে, হয়ত শীর্ণধারায় কিংবা রূপান্তরিত সমন্বয়ে। তবু লক্ষ লক্ষ গ্রামমানুষ এসব ধর্মের নিগূঢ় টানে এখনও জমায়েত হয়, পার্বণী দেয়, অংশ নেয় বাৎসরিক মেলায়, জাতিবর্ণনির্বিশেষে ব'সে পড়ে পংক্তিভোজনে। এসব সম্প্রদায়ের শ্রমজীবী বা কৃষিজীবী মানুষ সারাদিন দারিদ্র্য আর কর্মের প্রহারে পাংশু হয়েও দিনান্তে শ্রীহরি বা আল্লাকে না ডেকে বলে 'জয় কর্তা বাবা' কিংবা 'জয় দীনদয়াল'। যেন তারাই তাদের সম্বোধনের সীমায় ধরা পড়েছেন, হরি বা আল্লা যেন অনেক অপ্রাপণীয় দূরত্বে শুধু উচ্চবর্ণের আকাশে শোভা পাচ্ছেন। এই সব ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষগুলির মধ্যে রয়ে গেছে যুগযুগান্তসঞ্চিত ক্ষোভ ও মারখাওয়ার বেদনা। উচ্চবর্ণের কাছে তারা যেমন পায়নি ক্ষুধার অন্ন বা মানবিক শুশ্রূষা তেমনই পাইনি ধর্মসাধনার স্বাধীনতা ও সমাজস্বীকৃতি। এদিকে শাসকের অত্যাচার কাজীর দলন আর ভাগ্যের প্রহার যত তীব্র হয়েছে ততই তাদের অসহায় অস্তিত্বে তীব্রতর হয়েছে ব্রাহ্মণ্যবিদ্বেষ আর মোল্লাতন্ত্রের প্রতি অনাস্থা। শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত উদার বৈষ্ণবধর্মে আর লোকায়ত বাউলমতে এই অসহায়

*উৎসাহী পাঠক পড়ে নেবেন বাউল-ফকির-নিগ্রহের আরও অগণন মর্মন্তুদ প্রতিবেদন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বাংলাদেশ প্রকাশিত 'লালন স্মারকগ্রন্থ' থেকে আবুল আহসান চৌধুরীর তথ্যভিত্তিক প্রবন্ধ 'বাংলার বাউলবিরোধী আন্দোলন : প্রেক্ষিত লালনশাহ'।

অথচ মুমুক্ষু মানুষদের বাঁচবার একটা নিশানা ছিল। জাতিবর্ণের বিরোধ ঘুচিয়ে, শাস্ত্রের বিধান ভেঙে, শুধু হৃদয়ের নির্দেশে ভক্তিমান মানুষদের একত্র করার প্রয়াস করেছিলেন শ্রীচৈতন্য। তাই তাঁকে আজও সাধারণ অজ্ঞ মানুষ ও অসহায় গ্রামবাসী পরিত্রাতারূপে মানে। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করে এই কিংবদন্তী যে, ব্রজলীলা সম্পূর্ণ হয়নি ব'লে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং লোকনিস্তার করতে নবদ্বীপে জন্মেছিলেন আচণ্ডালকে মুক্তি দিতে। পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পর বাংলার বৈষ্ণবধর্ম হয়ে পড়ে বৃন্দাবনকেন্দ্রিক ও মননপ্রধান। তাঁর লোকশিক্ষার বিস্তীর্ণ জগৎ সংকুচিত হয়ে ওঠে পণ্ডিত বৈষ্ণবদের জ্ঞান ও তত্ত্বের শীর্ণ আভিজাত্যে। বৈষ্ণবদের মধ্যেও গড়ে ওঠে শ্রেণী ও বর্ণ। পদাবলী সাহিত্যের সহজিয়া উচ্চারণ চৈতন্যোত্তর কালে ঢেকে যায় ছন্দোঝংকার আর কৃত্রিম ব্রজবুলির আলংকারিকতায়। শ্রীজীব শ্রীরূপ কবিকর্ণপুর কৃষ্ণদাস কবিরাজদের মননপ্রকর্ষ গড়ে তোলে নৈষ্ঠিকদের জন্য আরেক শাস্ত্র। সাধারণ মানুষ আরেকবার হয়ে পড়ে অসহায়। বৈষ্ণবধর্মে নেমে আসে বিকৃতি। বৌদ্ধতান্ত্রিকদের অবক্ষয়িত এক ধারা যৌন যোগাচারের লোভ দেখিয়ে ভক্তির বিশুদ্ধ পথকে ক'রে তোলে কামসংসর্গে বিকৃত। তখন দরকার পড়ে আরেকজন পরিত্রাতার। সেই সময়ে নিত্যানন্দের ছেলে বীরভদ্র নামান্তরে বীরচন্দ্র শুরু করেন সেই শুদ্ধিযজ্ঞ। সবল লোকায়ত ভক্তিবিশ্বাসের পথে তিনি আবার মানুষদের ফেরান। এই নতুন নেতাকে নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবরা আখ্যা দেন ভ্রষ্টাচারী ও পাষণ্ড। তাঁর দীক্ষিত শিষ্যদের হীনার্থে বলা হয় ন্যাড়ানেড়ী। কিন্তু অগণন মানুষ পেয়ে যায় একটা আশ্রয় ও ধর্মের ছত্রতল। মুক্তিদূত শ্রীচৈতন্য ও অগণিত ভক্তের মাঝখানে জড়ো হয়েছিল যে রাশি-রাশি শাস্ত্র আর পুঁথি, বীরভদ্র তা ভেঙে দিলেন। তিনি হলেন নতুন অবতার। লোকে বিশ্বাস করল যে শ্রীচৈতন্যই বীরভদ্ররূপে নতুন ক'রে জন্মেছেন। এইভাবেই আমাদের লৌকিক উপধর্মে অবতারবাদের সূচনা ঘটল। লোকে বলতে লাগল :

বীরচন্দ্ররূপে পুনঃ গৌর অবতার।
যে না দেখেছে গৌর সে দেখুক এবার॥

অবতারবাদের যুক্তিক্রমে দেখানো হল অসম্পূর্ণ ব্রজলীলার সম্পূরণে যেমন শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপলীলা তেমনই নীলাচলে অপ্রকট শ্রীচৈতন্যের অচরিতার্থ কাজ শেষ করতেই যেন বীরভদ্রের জন্ম। কথাটায় জোর দেবার জন্য তৈরি হ'ল সংস্কৃত শ্লোক :

শ্রীচৈতন্যং প্রভুং বন্দে প্রেমামৃতরসপ্রদং।
শ্রীবীরচন্দ্ররূপেণ প্রকটিভূত ভূতলং ॥

লোকধর্মের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে এই অবতারবাদের তত্ত্ব কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। প্রবর্তককেন্দ্রিক সব সহজিয়াধর্মই তাদের প্রবর্তককে মনে করে শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীচৈতন্যের অবতার। এই অবতারতত্ত্ব ব্যক্তিপরম্পরায় এগিয়েই চলে। তার একটি দৃষ্টান্ত কর্তাভজাদের ক্ষেত্র থেকে দেখানো যায়। কর্তাভজাদের প্রবর্তক আউলেচাঁদ নামে এক কিংবদন্তীধন্য ফকির। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তিনি নদীয়াজেলার ঘোষপাড়া অঞ্চলে এসে রামশরণ পাল নামে এক সম্পন্ন সদ্গোপকে দীক্ষা দেন। W. Ward-এর বর্ণনা থেকে বোঝা যায় আউলেচাঁদ ছিলেন সুফি ফকির, কেননা whose cloth, or dress of many colours, which he wore as a Voiragee, was so heavy that two or three people can now scarcely carry it। এমন একজন সুফি ফকিরকেও গৌরাঙ্গের অবতার বানাতে কর্তাভজাদের অসুবিধা হয়নি। তাই শ্লোক গড়ে উঠেছিল :

কৃষ্ণচন্দ্র গৌরচন্দ্র আউলেচন্দ্র
তিনেই এক একেই তিন।

কিন্তু কালক্রমে কর্তাভজাদের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে ওঠে। আউলেচাঁদের প্রধান শিষ্য রামশরণের ছেলে দুলালচাঁদ এ-সম্প্রদায়কে সংগঠিত ও সংখ্যাবাহুল্যে মজবুত করে তোলেন। W. Ward লিখেছেন : Doolalu, the son, pretends that he has now 4000,000 disciples spread over Bengal। এত ভক্ত শিষ্য যার তাঁকে অবতার না বানালে কি চলে? কাজেই সুপরিকল্পিত কৃৎকৌশলে দুলালচাঁদের মা সরস্বতী দেবীর নাম হ'ল সতীমা (সতীমা উচ্চারণে শচীমা-র আভাস জাগে) এবং দুলালচাঁদ হলেন গৌরাঙ্গের অবতার। তৈরি হল নতুন শ্লোক :

তিন এক রূপ।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীগৌরচন্দ্র ও শ্রীদুলালচন্দ্র
এই তিন নাম বিগ্রহস্বরূপ ॥

লক্ষ করবার বিষয় যে আউলেচন্দ্রকে সরিয়ে দুলালচন্দ্রের এই যে উত্থান তার আর পরিবর্তন হয়নি, কেননা সতীমা-দুলালচাঁদের সংগঠন শক্তি কর্তাভজাদের দৃঢ় বনিয়াদে বংশপরম্পরায় গুরুবংশের মর্যাদা দিয়েছে।

বাংলার লৌকিকধর্মে অবতারবাদের এই দোলাচল একটু বিস্তারিত ভাবে বলার কারণ এই যে অনেকসময়ই লোকধর্মের পরিণতি হয় গুরুবংশের অন্যতর শোষণে। সাধারণ ভক্ত ও বিশ্বাসী মানুষ জড়িয়ে পড়ে আরেক জরিমানার দায়ভাগে। এ কথা বিস্ময়কর হলেও সত্যি যে অনেক লৌকিক ধর্মে ভক্ত বা শিষ্যকে প্রতিবছর নির্দিষ্ট দিনে গুরুপাটে গিয়ে 'খাজনা' বা 'জরিমানা' দিতে হয়। বলা হয় গুরু যেহেতু তার ঐহিক সুখদুঃখ ও দেহের দায়িত্ব নিয়েছেন কাজেই তাঁর প্রাপ্য ঐ অর্থমূল্য এবং তৎসহ চালডালখন্দ।

এই প্রচলিত ধারাতেই সাহেবধনী সম্প্রদায়ও তাদের প্রবর্তকের পরম্পরায় ব্রজলীলাকে জড়িয়ে নিয়ে ঘোষণা করেছে :

সেই ব্রজধামের কর্তা যিনি
রাইধনী সেই নামটি শুনি
সেই ধনী এই সাহেবধনী।

তবে এখানে নতুনত্ব এই যে, সাহেবধনীর পূর্বসূত্রে শ্রীকৃষ্ণ বা গৌরাঙ্গ নেই, আছেন শ্রীরাধা। এ থেকে অনুমান করা যায় হয়ত সাহেবধনী ধর্মের মূল প্রবর্তক কোন নারী। এ কথা স্পষ্টতর হয় আর একটি পদে, যেখানে বলা হয় :

আছে আর এক সত্য বাণী
দীনদয়াল সাহেবধনী নামের ধনী
ব্রজের রাইধনী সেই ধনী নদেতে উদয়।

নদীয়াজেলার শালিগ্রাম অঞ্চলে সাহেবধনীদের উৎপত্তিস্থল, সেইজন্যই ব্রজের রাইধনীর 'নদেতে উদয়' কথাটার সার্থকতা বোঝা যায়। দীনেশচন্দ্র সেন থেকে আহমদ শরীফ পর্যন্ত অনেক পণ্ডিতের অনুমান যে সাহেবধনী সম্প্রদায়ের মূলে ছিলেন একজন মুসলমান। অবশ্য এইমুহূর্তে সাহেবধনীদের উদ্ভবের সূচনায় মুসলমান সূত্র আর অনুমানের বিষয় নয়, সত্য। 'সাহেবধনী ঘরের সত্যনাম' ব'লে একটি হাতে-লেখা পুঁথি আমি আবিষ্কার করেছি বৃত্তিহুদা গ্রাম থেকে, যাতে রয়েছে সাহেবধনী সম্প্রদায়ের লৌকিক মন্ত্রতন্ত্র। তার একটিতে লেখা আছে :

ক্লিং সাহেবধনী আল্লাধনী দীনদয়াল নাম সত্য।

সাহেবধনীদের সবচেয়েবড় গীতিকার কুবির গোঁসাই তাঁর দুটি গানে হিন্দুমুসলমান ধর্মসমন্বয়ের চমৎকার উক্তি করেছেন যা উল্লেখযোগ্য :

১ আল্লা মহম্মদ রাধাকৃষ্ণ একাঙ্গ একাত্মা সার।

একহাতে বাজেনা তালি এক সুরের কথা বলি
নীরে ক্ষীরে চলাচলি বীজের এই বিচার।
পিতা আল্লা মাতা আহ্লাদিনী মর্ম বোঝা হ'ল ভার ॥

২ একের সৃষ্টি সব পারিনা পাকড়াতে।
আল্লা আলজিহ্বায় থাকেন আপনসুখে
কৃষ্ণ থাকেন টাকরাতে।

আল্লার হ্লাদিনী শক্তিরূপে রাধার কল্পনাতে যে সাহস ও চিন্তার অভিনবত্ব আছে তার ভিত্তিমূলে আছে সাহেবধনী সম্প্রদায়ের নবঅবতারতত্ত্ব ও সমন্বয়বাদ। ব্যবহারিক জীবনে আমরা যাঁদের বলি হিন্দু বা মুসলমান, সাহেবধনী সম্প্রদায়ে তাঁরাই মিশে আছেন প্রচ্ছন্নরূপে অথচ প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায় এঁদের ধর্মে হিন্দু গুরুর মুসলমান শিষ্য অথবা মুসলমান গুরুর হিন্দু শিষ্য অনেক রয়েছে। জাত পাঁত বর্ণবিচার এঁদের নেই। একত্রভোজন খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। মৃত্যুর পর এঁদের সমাধি দেওয়ারই বিধি। উপাস্যকে এঁরা ডাকেন দীনদয়াল দীনবন্ধু। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই বিশেষ ধর্মসম্প্রদায় সম্পর্কে সব তথ্য ও উপাদান খুব সতর্কভাবে বিবেচনাযোগ্য। কিন্তু সর্বাগ্রে প্রয়োজন এ সম্প্রদায়ের ইতিহাস উন্মোচন।

সাহেবধনীদের সম্পর্কে সর্বপ্রথম লিখিত উল্লেখ আমরা পাই ১৮৭০ সালে মুদ্রিত অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' বইতে। তার থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি :

> 'এরূপ প্রবাদ আছে যে, কৃষ্ণনগর জেলার অন্তর্গত শালিগ্রাম, দোগাছিয়া প্রভৃতি কয়েক গ্রামের বনে একজন উদাসীন বাস করিত। ঈশ্বর আরাধনায় ও পরোপকার সাধনে তাহার বিশেষরূপ অনুরাগ ছিল। বাগাড়ে নিবাসী রঘুনাথ দাস, দোগাছিয়ানিবাসী দুঃখীরাম পাল এবং হিন্দুমতাবলম্বী অপর কয়েক ব্যক্তি ও একজন মোসলমান তাহার শিষ্য হয়। ঐ উদাসীনের নাম সাহেবধনী বলিয়া এই সম্প্রদায়ের নামও সাহেবধনী হইয়াছে।
>
> বোধহয়, ইহারা কর্তাভজা-সম্প্রদায়েরই শাখা বিশেষ। যেমন ঘোষপাড়ার কর্তাভজা-সম্প্রদায়ের মূলগুরু রামশরণ পাল। সেইরূপ ইহাদের মূল গুরু দুঃখীরাম পাল। ঐ পালের পুত্র চরণ পাল এই সম্প্রদায়ের মত

বিশেষরূপে প্রচার করিয়া অতিশয় বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছেন। এই পালেরা গোপজাতীয়। ইহারা কোন বিগ্রহের উপাসনা করে না, বরং বিগ্রহ ও মন্ত্রদাতা গুরুর প্রতি বিশেষ বিদ্বেষই প্রকাশ করে। ইহাদের উপাসনা স্থানের নাম আসন। ঐ আসন একখানা চৌকিমাত্র। ঐ চৌকিতে পুষ্প, চন্দন ও পুষ্পমালা দেওয়া থাকে। প্রতি বৃহস্পতিবারে ঐ সম্প্রদায়ী অনেক লোক ঐ আসন স্থানে সমাগত হইয়া পরমার্থ সাধন করে। তথায় তাহারা আপনাদের প্রস্তুত করা পরমান্ন এবং যবনাদি নানাজাতি-প্রদত্ত মানসিক ভোগের সামগ্রী আসনের নিকট নিবেদন করিয়া দিয়া নিবেদিত দ্রব্য পরস্পরের মুখে অর্পণ করে। ইহাকেই পরমার্থ-সাধন কহে। অধিক রাত্রি হইলে ঐ সকল দ্রব্য সকলে মিলিয়া ভক্ষণ করে এবং আপনাদের মতানুযায়ী সঙ্গীতাদি করিয়া উপাসনা করে।

ঐ সময় অনেক রোগী ঐ স্থানে আগমন করে এবং রোগমুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে মানসিক করিয়া যায়। সম্প্রদায়-গুরুর প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা যাহারা রোগ হইতে মুক্ত হয়- তাহারা ঐ পূর্বকৃত মানসিক আনিয়া উপস্থিত করে। ইহাতে সম্বৎসরে অনেক অর্থ সংগৃহীত হয় এবং সেই অর্থ দ্বারা চৈত্রমাসে অগ্রদ্বীপে ইহাদের একটি মহোৎসব হইয়া থাকে।

ইহারা জাতিভেদ স্বীকার করে না; কি হিন্দু কি মোসলমান সকল জাতিকেই স্বসম্প্রদায়ে নিবিষ্ট করে। হিন্দুদিগকে 'ক্লীং দীননাথ দীনবন্ধু' এবং মোসলমানদিগকে দীনদয়াল দীনবন্ধু' এই মন্ত্র উপদেশ দিয়া থাকে। কিছুদিন হইল, চরণ পালের মৃত্যু হইয়াছে। এক্ষণে তাহার পুত্র তদীয় আসনের অধিকারী।

সাহেবধনী সম্প্রদায় সম্পর্কে এই প্রথম মুদ্রিত প্রতিবেদনটি মোটামুটি নির্ভরযোগ্য, যদিও গুরুবিদ্বেষের প্রসঙ্গটি অবান্তর। পরবর্তীকালে দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বৃহৎবঙ্গ' বইতে, রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'বাংলাদেশের ইতিহাস'-য়ের মধ্যযুগ পর্যায়ে, পূর্ববঙ্গ রেলপথ তাঁদের প্রচার পুস্তিকায় 'সাহেবধনী' সম্পর্কে লেখেন। তাতে মোটামুটি অক্ষয়কুমারের প্রতিবেদনের অনুসরণ চোখে পড়ে। ১৩১৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত কুমুদনাথ মল্লিকের 'নদীয়া-কাহিনী' বইতেও অক্ষয়কুমার-অনুসরণ স্পষ্ট তবে তাঁর অতিরিক্ত সংযোজন হ'ল:

ধর্মের জন্য না হউক, ব্যাধি বিদূরিত করিতে নীচ জাতীয়গণের মধ্যে এ সম্প্রদায়ের প্রসার বেশ আছে, কিন্তু ইহাদের সাম্প্রদায়িক লোক-

সংখ্যা দিন দিন যেরূপ হ্রাস পাইতেছে, তাহাতে আর কিছুদিন ইহাদের নিদর্শন থাকিবে কিনা সন্দেহ হয়।

এই সব প্রতিবেদনের মধ্যে কোন সরেজমিন অভিজ্ঞতার চিহ্ন নেই, আছে হালকা অনুমান। প্রকৃতপক্ষে সাহেবধনী সম্প্রদায়ের উদ্ভব অনেকটা বোঝা যায় অক্ষয়কুমারের বিবরণে উল্লিখিত এই তথ্য থেকে যে দুঃখীরাম পাল এ ধর্মের মূলগুরু, তাঁর পুত্র চরণ পালের সময় সম্প্রদায়টির সমুন্নতি এবং 'কিছুদিন হইল চরণ পালের মৃত্যু হইয়াছে' এই মন্তব্যের কাল ১৮৭০। এর থেকে বোঝা যায় সাহেবধনীদের উদ্ভব আঠারো শতক।

এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তটি পাকাপোক্ত করতে আমি শালিগ্রাম-দোগাছিয়া যাই ১৯৬৮ সালে। সেখানে স্থানীয় অনুসন্ধানে জানা যায় সাহেবধনীদের প্রধান গুরুর নাম মুলীরাম বা মুলীচাঁদ পাল। অক্ষয়কুমার ভুল করে তাঁকে দুঃখীরাম বলে উল্লেখ করে গেছেন। এই মুলীচাঁদের ছিল তিন সন্তান: ঠাকুরদাস (অপুত্রক ও স্বল্পজীবী), চরণচাঁদ ও গোবর্ধন।* এই গোবর্ধনের বংশ আজও দোগাছিয়ায় রয়েছে। মুলীচাঁদের মধ্যমপুত্র চরণ পাল সাহেবধনী সম্প্রদায়কে সংগঠিত ও ব্যাপকতা দেন এবং তাঁদের সাধনার আসন স্থানান্তরিত করেন দোগাছিয়া গ্রামের পূর্বদিকে জলাঙ্গী নদীর অপরপার বৃত্তিহুদা গ্রামে (দ্রষ্টব্য মানচিত্র)। এই বৃত্তিহুদা গ্রামই প্রকৃতপক্ষে সাহেবধনীদের গুরুপাট। উনিশ শতকের গোড়া থেকে আজপর্যন্ত এখানেই তাদের ওঠাবসা এবং বাৎসরিক মেলা মহোৎসব হয়ে আসছে। এখানেই রয়েছে চরণ পালের বংশধারা ও তাদের দেবোত্তর সম্পত্তি। বৃত্তিহুদার পালবাড়ি অতিপ্রসিদ্ধ লৌকিক তীর্থ। ভক্ত শিষ্য দীন আতুর দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত প্রভৃতি সকলেই আজও এই পাল বাড়ীতে হত্যে দেয় ও মানসিক করে। বৈশাখী পূর্ণিমায় ঐখানে হয় মহোৎসব। নিত্যপূজা ছাড়াও বৃহস্পতিবারের বিশেষ ভোগরাগ দীনদয়ালের নামে পাল বাড়িতে আজও নিবেদন হয়। চরণ পালের প্রত্যক্ষ শিষ্য কুবের সরকার ওরফে কুবির গোঁসাই (নদীয়ার স্বরসঙ্গতিতে কুবের > কুবির) সাহেবধনীদের প্রধান গীতিকার। তাঁর লেখা ১২০৯খানি গানের যে হাতে-লেখা পুঁথি আমি দেখার ও ব্যবহার করার সুযোগ পাই, তার সব গানের ভণিতায় গীতিকার কুবির এবং তাঁর গুরু চরণের উল্লেখ আছে। বৃত্তিহুদায় চরণ ও কুবিরের সমাধিও আজ দ্রষ্টব্যস্থল। এই কুবির তাঁর একটি গানে বৃত্তিহুদা ও চরণের বিবরণ দিয়ে লিখেছেন:

---

* মতান্তরে গোবর্ধন, চরণচাঁদ ও চৈতন্য।

ওরে বৃন্দাবন হ'তে বড় শ্রীপাট হুদাগ্রাম।

শ্রীপাট হুদাগ্রাম

যথা দিবানিশি শুনি দীনবন্ধু নাম॥

হেরী নীলাচলে যেমন লীলে

এখানে তার অধিক লীলে

হিন্দু যবন সবাই মিলে স্বচক্ষে দেখতে পেলাম॥

ত্যাখো গোঁসাই চরণচাঁদ আমার

বসিয়েছে চাঁদের বাজার

ভক্তবৃন্দ আসছে যাচ্ছে অবিশ্রাম॥

আমার চরণচাঁদের নামের জোরে

দুখী তাপী পাপী তরে

হাঁপ কাশি শূল গুড়ুমব্যথা

মহাব্যাধি হয় আরাম॥

এ বিবরণ থেকে চরণের লোকপ্রিয়তা ও তাঁর আসনসিদ্ধ অলৌকিকতার খবর মিলছে। তাঁর নামের জোরে ব্যাধি আরোগ্যের বর্ণনায় বোঝা যায় ঘোষপাড়ার হিমসাগরের জল আর ডালিমতলার মাটির মত বৃত্তিহুদার নামযশও প্রসিদ্ধ। এ গানের শেষ অংশে আছে চরণ পালের তিন শিষ্যের নাম:

আছে ভোলানাথ কৈলাসপুরে

জগন্নাথ শ্রীক্ষেত্তরে

অযোধ্যানগরে ছিলেন শ্রীরাম।

তেমনই প্রহ্লাদচন্দ্র রুকুনপুরে

রামচন্দ্র বামুনপুকুরে

গোঁসাই কুবির আছেন দ্বারে

পূর্ণ ক'রে মনস্কাম॥

চরণ পালের প্রধান তিন সাক্ষাৎ শিষ্য তাহলে রুকুনপুরের প্রহ্লাদচন্দ্র গোঁসাই, বামুনপুকুরের রামচন্দ্র গোঁসাই* এবং বৃত্তিহুদার কুবিরচাঁদ গোঁসাই।

---

* চরণের শিষ্য প্রহ্লাদচন্দ্র ছিলেন বিখ্যাত গীতিকার হাউড়ে গোঁসাইয়ের গুরুস্থানীয়। রুকুনপুরে তাঁর বংশ এখন অবলুপ্ত। তাঁর বাস্তুভিটা কিনে নিয়েছেন জনৈক মহম্মদ হোসেন।

রামচন্দ্রের বাস্তু আছে নবদ্বীপের কাছে বিখ্যাত মায়াপুরের সন্নিহিত বামুনপুকুর গ্রামে। তিনি জাতে ছিলেন বেশ্য কপালী। সত্তর বছর বয়সে তাঁর দেহান্ত ঘটে। তাঁর ভিটেয় রয়েছে সাধনপীঠ ও সমাধি। বংশধর আছে।

তিনজনই নদীয়ার মানুষ এবং সাহেবধনী ঘরের তাত্ত্বিক প্রচারক, তবে কুবিরের উপর ছিল আরেকটি সৌভাগ্যের আশীর্বাদ। তিনি লিখতে পারতেন চমৎকার গান যার অধিকাংশই সাহেবধনীদের তত্ত্ব ও বিশ্বাসের মূল্যবান ভাষ্য, সেইসঙ্গে সেসব গানে জড়িত ছিল তাঁর লোকজ্ঞান, সমাজঅভিজ্ঞতা ও ইতিহাসচেতনা। যার ফলে আজ কুবির গোঁসাইয়ের গান নিছক তত্ত্বের কাঠামো ছাড়িয়ে পরিব্যাপ্ত হয়ে ওঠে সমাজতাত্ত্বিকের জিজ্ঞাসায়, ঐতিহাসিকের কুতূহলে এবং সাহিত্যমনস্কের আনন্দের রসদে। সাহেবধনী সম্প্রদায় ও তাদের গানের পরম্পরা কুবিরের রচনাতেই শেষ হয়ে যায়নি, তা প্রসারিত হয়েছে কুবির শিষ্য যাদুবিন্দ গোঁসাইয়ের গানে।

বৃত্তিহুদায় দীর্ঘকাল সরেজমিন ঘুরে চরণ পালের বংশধরদের সঙ্গে কথা বলে আমি চরণ পালের এক বংশতালিকা প্রণয়ন করেছি যা উল্লিখিত হল এইখানে। এই তালিকা থেকে বোঝা যায় চরণ পালের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ এখন সাহেবধনীদের গুরুপাটের আসন-অধিকারী। এ তথ্য থেকে চরণ পালের কালনির্ণয়ে অনেকটা সুবিধা হয় এবং স্পষ্টতই জানা যায় সাহেবধনীদের প্রবর্তক বংশের লতাপাতার সূত্র।
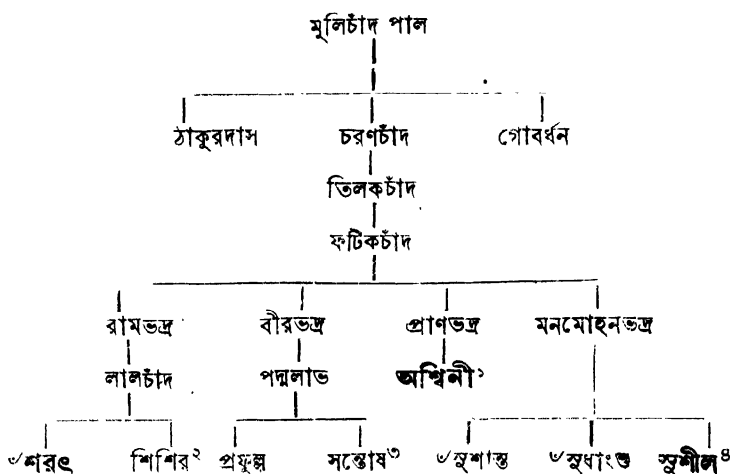
১ প্রাণভদ্রের সন্তান অশ্বিনী পাল একসময়ে সম্প্রদায়কর্তা ছিলেন। এখন বৃত্তিহুদার প্রান্তে আলাদা আশ্রম।

বৃত্তিহুদা গ্রাম সম্পর্কেও কিছুটা প্রাথমিক ধারণা থাকা দরকার। গ্রামটি নদীয়া জে.। চাপড়া থানার অন্তর্গত। জেলাশহর কৃষ্ণনগর থেকে ষোলো মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত। করিমপুর-কৃষ্ণনগর পাকারাস্তার লক্ষ্মীগাছা গ্রাম বাসস্টপে নেমে হাঁটাপথে তিন মাইল বৃত্তিহুদার দূরত্ব। গ্রামের পশ্চিমে জলাঙ্গী নদীর বেষ্টন। উত্তরে তালুকহুদা, দক্ষিণে গোথুরাপোতা, পুবে তিন মাইল ভূখণ্ডপারে কৃষ্ণনগর-করিমপুর পাকা রাস্তা। মৌজা নং ২৯।

অধিবাসীদের জীবিকা: কৃষিকর্ম, তাঁতবোনা, ব্যবসায় ও শিক্ষকতা।

জনসংখ্যা ১৯৭১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী মোট ৩৫৫০ জন। তার মধ্যে মুসলমান ৫২৫ ঘর, ঘোষ ৬০ ঘর, কর্মকার ৮ ঘর, দাস ৪০ ঘর, প্রামাণিক ৬ ঘর, গড়াই ১০ ঘর, সূত্রধর ১ ঘর, ব্রাহ্মণ ১ ঘর।

চরণ পালের শিষ্য কুবির গোঁসাইয়ের ভিটে এবং সমাধি বৃত্তিহুদা গ্রামেই আছে। সেখান থেকে তাঁর যে বংশতালিকা মেলে তা নিম্নরূপ:
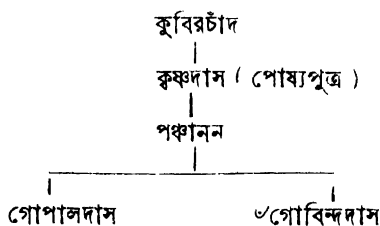
কুবিরের ভিটায় বর্তমান সেবাইত পঞ্চাননের স্ত্রী ও তার বড় ছেলে গোপালদাস।

কুবিরের প্রধানশিষ্য ছিলেন যাদুবিন্দু গোঁসাই। তার বাড়ি ছিল বর্ধমান জেলার পাঁচলখি গ্রাম। সেখানে এখনও তাঁর ভিটা, সমাধি ও উত্তরপুরুষ আছে, আর আছে যাদুবিন্দুর লেখা বিপুল গানের সম্পদ। কুবিরের আরেক শিষ্য ছিলেন বৃত্তিহুদার রামলাল ঘোষ। ১৩০০ বঙ্গাব্দে রামলাল কুবিরের গানের মূলখাতা থেকে সব গান অনুলিখন করেন এবং প্রসঙ্গত ১২০৯ সংখ্যক কুবির-গীতির ('সাধনাতে সিদ্ধ হয়েছি') শেষে পাদটীকায় লিখে গেছেন (দ্রষ্টব্য ফটোস্ট্যাট):*

---

২ লালচাঁদের জ্যেষ্ঠ সন্তান শরৎ দুবছর আগে আমৃত্যু সম্প্রদায়কর্তা ছিলেন। বর্তমানে তাঁর অনুজ শিশির বৃত্তিহুদায় থাকেন।

৩ পদ্মনাভের দুই ছেলে প্রফুল্ল ও সন্তোষ বৃত্তিহুদায় থাকেন না। বর্তমান আবাস নদীয়ার নূতনগ্রাম-কেশবপোঁতা।

৪ মনমোহনভদ্রের প্রথম দুইসন্তান মৃত। কনিষ্ঠ সুশীল পাল বর্তমান সম্প্রদায়কর্তা।

* সমগ্র কুবির-গীতির খাতা এবং আনুষঙ্গিক নথি দেখা ও যথেচ্ছ ব্যবহারের জন্য কৃতজ্ঞতা ও স্বীকৃতি রামলাল ঘোষের পৌত্র রামপ্রসাদ ঘোষকে।

উক্ত গানটি সকলের শেষে তৈয়ার হইয়াছে : এই কারণ সেস লেখা হইলো সমাপ্ত : । কিন্তু ইহার পরে জে সকল গীত পাওা জাইবে তাহা পরে লিখিতে থাকিলাম ইতি সন ১৩০০ সাল ৩১ আষাঢ় সোমবার শ্রী৺কুবিরচন্দ্র গোস্বামিদেবের সহস্তের পুরাতন খাতা পরিবর্ত্তে এই নকল খাতা লিখিলাম আমি অধম শ্রীরামলাল ঘোষ শ্রতাগণ এবং গাহকগণ খাতা লেখার কোনো দোসাদোষ গ্রহণ না করিয়া লেখার দোষের অপরাধ মাপ করিয়া প্রভুর নিজ মুখের কথাব ভাব গ্রহণ করিবেন ।

এই রামলাল ঘোষের অনুলিখনে যেমন বহুমূল্য কুবিরের গানগুলি রক্ষা পেয়েছে তেমনই তাঁর রক্ষিত নানা খবরের খাতা থেকে পাওয়া গেছে চরণ পাল ও কুবির গোঁসাইয়ের জীবনতথ্যের বিবরণ ও মূল্যবান সন তারিখ। রামলাল ঘোষের খাতা থেকেই আমরা জানতে পারি চরণ পালের জন্ম ১১৪৭ বঙ্গাব্দ (মৃত্যু তারিখ অনুল্লিখিত), যাদুবিন্দুর মৃত্যু ১৩২৩ বঙ্গাব্দের ২৮ শ্রাবণ। ঐ খাতা থেকে জানা যায় কুবিরের জন্ম ১১৯৪ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন পূর্ণিমায়, মৃত্যু ১২৮৬ বঙ্গাব্দের ১১ আষাঢ় মঙ্গলবার রাত চারদণ্ডে শুক্লপক্ষে ষষ্ঠীতিথির মধ্যে। কুবিরের জন্মসাল নিশ্চয়ই রামলালের শোনা, কিন্তু তাঁর মৃত্যুসংক্রান্ত অনুপুঙ্খ থেকে বোঝা যায় রামলাল তার প্রত্যক্ষদর্শী। কুবিরের পূর্বাশ্রম কোথায় ছিল তার কোন হদিশ না মিললেও রামলালের খাতা থেকে জানা যায় তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল ভগবতী এবং তাঁর তিরোধান ১২৯১ বঙ্গাব্দের ২৯ শ্রাবণ বুধবার কৃষ্ণপক্ষ দ্বিতীয়ায়। কুবিরের সাধনসঙ্গিনীর নাম ছিল কৃষ্ণমোহিনী, তাঁর দেহান্ত ঘটে ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ১৪ আষাঢ় বুধবার ত্রয়োদশীতে। বৃত্তিহুদার পাল বাড়ির খুব কাছে কুবিরের সমাধি মন্দিরের পাশেই রয়েছে তার সহধর্মিণী ও সাধনসঙ্গিনীর সমাধি। সেখানে দাঁড়ালে এক জীবনরসিক সাধক কবির স্মৃতিতে মন আবিষ্ট হয়ে ওঠে।

এইসব সযত্নরক্ষিত তথ্য থেকে সুনিশ্চিত ভাবে চরণ ও কুবিরের দেশ কাল ও সঠিক পরিপ্রেক্ষিত আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা নির্ভরযোগ্য ভাবে মানতে পারি যে, চরণ পালের জন্ম ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে এবং অক্ষয়কুমারের মন্তব্য (১৮৭০ সালে) থেকে বোঝা যায় চরণ দীর্ঘজীবী ছিলেন। কুবিরের জন্ম ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে আর দেহান্ত ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ তাঁর জীবনও বিরানব্বই বছরের দীর্ঘতায় গড়া। এই সব সন তারিখের সঙ্গে প্রতিতুলনার জন্য মনে রাখা ভাল যে আউলেচাঁদ ঘোষপাড়ায় আসেন ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দেব কোন সময়ে।

রামশরণ পালের মৃত্যু ঘটে ১৭৮৩ সালে। দুলালচন্দ্রের জন্ম ১৭৭৬, মৃত্যু ১৮৩৩ সালে। সতী মার মৃত্যু ঘটে ১৮৪৩ সালে।* বাংলার আরেক মরমী সাধক লালন শাহের জন্ম ১৭৭৪, মৃত্যু ১৮৯০ সালে। এইসব তথ্য সাজালে বোঝা যায় 'কর্তাভজা' 'সাহেবধনী' ও 'লালনশাহী মত' এই তিন পরাক্রান্ত লৌকিক ধর্মের উজ্জ্বল সময় গেছে আঠারো শতকের শেষার্ধে এবং তিনটি ধর্মেরই উদ্ভব ও প্রসারক্ষেত্র নদীয়া জেলা। এখানে বেশ কৌতূহলের সঙ্গে আমাদের চোখে পড়ে যে লালন শাহ ছিলেন দুলালচাঁদের দু'বছরের অগ্রজ; কুবির ছিলেন লালনের চেয়ে তেরো বছরের আর দুলালচাঁদের পনেরো বছরের অনুজ। তাঁর লেখা দুলালচাঁদের বন্দনা-গীতি পাওয়া গেছে। এখানে স্মরণযোগ্য যে, নদীয়াজেলার মেহেরপুরে জন্মেছিল আরেক ধর্মসম্প্রদায় 'বলরামভজা'। তাদের প্রবর্তক বলরাম হাড়ির জন্ম ১৭৮৫ এবং মৃত্যু ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে। কুবিরের গানে বলরামীদেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' বইতে ১৮৭০ সালে বিবরণ দিয়ে গেছেন নদীয়া জেলার ভাগা গ্রামের আরেক ক্ষুদ্র ধর্মসম্প্রদায়ের, প্রবর্তককেন্দ্রিক সেই সম্প্রদায়টির নাম 'খুশি বিশ্বাসী'। এরা অবশ্য সহজিয়া নয়। মুসলমান উদাসীন খুশি বিশ্বাসের ধর্মমত ছিল ফকিরিতন্ত্র ঘেঁষা।

স্বভাবত একটা প্রশ্ন ওঠে যে, আঠারো শতকে শুধু নদীয়া জেলার বিভিন্ন অংশেই এতগুলি লৌকিক ধর্ম উদ্ভূত হ'ল কেন? আর একটি জিনিস লক্ষ না করে পারা যায় না যে এই গৌণ ধর্মগুলিতে উচ্চবর্ণের মানুষ কখনও ঠাঁই পায়নি (কর্তাভজাদের ব্যতিক্রম বাদে) এবং এগুলির প্রবর্তক বা প্রধান গুরু হয় একজন ব্রাত্য অন্ত্যজ না হয় নিম্ন বর্ণের মানুষ। কর্তাভজাদের রামশরণ সদগোপ, সাহেবধনীদের চরণ পাল গোয়ালা। বলরামভজাদের বলরাম জাতে হাড়ি, খুশি বিশ্বাস জাতে অকুলীন দরিদ্র মুসলমান আর লালন শাহ ধর্মান্তরিত বাউল। একটি মাত্র জেলায় এতগুলি লোকধর্মের আকস্মিক সন্নিপাত কী কারণে? জনগোষ্ঠীর বিন্যাসে এর কি কোন সদুত্তর পাওয়া সম্ভব? নাকি অন্যতর কোন সূত্রে এর জবাব মিলবে?

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, পলাশীর যুদ্ধের আগে-পরে প্রায় পঞ্চাশ বছরের

* আউলেচাঁদ, রামশরণ পাল, দুলালচন্দ্র ও সতীমা সংক্রান্ত সন তারিখের সূত্র ডঃ রতনকুমার নন্দীর প্রবন্ধ 'কর্তাভজা সম্প্রদায় ও ঘোষপাড়ার দোলমেলা': দক্ষিণাবিক, ২ বর্ষ ৪ সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৮৮।

বৃত্তে বাংলার রাজনীতি, সমাজ, ভূমিব্যবস্থা প্রভৃতি অনেক কিছুর মধ্যেই লেগেছিল ভাঙনের পালাবদল। গ্রামকেন্দ্রিক বাংলার সাধারণ মানুষের এরই মধ্যে নানা দোলাচলে পড়ে মানসিক ভারসাম্য হারাচ্ছিল। সুদীর্ঘ ব্রাহ্মণ্য শাসন এবং ব্রাহ্মণ সমাজপতিদের একচেটিয়া অগ্রাধিকার শূদ্র ও অন্যান্য নীচ জাতীয়দের শোষণের চরম স্তরে এনে ফেলেছিল। শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের একশো বছরের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের একটা অংশ মননশীল শাস্ত্র প্রাধান্যে মূল জনগোষ্ঠীর চেয়ে উচ্চ মার্গে উঠে গিয়েছিল আর বৈষ্ণব ধর্মের যে-সাধারণ বিপুল অংশ তাদের মধ্যে এসে গিয়েছিল বিকৃতি ও বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাব। ইতিমধ্যে নদীয়া জেলায় কুষ্টিয়া এবং মুর্শিদাবাদ ও যশোহর জেলায় শুরু হয়ে যায় সুফি সাধকদের আনাগোনা। তাদের উদার ধর্মপ্রচারের পাশে মোল্লাতন্ত্রের কোরাণ ও নামাজ সম্পর্কে বাড়াবাড়ি খুব কট্টর পর্যায়ে ওঠে। সাধারণ মুসলমান এবং অনেক শূদ্রবর্ণের হিন্দু আকর্ষণ বোধ করে সুফিধর্মের আহ্বানে। এই সময় ঐ সব জেলায় যে সব-সুফি প্রচারক তৎপর ছিলেন তাঁদের নাম প্রণয়ণ করেছেন ডঃ আনোয়ারুল করীম তাঁর 'বাউল সাহিত্য ও বাউল গান' বইতে। তাঁদের মধ্যে প্রধান নামগুলি: হেরাজতুল্লাহ, খোন্দকার হোসেন শাহ, কিনু শাহ ফাকর, মামুদ জাহির, বরখান গাজী, চাহার আউলিয়া। এইসব সুফি ফকিরদের কেউ চিস্তিয়া কেউ কাদেরীয়া গোষ্ঠীর। তাঁদের উদার স্বভাব, সরল জীবন-যাপন এবং ধর্মের হার্দ্য ব্যাখ্যা খুব সহজে আকৃষ্ট করল বিভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট সাধারণ মানুষদের। কর্তাভজাদের আউলেচাঁদ বা সাহেবধনীদের প্রবর্তক উদাসান ব্যক্তিটি হয়ত মূলে একজন সুফি প্রচারক। এসব ধর্মের উদারতন্ত্র ও সমন্বয়বাদে সুনিশ্চিতভাবে তারই ইঙ্গিত।

বাংলাদেশের তাত্ত্বিক লেখক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর 'বাউল গান ও দুদ্দু শাহ' বইয়ের ভূমিকায় এক দিকনির্দেশী মন্তব্যে বলেছেন: 'সুফী প্রভাব বাউল মতবাদের চেয়ে বাউলদের জীবনযাপনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।' এ মন্তব্যের বিস্তারে তিনি ব্যবহার করেন The Social Structure of Islam বই থেকে Ranben Levy-র মন্তব্য যে, Since morality, in large measure, though not entirely, concerns man as a social being some of the more enlightened of the sufis insisted that the true saint lives among his fellow-men, trades with them, marries and takes part in social activities without ever forgetting God for a moment.

এবারে বুঝতে অসুবিধে নেই যে, সতেরো আঠারো শতকে এদেশে যেসব সুফি প্রচারক এসেছিলেন তাঁদের উজ্জ্বল নীতিনিষ্ঠ জীবন যেমন শূদ্রদের প্রভাবিত করেছিল অত্যাচারী ব্রাহ্মণ ও মোল্লাদের প্রতিতুলনায়, তেমনি ব্রাহ্মণ ও কট্টর মুসলমানদের মত দর্পিত উচ্চাসনে বসে শোষণ না করে তাঁরা মিশে গিয়েছিলেন জনগোষ্ঠীতে। ভাবের লেনদেন, প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কার মেনে সমাজের সঙ্গে একাঙ্গ হয়ে গিয়েছিলেন। অবহেলিত অপমানিত সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁরা এঁকে দিয়েছিলেন বিশ্বাসের ছবি। তাই সরল বিশ্বাসে ভক্ত গ্রাম্যমানুষ এক নিঃশ্বাসে রাধাকৃষ্ণ আল্লারসুল আউড়েছে। ধর্মসাধনায় শ্বাসযন্ত্রের কাজ (দমের কাজ) যা একান্তই সুফিসাধনসম্পৃক্ত, মেনে নিয়েছে। ত্যাগ করেছে সাম্প্রদায়িক চিহ্ন ও মূর্তিপূজা।

বোরহানউদ্দিন আরও অনুমান করেছেন বাউল মতবাদে সুফিজীবনাদর্শের অভিঘাতের আরেক কারণ সমাজ ও রাজনীতিকেন্দ্রিক। তাঁর ভাষায় :

> বাউল মতবাদের প্রভাব সমাজের যে অংশে পরিব্যাপ্ত সেই কৃষিজীবী জনসাধারণ সপ্তদশ শতাব্দীতে মর্মাহত বিস্ময়ে উপলব্ধি করেছে, বৌদ্ধ কিংবা ব্রাহ্মণ্য যুগে তাদের সামাজিক স্থান যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেছে। ...ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ তাই তাদের সান্ত্বনা ও ক্ষতিপূরণ। মানবিকতাবাদ ধর্মপ্রত্যয়ের মাধ্যমে তাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়েছে, ঐ ধর্মপ্রত্যয়ই সমাজজীবনে বঞ্চনার জন্য সান্ত্বনা জুগিয়েছে ঐ ধর্মপ্রত্যয়ই ক্ষতিপূরণের সান্ত্বনা এনেছে মানবিকতার পথে।...যে-কৃষিঅতীত তাদের স্রোতের উৎস সেখানে তাদের অবস্থান নয়, আর যেখানে তাদের অবস্থান সেখানে তাদের সামাজিক অস্তিত্ব নেই, লোকজ ধ্যান-ধারণায় তাদের জীবন জড়ানো, অথচ ঐ ধ্যান-ধারণা জীবনে তাদের প্রতিষ্ঠা এনে দিতে পারে না, তাই ঐ ধ্যান ধারণার সঙ্গে অতীন্দ্রিয় প্রতিশ্রুতির সম্বন্ধ সাধনের মধ্যে দেহ-তরণীর হাল ধ'রে সংসারে জীবনযাপনের তাদের মুমূর্ষু চেষ্টা।

এতসব সমাজ রাজনীতি ধর্মীয় কারণ নির্ণয়ের পরও সমাজবিজ্ঞানীর একথা মনে ওঠেই যে, একটা বিশেষ জনপদের সাংস্কৃতিক একটা বিশেষ কালে যখন পাঁচটি প্রবল গৌণধর্ম জন্ম নেয় তখন তার পশ্চাদ্‌পটে জনবিন্যাসের একটা বিশেষ ছক থাকতেই পারে। সে-তথ্য সাজাবার আগে মনে রাখা জরুরী নদীয়া জেলা বরাবর কৃষিভিত্তিক এবং এখানে জমিগুলি স্বর্ণপ্রসূ নয়। তারওপর বৃটিশ শাসনের আগে পরে অনাবাদী ও পতিত জমি এ জেলায় ব্যাপক ছিল।

অবশ্য এখন যাকে নদীয়া বলি আঠারো উনিশ শতকে তার বিস্তার ছিল বহু ব্যাপক। নদীয়া বলতে তখন বোঝাত দেশবিভাগের আগেকার অখণ্ড নদীয়া অংশ ছাড়াও বর্ধমান, ২৪ পরগণ, মুর্শিদাবাদ, যশোহর ও হুগলীর কিছু অংশ। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া জেলার এলাকা ছিল ৩,৬১৪ বর্গমাইল। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের আগে এই এলাকা দাঁড়ায় ২,৮০০ বর্গ মাইল আর ১৯৭১ সালে আদমসুমারি-মতে নদীয়া জেলার বর্তমান সীমা মাত্র ১,৫১৪.৯ বর্গমাইল। কাজেই আমাদের উপস্থিত আলোচনা নদীয়া বলতে বোঝাবে ৩,৪১৪ বর্গমাইল বিস্তৃত ভূখণ্ড যার মধ্যে পড়বে কল্যাণীর ঘোষপাড়া (কর্তাভজা) দেবগ্রামের ভাগা (খুশি বিশ্বাসী), বর্ধমানের অগ্রদ্বীপ ও পাটুলি-কাটোয়া (সহজিয়া স্রোত), নবদ্বীপ (বৈষ্ণব কেন্দ্র), চাপড়ার বৃত্তিহুদা (সাহেবধনী), মেহেরপুর (বলরামভজা) এবং কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়া (লালনের সাধনক্ষেত্র)। এইসব বিখ্যাত লোকধর্মের সাধনতীর্থের বাইরে ছিল আরও অনেক অল্পজ্ঞাত ধর্মের আসন। প্রসঙ্গত নদীয়া বৃত্তিপাড়ার তিনকড়ি নামে লোকগীতিকার নদীয়ার খ্যাত-অখ্যাত লোক-সাধকদের নাম ও সাধনক্ষেত্র নিয়ে যে-গান বেঁধেছিলেন এখানে তার উদ্ধৃতি খুব চমকপ্রদ হবে।

সর্বচরণে পাপীর এই নিবেদন।
আউলে বিসমিল্লা বর্ত দোয়েমে পাঁচ পঞ্চতন ॥

আব আতস খাক বাদ শুনি
স্বর্গ মর্ত পাতাল ভূমি
কিবা দিনরজনী চন্দ্রসূর্যের বয় কিরণ ॥

সাঁই সাহেবের মসজিদ খানা
মাধবপুরে তার ঠিকানা
রহিম শা' করিম শা' দুজনা
আসাবেড়ের পতিতপাবন ॥

ভিটেপাড়ায় মদন শা'র আসন
ডোমপুকুরের বিশ্বেস বদন
ঘোষপাড়ায় সতীমার আসন
হুদোপাড়ায় পাল চরণ ॥

কেরামতউল্লা হুজুরমিঞা
শরীয়তে দুজনা দিয়া
পাঞ্জু খোন্দকার ময়ফুদ্দি শা
এদের নিয়ে হয় পঞ্চজন ॥

যাদুবিন্দু এরাই দুজনা
পাচলখি গাঁয় তার ঠিকানা
শেওড়াতলায় আহাদ সোনা
আরও আছে কতজন ॥

ঘোলদড়িয়ায় পাচু শা'র আসন
গরীব গোঁসাই নারায়ণ চেতন
উদয়চাঁদ কোদাই শা' দুজন
আনন্দমোহিনী আর মদন ॥

চড়ুইতে শুকুর শা' রয়
বৃত্তিপাড়ার তিনকড়ি কয়
কামারপাড়ায় ভোলাই শা' রয়
চেঁউরিতে দরবেশ লালন ॥

বাণাবন্দের শ্যাওড়াতলায় আহাদ মিঞার সাধনপীঠে অম্বুবাচী মেলায় এই চমৎকার গানটি আমি সংগ্রহ করি ১৯৭০ সালে, একজন অনামা ফকিরের কণ্ঠ থেকে। নদীয়ার লোকধর্ম ও সাধকদের এক তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস এ-গানে গাঁথা।

এবারে আলোচনা করা দরকার নদীয়াজেলার জনবিন্যাসের। ১৮৭৫ সালে W.W. Hunter তাঁর A Statistical Account of Bengal বইতে নদীয়ার বিভিন্ন জাতির এক তালিকা প্রণয়ন করেন। তাঁর মতে সে সময়ে নদীয়ার স্পৃশ্যজাতি বলতে বোঝাত :

ব্রাহ্মণ, রাজপুত, বৈদ্য, ক্ষত্রিয়, ভাট, কায়স্থ, মাড়োয়ারি, গন্ধবণিক, আগুড়ি, বারুই (পানব্যবসায়ী), তাম্বুলী, তেলী, সদ্‌গোপ, মালি, কামার, কাঁসারি, কুমোর, শাঁখারি, নাপিত, ময়রা, গোয়ালা, গরেরি, কেওড়ি,

কৈবর্ত, চাষাধোপা, সুবর্ণবণিক, স্যাকরা, বৈষ্ণব, ছুতোর এবং তাঁতি।

হান্টার উল্লিখিত অস্পৃশ্য জাতি :

শুঁড়ি, ধোপা, যুগী, কলু, কপালী, পুরা, মালো, মাঝি, পাটনী, বাজবংশী, পোদ, তিওর, বেহারা, কাহার, ধমুক, মুড়ি, চুমুরি, চণ্ডাল, কান, বেলদার, কোরা, বাইতি, বাগদী, বাহালিয়া, বাড়ুই (মৎস্যজীবী), ডোম, ভুঁইয়া, গাঁড়াল (যারা চিঁড়ে কোটে), বিন্দ, চেইন, দোশাদ, চামার, ভুঁইমালি, মাল (সর্পজীবী) তুরি, পাসি, মহিলি, বুনো, বেদে, হাড়ি, শিকারী, কুড়া (শূকর ব্যবসায়ী) মিস্তিরি, মুর্দফরাস ।

হান্টার নদীয়াজেলার মুসলমানদের অন্তর্গত নিম্নজাতিদেরও চার ভাগ উল্লেখ করে দেখিয়েছেন :

নিকিড়ি (মৎস্যজীবী) নলুয়া (মাদুর বানায় যারা) জোলা (তাঁতি) এবং কলু (তৈল প্রস্তুত কারক)।

এখন বোঝা সহজ হবে যে, জনবিন্যাসের এই সামগ্রিক প্রভাবে নদীয়ায় গড়ে উঠতে পেরেছিল অতগুলি গৌণধর্ম এবং তাদের অজস্র দীক্ষিত মানুষ। গ্রামের সাধারণ নানা বৃত্তিজীবী গরীব লোক সেকালে খুব পরস্পর-নির্ভরশীল ছিল। দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা মেটাতে তারা ছিল ঘন সম্পৃক্ত। উচ্চ-সমাজের ধর্ম ও অর্থনীতির শাসন-শোষণ তাদের সমানভাবে ভাগ ক'রে নিতে হত। এইভাবে তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল এক হৃদয়ের বন্ধন। তাই কোন উন্নত আদর্শের মানুষ যখন তাদের পরিত্রাতার ভূমিকায় এগিয়ে আসত তখন এক একটা গ্রাম তাদের কাছে দীক্ষিত হত। এই ধর্মের সম্প্রদায়ী মানুষ এত গরীব ছিল যে উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে দ্রোহমূলক এই ধর্মাচরণে তাদের কিছু হারাবার ভয় ছিল না। এইসব দুর্দম ও জীবন্ত লোকধর্ম সংখ্যায় হয়ত বেশি ছিল না, পরাক্রমে ছিল হীনবল, কিন্তু বাংলার সমাজ-ইতিহাসে তাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন মনোভাব এখনও পর্যন্ত অবিস্মরণীয়।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে আজপর্যন্ত সাহেবধনী সম্প্রদায়ে কোন ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ জাতীয় উচ্চবর্ণের মানুষ যোগ দেয়নি। কর্তাভজাদের ক্ষেত্রে এমন ঘটেনি, সে ধর্মে উচ্চবর্ণের মানুষ দীক্ষা নেন। তাছাড়া শোনা যায় কেরী মার্শম্যান ও আলেকজাণ্ডার ডাফ সাহেব ঘোষপাড়ায় যেতেন। রামমোহন রায় উৎসাহিত ছিলেন কর্তাভজা ধর্মতত্ত্বে। নবীনচন্দ্র সেন তাঁদের সম্বন্ধে উন্নত ধারণা পোষণ করতেন। সেকালের ভূকৈলাশের মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল

স্বয়ং বৈষ্ণব হয়েও কর্তাভজাদের শ্রদ্ধা করতেন। অবশ্য এই উচ্চবর্ণের সংক্রাম কর্তাভজা ধর্মে ভাঙন ধরায় এবং কৃষ্ণকিঙ্কর গুণসাগর ও শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় ঘোষপাড়ার পালেদের কর্তৃত্ব অস্বীকার ক'রে বাঁশবেড়িয়ায় 'রামবল্লভী' সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। রামবল্লভ নামে এক শৈব এঁদের প্রবর্তক। পাঁচঘরা গ্রামে শিবচতুর্দশীর দিন হ'ত এঁদের বাৎসরিক উৎসব। এঁদের সমন্বয়বাদী উপাস্য ছিলেন 'কালী কৃষ্ণ গড খোদা'।

যাইহোক, সাহেবধনীদের মধ্যে নিম্নবর্ণের সংখ্যাগরিষ্ঠতা, অস্পৃশ্যদের সমাদর মুসলমানদের সংযোগ খুব লক্ষণীয়। অগ্রদ্বীপে এ-সম্প্রদায়ের যে বাৎসরিক সমাবেশ আজও হয়, সেখানে গত এক দশক যোগ দিয়ে আমি এতথ্যের স্বীকৃতি পেয়েছি। এছাড়া বৃত্তিহুদার পালবাড়িতে সংরক্ষিত 'অগ্রদ্বীপের খাতা' পরীক্ষা ক'রেও ঐ সত্য স্পষ্টতর হয়। উদাহরণত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ৭০ বছর আগেকার 'অগ্রদ্বীপের খাতা' (১৩২১ বঙ্গাব্দ) থেকে সমবেত ফকিরদের নাম, পদবী ও ঠিকানা। এরা সবাই সাহেবধনী সম্প্রদায়ভুক্ত এবং অগ্রদ্বীপের আসনে সে বছর খাজনা দিয়েছিলেন।

কালীচরণ, রাধানাথ, ক্ষেত্রনাথ, কেদার, তেঁতুল, বাণী, দীন ও অনুকূল ঘোষ (বৃত্তিহুদা), কেদারনাথ পাল (বীরপাড়া), কোকিল সেখ (পাঁচ-মেলা), হারানী বিবি (বৃত্তিহুদা), মোকাম হালসানা (ঘূর্ণী), গহর সেখ (আড়ংসরিষা), প্রতাপ পাড়ুই (ডোমপুকুর), কেদার শাহ (দরিয়াপুর), নবীন দাস (শান্তিপুর), রজনী ঘোষানী ও কান্তি মিস্ত্রি (বাঙালঝি), রব্বানী দফাদার (গোখুরাপোতা), ছকু মল্লিক (বারুই পাড়া), ফটিক পাল (পাঁচ ভাঁড়া), খাতের হালসানা (মুণ্ডমালাপাড়া), যাদু ঘোষ (চকবিহারী), খোজি শাহ, দেরাজ গান (চারাতলা), মিঞাজান মোল্লা (নওদাপাড়া), কোপান শাহ (চাঁদঘর), আবু বিশ্বাস (বড় শিমলি), কালাচাঁদ মোল্লা, মেহের শাহ, চন্দ্র হালসানা (ধন্তেপুর), বিবি ফাকি, ফুল শাহ (তালুক-হুদা), কালি শাহ, গোকুল ঘোষ, ফণী শাহ (ধোপট), রায়বাড়ি মণ্ডল, মুটু হালসানা, ভক্ত খাদিম (পলশুণ্ডা), পঞ্চু শাহ (সোনাতলা), নটবর দাস, নজরদ্দি সেখ, হাজারী, মহেন্দ্র পাড়ুই (পীতাম্বরপুর), হাচেলাদ্দি ফকির, রসিক দাস (লোহাগাছি), বেনীমাধব মণ্ডল (বয়ার বাঁধা), জানকী গরাই (হাঁসপুকুর), এতবার শাহ (বেনাদহ), বাণীকান্ত স্বর্ণকার (চড়ুই-ঢিবি), অবিলাস পাড়ুই (ঘোষপুর), গয়াচরণ দাস (শিবনগর), ব্রজ ঘোষ

(বেলপুকুর), বেহারী খাদিম (ডিঙ্গেল), মহামায়া বিবি (হরনগর), মনোহর দাস (কাগরহুদা), ইংচাঁদ ফকির (চাঁদপুর), বাঘা দাসী, সুশ্বর মল্লিক (কেশেডাঙ্গা), বেহারী শাহ (শলি), গোপাল শাহ, ফকির দাস (বাগুন্দে), দরবারী রাজবংশী (সদাগরপুর), গোলাম শাহ (বানগড়িয়া), মেঞাজান খাদেম (যমপুকুর), ভুবন শাহ (তেহউ), রংনাল শাহ (কুল-গাছি), হেদাত শাহ, রাখাল মাল (ঘোড়াইক্ষেত্র), কায়েম শাহ (হাজরা-পোতা), পবন শাহ, (নলদহ), হরি শাহ, তোপেন শাহ (বিক্রমপুর), উত্তম শাহ (গাবকুলা), সেকান্দর মণ্ডল (কোমখানা), রামগোপাল দাস (বামুন পুকুর), ব্রজদাসী (কাপাসডাঙ্গা) লক্ষণ পাড়ুই (নাটনা), পাগল দাস (বহরমপুর), বারি শাহ (দেয়ম), এবায়েত হালসানা (ধাপাড়িয়া), খুশি দাওয়ান (শালিগ্রাম), বাহির শাহ (দিকবরেয়া), ফড়িং শাহ (বহিরগাছি), গগন মণ্ডল (রুদ্রনগর), গোকুল হালদার (মেচপোতা), মিস্টু মল্লিক (রাধানগর), সূর্যকান্ত (কমলবাটি)।

এ-তালিকায় হিন্দু মুসলমানের অনুপাত লক্ষ করবার মত। সাহেবধনীদের মধ্যে স্ত্রীলোকরাও মন্ত্রদাত্রী গুরু হতে পারেন (কর্তাভজাদেরও এই রীতি আছে) তার প্রমাণ এই তালিকার নারী ভক্তের অস্তিত্ব থেকে বোঝা যায়। তালিকার নব্বই জন সম্প্রদায়ীর মধ্যে একজনও যে উচ্চবর্ণের মানুষ নেই এই বিবরণটুকু আমাদের আগেকার অনুমানকেই প্রতিষ্ঠিত করে।

সাহেবধনীদের গানে হিন্দু-মুসলমান সমন্বয়বাদের কথা যে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়েছে তার একটা কারণ এ-ধর্মের উৎপত্তিতে একজন মুসলমানধর্মের মানুষের সংযোগ ছিল। আর একটা কারণ এ-ধর্মের পোষকতা ও পরিবহণ করেছে প্রথম থেকে আজপর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান যৌথভাবে। সম্ভবত সেই কারণে এ-ধর্মের মূলগুরুকে বলা হয় ফকির, তাঁর কাছে থাকে ফকিরি দণ্ড। অগ্রদ্বীপের উৎসবে সাহেবধনীদের মূল ফকির মাথায় ঘোমটা দিয়ে বসেন (আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য), এটা সুফিধর্মের বিশিষ্টতা। এ ছাড়া সাহেবধনীদের গানে খ্রীষ্টীয় প্রভাবও বেশ লক্ষ করা যায়। তার কারণ বৃত্তিহুদার খুব কাছে রাণাবন্দ গ্রামে ক্যাথলিক চার্চ গড়ে ওঠে ১৮৩৮ সালে। বৃত্তিহুদা থেকে ৬ মাইল দূরে চাপড়ায় প্রোটেস্ট্যাণ্ট খৃষ্টমণ্ডলী গড়ে ওঠে ১৮৪০ সালে। সাহেবধনীদের গীতিকার কুবির গোঁসাইয়ের মৃত্যু ঘটে ১৮৭৯ সালে। কাজেই তাঁর সাধনপীঠের: খুব

কাছের খৃষ্টমণ্ডলীর প্রভাব তাঁর শেষবয়সের ভাব চেতনায় স্পর্শ করেছিল। তাই তিনি অনায়াসে লেখেন :

দশ আজ্ঞা পালন কর।
প্রভুর নামের গুণে দিব্যজ্ঞানে ত্রিভুবনে ডংকা মারো॥

পরহিংসা কোরো না রে ভাই—
ওরে আপনি যেমন পরকে তেমন ভাবো সদাই।
ভাবেতে ভাব উপজিবে বাড়িবে প্রেম-অঙ্কুর॥

নিয়ত কর গো প্রভুর নাম
বসে সাধুর সনে চন্দ্রদিনে কর হে বিশ্রাম
প্রার্থনায় করিবেন কৃপা আপনি পরমেশ্বর॥

অতি স্বভাবেতে স্বধর্মেতে কর মগন।
জ্ঞান হবে উজ্জ্বল বাতি নামের মালা গলায় পরো॥

গোঁসাই চরণ বলেন কুবিরকে
প্রেম করো যুতে প্রভুর সাথে পরম সুখে।
শুনো রে সাফ অর্থ বলি ঈষু করিবেন নিস্তার॥

এই গানের খৃষ্টীয় সূত্র থেকে যেমন সাহেবধনীদের ধর্মমতের উদার স্বভাব ও গ্রহণধর্মিতা প্রমাণিত হয় তেমনই বোঝা যায় লোকধর্মে ছুৎমার্গ প্রায় নেই। তারা বাউলের আলখাল্লার মত সব বর্ণের সারকথা নিয়ে নেয় এবং তাতে ধর্ম টেঁকসই হয়। কিন্তু এর একটা উলটো দিক আছে। ১৮৪০ সাল থেকে চাপড়ার প্রোটেস্ট্যাণ্ট খৃষ্টমণ্ডলী গড়ে ওঠার পর (বস্তুত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে) নদীয়া জেলায় খৃষ্টানধর্মে সাধারণ মানুষের ধর্মান্তরিত হবার ঘটনা ব্যাপকভাবে ঘটেছে। মূলত দারিদ্র্যমোচন এবং অন্যান্য ঐহিক লোভে চাপড়া থানা এলাকার অগণিত গ্রামের মানুষ খৃষ্টধর্মে যোগ দেয়। সাহেবধনী ও অন্যান্য লোকধর্মের ভক্তসংখ্যা ও দীক্ষিতের দল যে ক্রমশ ক্ষীয়মাণ তার একটা বড় কারণ ধর্মান্তরকরণ। এই ধর্মান্তর যখন হয়েছে তখন গ্রামকে গ্রাম একসঙ্গে ধর্মত্যাগ করেছে। মনে রাখতে হবে নদীয়া জেলায় উচ্চবর্ণের হিন্দু বা মুসলমান খৃষ্টধর্মে বেশি যাননি (যেমন ঘটেছিল কলকাতা ও ২৪ পরগণায়), ধর্মান্তরিত হয় নিম্নবর্ণের হিন্দু ও গরীব মুসলমান। এই ধর্মান্তর নদীয়াতে উনিশ শতকের

তৃতীয় দশক থেকেই কতটা প্রবল ছিল তার তথ্যমূলক প্রতিবেদন পাওয়া যায় Church Missionary Society-র কার্যক্রমের প্রতিবেদনে। এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য The History of the Church Missionary Society, its Environment, its men and its work বইয়ের প্রথম খণ্ড। লণ্ডন থেকে প্রকাশিত ১৮৯৯ সালের এই বইয়ের লেখক Eugena Stock জানান :

In 1831, one of the German Missionary at Burdwan, W. J. Deerr, visited Nadiya, a sacred Hindu town, and the birth place of Chaitanya, the Vaishnava reformar of the sixteenth century. Thence he crossed the river Hooghly and made his way to another important town, Krishnagar, where he started a Vernacular School... In a village Deerr come across some members of a curious community called Karta Bhoja, 'worshippers of the creator', one of the numerous sects, half Hindu and half Moslem, which have from time to time risen up to protest against this tyranny of the Brahmans. In 1833, thirty persons of the sect was baptized in the face of much persecution. The movement went on without much being said or thought about it, until 1838, when suddenly the leading men in ten villages, including with their families some five hundred souls, simultaneously embraced the Gopel of Christ, and after some months instuction, were baptized. The Society at home heard of it early in 1839.

The Bishop commissioned Arch Deacon Dealtry and Krishnamohan Banerjee, who was now a clergymen, to Krishsnagar and report. They found that the whole population of fifty five villages were desirous to become christians. The movement had been fostered by the unselfish kindness of Mr. Deerr and his helpers when

an inundation destroyed the crops and to that extent temporal motives were at work ; but the **Gurus** of the sect themselves, who would be losers and not gainers by becoming christions, were also among the seeking crowd. Dealtry and Banerjee, together with Sandys and Weitbruct, who had also hastened to the district, baptized at once five hundred persons who had already been some time under instructions.

ধর্মান্তরকরণের এই রোমাঞ্চকর প্রতিবেদন থেকে উঠে আসে আমাদের লোকধর্মের সকরুণ **আত্মবিচ্ছেদ** ও মর্মন্তুদ অবসাদের কাহিনী। এই বিবরণে খৃষ্টধর্মের যে নির্লোভ নিঃস্বার্থ পরিত্রাতার ভূমিকা ফুটে ওঠে বাস্তব ঘটনা অবশ্য সর্বাংশে তা নয় এমন সন্দেহ উঠবে। সে সময়ের গরীব মানুষগুলিকে অর্থ ও বাসস্থানের সুনিশ্চিত আশ্বাস দিয়েই কি ধর্মান্তরিত করা হয়নি ?

এই ভাবে এই পথে সাহেবধনীরাও অনেকাংশে বিলুপ্ত হয়ে গেছে চাপড়া এলাকায়, এ কথা বিশ্বাস করবার কারণ আছে। তাহলে ঘটনাটা এই দাঁড়াল যে একদা একদল শোষিত ও বঞ্চিত মানুষ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিরুদ্ধে তৈরি করেছিল নিজেদের ধর্ম আর বিশ্বাস ; আবার তাদেরই উত্তরপুরুষ মাথা নত করল রাজশক্তিসমর্থিত প্রবল এক প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের কাছে ? কুবির গোঁসাই কি এইজন্যই লিখেছিলেন : 'সাতসমুদ্র পার হয়ে বাংলায় রাক্ষস এলো' ?

'একটি বৃক্ষের দুটি শাখা'

সাহেবধনী সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান ও আরো খুঁটিনাটি জানতে গেলে কর্তাভজাদের কথা আগে জানতে হবে, কেননা সাহেবধনীরা যে কর্তাভজাদের উপশাখা একথা অক্ষয়কুমার দত্ত থেকে আরম্ভ ক'রে অনেকে অনুমান করেছেন। সত্যিই তাই কিনা অথবা অন্য কিছু, তার নির্ণয় সম্ভব হবে এই দুই উপধর্মের প্রতি তুলনা করলে। প্রাথমিক বিচারে দেখা যায় কর্তাভজা ধর্মের সূচনা সাহেবধনীদের আগে। এ ধর্মের প্রবর্তক আউলেচাঁদ আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে (আনুমানিক ১৭৫৬ সাল) সম্প্রদায়ের প্রথম গুরু রামশরণ পালকে দীক্ষা দেন এবং আউলচাঁদের ২২ শিষ্য মিলে কর্তাভজা ধর্মের সৃষ্টি করেন। (আর সাহেবধনীদের প্রধান গুরু চরণ পালের সময়কাল আনুমানিক ১৭৪০-১৮৫০ সাল।) অবশ্য তাঁর পিতার আমলে এর সূচনা। তবে কর্তাভজাদের সংগঠন ও আচারমার্গ যেমন স্থিরীকৃত ও রীতিসিদ্ধ হয়েছে রামশরণের সময়ে, সাহেবধনীদেরও তেমনই চরণ পালের সময়ে। এই ভিত্তিতেই বলা যায় যে সাহেবধনী ধর্মমত কর্তাভজার অনুজ। দ্বিতীয় প্রমাণ, কুবির গোঁসাইয়ের গানে উল্লিখিত দুটি প্রসঙ্গ এবং রামশরণের সন্তান দুলালচাঁদের জয়ঘোষণা ক'রে তাঁর লেখা গানের সাক্ষ্য। এখানে কুবিরের পদাংশ পরপর উদ্ধার করা যাক।

১ একটি বৃক্ষের দুটি শাখা বেদবিধিতে নাইক লেখা
সাধকে পায় দেখা অন্তঃপুরী।
জঙ্গীপুর ঘোষপাড়া সত্য কুবির বলে সত্য সত্য
শ্রীচরণ ধরি॥

২ স্মরণমাত্র হয় দৃষ্ট ঈশ্বর পরমকৃষ্ট
লীলার শ্রেষ্ঠ নদেয় অবতরি।
ঘোষপাড়ায় ঘোষণা রেখে জঙ্গীপুর দিনকতক থেকে
গুপ্ত হলেন আপ্তসুখে ভক্ত সঙ্গে করি॥

এখানে 'একটি বৃক্ষের দুটি শাখা' বলতে দুইধর্মের সমকত্ব বোঝানো হচ্ছে। (ঘোষপাড়ায় আবির্ভূত চৈতন্যাবতারই যে জঙ্গীপুরে দেখা দেন সাহেবধনীরূপে

এই লোকবিশ্বাস কুবির বলেছেন। জঙ্গীপুরের (মুর্শিদাবাদ না নদীয়ার অন্য কোন লুপ্ত গ্রাম ?) সঙ্গে বর্তমান সাহেবধনীদের কোন যোগাযোগ অনেক অনুসন্ধান ক'রেও আমি দেখিনি। মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত জঙ্গীপুরে গিয়ে পাওয়া যায়নি কোনো সূত্র। যাইহোক, কুবিরের ঘোষণাদুটি গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য এক বৃক্ষের দুটি শাখা বলতে সমান্তরাল মরমী ধর্মও বোঝায়। দুই ধর্ম পরস্পর পরিপূরক বা বন্ধুতাধর্মী একথাও বোঝায়। কথাটা বিবেচনাযোগ্য এইজন্য যে, সব গৌণধর্ম কর্তাভজাদের সম্পর্কে প্রসন্ন ছিল না। যেমন দেখা যাচ্ছে লালন শাহের শিষ্য দুদ্দু শাহ তাঁর এক পদে লিখে গেছেন খুব বক্রভাবে :

কত মত দেখি এদেশে

ঘোষপাড়া শম্ভুচাঁদে এদেশ জুড়ে গেছে।

আরেকপদে স্পষ্টতই কর্তাভজাদের সম্পর্কে তাঁর অসহিষ্ণুতা ফুটেছে তীব্র বাক্যগঠনে :

ভবে কত মত দেখি

শাক্ত শৈব বৈরাগ্যাদি ন্যাড়ানেড়ীর নামে চালাকি ॥

জ্বেলে হোম করে আরতি

মনে মনে তুষ্ট অতি

পেটের দায়ে বৃক্ষতলে বসতি সকলই ফাঁকি ॥

শম্ভুচাদ* গুরু সত্য মত (* শম্ভুচাঁদ ?)

সতীমার শুনেছি বাত

শিষ্য বানায়ে সবাই, বেড়া ঘরে তিলক মাখি ॥

এই ঘোষপাড়া, গুরুসত্য আর সতী মা-র উল্লেখে যে কোন প্রসন্নতা নেই তা স্পষ্ট। এই অপ্রসন্নতার কারণ দুদ্দু শা লালনপন্থী বাউল। তারা শিষ্যকরণ, গুরুবাদ এসবে বিশ্বাসী নয়। এরপাশে কুবির যখন লেখেন :

কলিকালে বলে দুলালচাঁদের জয়

হিমসাগরের জল খেয়ে মরা মানুষ জ্যান্ত হয়।

বলে গুরুসত্য ঘোষপাড়াতে

কী দিব তার পরিচয় ॥

তখন শুধু প্রসন্নতা নয়, ফুটে ওঠে শ্রদ্ধা। এর পরে দেখা যেতে পারে তাঁর আরেক পদাংশ যেখানে কর্তাভজাদের সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস ধ্বনিত হয় এতদূর আবেগে যে :

ধন্য রে ঈশ্বর লীলে ত্রেতায় রামের লীলে
দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণলীলে।
এই কলিতে শ্রীচৈতন্য নিতাই ॥
সেই চৈতন্য অবতীর্ণ
ঘোষপাড়াতে দেখতে পাই ॥

কুবিরের মনোভাবকে যদি সাহেবধনীদের দৃষ্টিভঙ্গী ব'লে মানতে হয় তবে একথা বিশ্বাস করার কারণ আছে যে কর্তাভজাদের গুরু সম্পর্কে তাদের আস্থা ছিল। তবে কুবির অবশ্য আরেক পদে সবিনয়ে জানান :

আছে আর এক সত্য বাণী
দীনদয়াল সাহেবধনী নামের ধনী
ব্রজের রাইধনী সেই নদেতে উদয়।
সেই নামের জোরে পাপী তরে
শমন শুনে করে ভয় ॥

'আছে আর এক সত্যবাণী' এই বিনত ঘোষণায় একথা বোঝায় না যে সাহেবধনী কর্তাভজাদের শাখা। বরং যেন সমধর্মী সাধনায় আর এক সহযোগী, অবিরোধী সঞ্চরণে যাদের লক্ষ্য এক, যদিও উপাস্য আলাদা, 'করণ' আলাদা, আচারমার্গও অন্যতর। দুই দলকে এই দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখাই যেন অনেক সংগত ও স্বাভাবিক। এই কথা মনে রেখে এবারে উন্মোচন করা যাক কর্তাভজা আর সাহেবধনীদের ক্রমান্বিত ইতিহাস, তাদের উদ্ভব ও বিকাশের সমাজতত্ত্ব, তাদের ভাবনা ও বিশ্বাসের মায়াময় অলৌকিক লৌকিকতা।

কর্তাভজাদের দুইশত বছরের ইতিহাস নানা ঘটনা, কিংবদন্তী ও অলৌকিকতার কাহিনীতে উজ্জ্বল, রোমাঞ্চকর ও কৌতূহলপ্রদ। ঘোষপাড়ায় হিমসাগরের জল আর ডালিমতলার মাটির সংযোগে স্থানমাহাত্ম্যে যে রোগারোগ্যের সাধ ছড়িয়ে গেছে অশিক্ষিত অসহায় পল্লীসমাজে, তারফলে দুইশতক ধরে দোলপূর্ণিমায় কখনও ভক্তের অভাব হয়নি। ১৮৬৪ সালের 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার ৪ঠা এপ্রিল সংখ্যার ঘোষপাড়ার মেলা সম্পর্কে যে প্রত্যক্ষদর্শীর প্রতিবেদন বেরোয় তাতে ৬৫ হাজার লোক সমাগমের খবর মেলে। ১০০ বছর আগেই সেখানে ৬৫ হাজার মানুষ এসেছিল এখন তাহলে সেখানে লোক সমাগম ক্রমশই বেড়ে চলেছে। কেননা সতীমার কৃপায় অন্ধ ফিরে পায় দৃষ্টি, পঙ্গু পায় পা, প্রতিবন্ধী পায় স্বাভাবিক জীবন এই লোকবিশ্বাস বড়

সংক্রামক ও আগ্রাসী। এখানে যারা দুশো বছর ধরে এসেছেন তাঁদের নব্বই ভাগ অশিক্ষিত পল্লীবাসী, আর্ত ও অসুস্থ। একধরনের মধ্যস্বত্বভোগী ব্যক্তি রোগনিরাময়ের নিশ্চিত আশ্বাস দিয়ে তাঁদের আনে। তবে সোমপ্রকাশের ঐ সংখ্যায় অন্য একটি মন্তব্য খুব চাঞ্চল্যকর। তাতে বলা হয়েছে : 'যাত্রীদিগের মধ্যে চৌদ্দ আনা স্ত্রীলোক। কুলকামিনী অপেক্ষা বেশ্যাই অধিক ; পুরুষদিগের সকলেই প্রায় মূর্খ।' এই বিপুল জনসমাবেশ সম্পর্কে ১৮৪৮ সালের ৩০ মার্চ সংখ্যার 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তির যে চিঠি ছাপা হয় তার প্রাসঙ্গিক বক্তব্য খুব অনুধাবনযোগ্য। পত্রলেখকের বিবেচনায় : 'আমরা অল্পবুদ্ধিজীবী মনুষ্য হঠাৎ কোন বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করিতে সাহসিক হই নাই, ঘোষপাড়া ধর্ম্মের নিগূঢ় তথ্য যে পর্য্যন্ত আমরা না জানিতে পারি সে পর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে আমরা কিছুই স্থির সিদ্ধান্ত করিতে সক্ষম হইব না, যদিও এ ধর্ম্ম শাস্ত্রসম্মত নহে ও ইহার বাহ্যপ্রকরণ সমস্ত অনাচারযুক্ত, কিন্তু যখন বহুলোকের ঐ মতের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা এবং ইদানীন্তন বিদ্যার স্রোত প্রবল হইয়া হ্রাস না হইয়া উন্নতি হইতেছে তখন ইহার অন্তরে কিছু সারত্ব থাকিবেক, এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসম্মত নহে।'

আসলে কর্তাভজা ধর্ম প্রথম থেকে এতটাই বিতর্কিত যে এ ধর্মের সত্য ইতিহাস প্রণয়ন খুব কঠিন। বহু বিখ্যাত ব্যক্তি এই ধর্ম সম্পর্কে একজন আরেকজনের সম্পূর্ণ বিপরীত মন্তব্য ক'রে গেছেন। তার মধ্যে থেকে যথার্থ সত্যের নিষ্কাষণ কঠিনতর। যেমন সোমপ্রকাশের সংবাদ দাতার প্রতিবেদন :

> আমাদিগের সংবাদদাতা⋯একটি দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া আসিয়াছেন।⋯ বর্ত্তমান কর্ত্তা ঈশ্বরবাবু একটি শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, অনেকগুলি স্ত্রীলোক তাঁহার চতুর্দ্দিকে বসিয়া কেহ পদ সেবা করিতেছে। কেহ গা টিপিয়া দিতেছেন, কেহ মুখে আহার দ্রব্য প্রদান করিতেছে, কেহ বা অঙ্গে চন্দন লেপন করিতেছে এবং কেহ কেহ বা গলদেশে পুষ্পমাল্য পরাইয়া দিতেছে। আমরাও অনেক লোকের মুখে শুনিয়াছি, এই ধর্ম্মাবলম্বিদিগের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনের প্রকৃত কৃষ্ণলীলাটাই অনুষ্ঠিত হয়। কোন কোন কর্ত্তা কুলবালাদিগের বস্ত্রহরণ করিয়া বৃক্ষে আরোহণ করেন, রমনীরা করযোড় করিয়া বৃক্ষতল হইতে উহা প্রার্থনা করিয়া লয়। এতদ্ব্যতিরিক্ত ভূতছাড়ান, ডাইন ঝাড়ান প্রভৃতি বিস্তর রহস্য আছে। অতএব অনুমান হইতেছে অনেক দুষ্প্রবৃত্তির চরিতার্থতা ও স্বার্থসিদ্ধির আশ্রয়ে ঐ দলের পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে।

এর সম্পূর্ণ বিপরীত মন্তব্য রয়েছে ঘোষপাড়ার মেলার আরেক বিশিষ্ট প্রত্যক্ষদর্শী (১৮৯৫ সালে) কবি নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন' চতুর্থভাগে। তাঁর অভিজ্ঞতা :

দেখিয়াছি, মূর্খ কর্তা দুজন দুই 'গদি'তে বসিয়া আছেন এবং সহস্র সহস্র যাত্রী তাঁহাদের ভক্তিভরে নমস্কার করিয়া এবং প্রণামি দিয়া পদধূলি গ্রহণ করিতেছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমার হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ হইয়াছিল। তাহার উপর এই 'মহাশয়টির' এই সরল ব্যাখ্যা শুনিয়া আমার সেই ভক্তি দৃঢ়তর হইল। আমার বোধ হইল, 'কর্তাভজা' রূপান্তরে হিন্দুদের 'গুরুপূজা' মাত্র। তাহাদের ধর্ম বেদান্তের মায়াবাদের প্রতিবাদ। যে রামশরণ বেদ-বেদান্ত প্লাবিত দেশে এরূপ একটা নূতন ধর্ম প্রচার করিয়া এত লোকের পূজার্হ হইয়াছিলেন, তিনি কিছু সামান্য মানুষ ছিলেন না। যথার্থই কাল্পনিক মূর্তির পূজা না করিয়া এরূপ পূজনীয় ব্যক্তির পূজা করিলে ক্ষতি কি? এখন যে harmony of scripture বা ধর্মের সামঞ্জস্য বলিয়া একটা কথা শুনিতেছি, দেখা যাইতেছে, এই রামশরণ পালই তাহা সর্বপ্রথম অনুভব করিয়াছিলেন। সকল ধর্ম, সকল আচার সত্য—এমন উদার মত এক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোনও ধর্ম সংস্থাপক প্রচার করেন নাই। অতএব রামশরণ পাল, আমি তোমাকে নমস্কার করি। আমি এতদিনে কর্তাভজা ধর্ম কি বুঝিলাম, এবং ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে আমার শিবিরে ফিরিলাম।

মতামতের তফাৎ এতটাই যে মুদ্রিত প্রতিবেদন থেকে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছান অনুচিত। আপাতত আমি তাই চেষ্টা করব একটা নিরপেক্ষ ইতিহাস বর্ণনার এবং যে ব্যাপারে সাহায্য নেব পুরানো নথি, গত একদশকের মুদ্রিত প্রবন্ধ নিবন্ধ থেকে এবং আমার নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার।

কর্তাভজাদের বিশ্বাস যে শ্রীচৈতন্যই আউলচাঁদ রূপে জন্মেছিলেন গৃহী মানুষের জন্য এক আদর্শ ধর্মের ছক বানাতে। সেই কারণে তিনি আনুমানিক ১৭৫৬ সাল নাগাদ ঘোষপাড়ায় আসেন এবং সেখানে রামশরণ পাল নামে এক সম্পন্ন সদ্গোপ এবং বাকি ২১ জন অর্থাৎ বাইশজনকে নিয়ে এক নতুন সমন্বয়বাদী ধর্ম গড়েন যার ভিত্তিতে রয়েছে জাতিবর্ণচেতনার অনুপস্থিতি, গুরুবাদ এবং নানা বাহ্য আচার। রামশরণের সঙ্গে আর যে ২১ জন দীক্ষা নেন তাদের

তিনরকম তিনটি তালিকা পাওয়া যায় তিনটি গ্রন্থে। এর মধ্যে ১৬ জনের নাম তিনটি জায়গাতেই আছে। তাঁদের নাম: বেচুঘোষ, কানাই, নিতাই, নিধিরাম, ভীমরায় (রাজপুত), মনোহরদাস, কিনু গোবিন্দ, ব্রহ্মহরি, আন্দিরাম, নিত্যানন্দ, বিশু, পাঁচু রুইদাস, হটু ঘোষ, নয়ান, লক্ষ্মীকান্ত, গোবিন্দ। কালক্রমে এ সম্প্রদায়ে রামশরণই পান নেতৃত্ব। তাঁর স্ত্রী সরস্বতী দেবীর নাম হয় সতী মা, রামশরণের নাম হয় কর্তাবাবা। ১৭৮৩ সালে রামশরণের মৃত্যু ঘটে, তখন তাঁর শিশুপুত্র দুলালচাঁদের বয়স সাত বছর। কাজেই সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে আসেন সতী মা। পরে ছেলের বয়স ষোলো হলে তিনি তাঁকেই কর্তা করেন। কিন্তু মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে দুলালচাঁদ দেহত্যাগ করায় সতী মা আবার নেতৃত্ব নেন। তাঁর মৃত্যু ঘটে ১৮৪০ সালে। তারপর পাল বংশের উত্তরপুরুষরা পর্যায়ক্রমে কর্তা হ'তে থাকেন। শেষপর্যন্ত কর্তাদের মধ্যে শরিক হয়. এখন গদীর সংখ্যা চার। বর্তমানে প্রধান কর্তা সত্যশিব পাল দেবমহান্ত। এই দেবমহান্ত পদবী প্রথম পান দুলালচাঁদ নদীয়ার মহারাজের কাছ থেকে এমন প্রসিদ্ধি আছে। এখানে উল্লেখ ক'রে নেওয়া যাক যে কর্তাভজাদের মধ্যেও ভাঙন ধরেছিল একসময়। রামবল্লভীদের কথা আগের অধ্যায়ে বলা হয়েছে। এখন বলা যাক কানাই ঘোষের কথা। আউলচাঁদের কাছে দীক্ষিত ২২ ফকিরের একজন ছিলেন কানাই ঘোষ। ঘোষপাড়ায় রামশরণের নেতৃত্বে কর্তাভজা সম্প্রদায় গড়ে উঠলে কানাই ঘোষ সেখান থেকে সরে গিয়ে নিকটবর্তী কাঁচড়াপাড়ায় তাঁর বাসস্থানে গড়ে তোলেন আরেক গৌণধর্ম। এই ধারার নাম 'সত্যস্রোত' বা 'গুপ্ত কর্তাভজা'। এরা নিজেদের ধর্মসাধনা অনেকটাই প্রচ্ছন্ন রাখতে চান। সেই কারণে এর বিকাশ বা জনপ্রিয়তা ততটা ঘটেনি, তবে এ-ধারায় বড় বড় সাধক ও মরমীর আবির্ভাব ঘটেছে। সতীশচন্দ্র দে-র লেখা 'গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী' বইতে এঁদের বিবরণ বিস্তারিত আছে।

'সত্যস্রোত'-ধারা তাদের গোপনতার জন্য যেমন প্রসারতা পায়নি, কর্তাভজা ধারা তেমনই প্রসারিত হয়েছে তাদের রোগারোগ্যের নানা কিংবদন্তীতে, সংগঠকদের দূরদর্শিতায় এবং রামশরণের সন্তান রামদুলাল (১৭৭৩-১৮৩৩) ওরফে দুলালচাঁদের সার্থক ও পরিকল্পিত নেতৃত্বে। মাত্র পঞ্চাশ বছর আয়ু হলেও দুলালচাঁদ ছিলেন উদ্যোগী ও সুযোগ্য ব্যক্তি। আঠারো-উনিশ শতকের বাংলা যুগসন্ধির একজন উল্লেখযোগ্য পুরুষ দুলালচাঁদ। তিনি সংস্কৃত বাংলা ইংরেজি ও পার্শি ভাষায় কৃতবিদ্য ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে কর্তাভজাদের সংখ্যা

বহুগুণিত হয়। ডব্ল্যু. ওয়ার্ড তাঁর গ্রন্থে রামদুলালের ৪ লক্ষ শিষ্যের কথা লিখে গেছেন। অবশ্য ওয়ার্ডের বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮১৮ সালে) শিষ্যের সংখ্যা ২০ হাজারে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য সাহেবধনীদের গীতিকার কুবির গোঁসাইয়ের লেখা দুলাল-বন্দনা, যা সম্ভবত ঘোষপাড়া দোলমেলায় দুলালকে প্রত্যক্ষ দেখেই লেখা :

দুলিছে দুলাল আনন্দ দুলাল লালশশী লাল ফাগুয়া খেলায়।
আবীরে আবৃত হেরি চন্দ্রচূড়া লালে লাল আভা হয়েছে ঘোষপাড়া।
লাল চন্দনের ছড়া লাল কুসুমে বেড়া
চারিদিকে মারে কুমকুমা আবীরা লালে লাল লালায় ॥

এখানে দুলালের বিশেষণে যে 'লালশশী' শব্দটি রয়েছে তা তাঁর সাংকেতিক সম্প্রদায়ী নাম। দুলালের 'লাল' আর চাঁদের শব্দান্তর 'শশী' মিলিয়ে লালশশী নামের সৃষ্টি। এই নামের ভণিতা দিয়ে দুলাল কমবেশি ৬৫০টি পদ লেখেন। সেই গীতিসংকলনটির নাম 'ভাবের গীত'। কর্তাভজারা এই সংকলনের গানগুলিকে বলেন 'শ্রীযুতের পদ' এবং তাঁদের নানা অনুষ্ঠানে এবং বিশেষত শুক্রবারের আবশ্যিক সাপ্তাহিক মজলিশে শ্রীযুতের পদ গাইতেই হয়। 'ভাবের গীত'কে কর্তাভজারা 'আইনপুস্তক' ব'লে মনে করে। বস্তুত এই গানগুলিতে অর্ধ-প্রহেলিকাময় ভাষায় ধরা আছে কর্তাভজাদের সাধনতত্ত্ব ও দর্শন। এই গানগুলির সুরের ধরন ও বিন্যাসে লোকসংগীতের আদল একেবারে নেই বরং উনিশ শতকের কলকাতার বৈঠকী গানের রূপ-রীতি অনেকটাই আছে। উপযুক্ত ব্যক্তি 'ভাবের গীত'-গুলির সুরবিন্যাস ও গীতরীতি নিয়ে গবেষণা করলে বাংলা গানের একটা লুপ্তধারা পাওয়া যাবে।

দুলালচাঁদ তাঁর ধর্মীর সমন্বয়চিন্তায় ও সাংগঠনিক ক্রিয়াকলাপে কর্তাভজাদের দারুণভাবে জাগিয়ে দেন। উনিশ শতকের বাংলার ব্রাহ্মধর্ম থেকে শুরু করে বিভিন্ন উন্নত মানুষের চিন্তায় যে-ধর্মসমন্বয় ও অপৌত্তলিক ভাবদর্শনের বিকাশ ঘটেছিল দুলালচাঁদ তার একটা সুষ্ঠু রূপ দেন। যার ফলে শুধু নিরক্ষর সাধারণ মানুষ নয়, কলকাতা, হুগলী ও ২৪ পরগণার অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি কর্তাভজা ধর্মে দীক্ষিত হ'তে থাকে। রাজা রামমোহন ও ডাফ সাহেব ঘোষপাড়ায় এসেছিলেন ব'লে শোনা যায়। ১৮০২ সালে উইলিয়ম কেরী ও মার্শম্যান দুলালচাঁদের সঙ্গে দেখা ক'রে আলাপ আলোচনা করেন। এমনকি শিকাগোয় অনুষ্ঠিত Religious Congress (১৮৯৩) অনুষ্ঠানে রামদুলালকে Advisory

Council এর সদস্য মনোনয়ন কর হয়। কর্তাভজাদের বর্তমান দেবমহান্ত শ্রীসত্যশিব পাল আমাকে এই তথ্যসহ লিখিতভাবে জানিয়েছেন: 'সেই মর্মে উক্ত সংস্থার পুরাতন চিঠি আছে। উক্ত পত্রের তারিখ ১৭ই এপ্রিল ১৮৯৩। তবে উহার বহুপূর্বে রামদুলাল পরলোক গমন করায় তদানীন্তন দেবমহান্ত সত্যচরণকে স্থলাভিষিক্ত করা হয়।'

দুলালচাঁদের সংগঠন শক্তির একটা বড় নমুনা রয়ে গেছে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের শ্রেণী-বিন্যাস ও পরিভাষা নির্মাণের কৌশলে। এঁদের পরিভাষায় মূল ধর্মকেন্দ্র ঘোষপাড়ার নাম 'নিত্যধাম' বা 'বাড়ি'। মেলায় যেখানে সম্প্রদায়ীরা বসেন সেই গাছতলার নাম 'আসন'। সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির পরিচয় 'ভগবজ্জন' আর সম্প্রদায় বহির্ভূত ব্যক্তিরা 'ঐহিক লোক'। সাধকদের থাক তিনটে: মূলগুরু 'কর্তা', তাঁদের দীক্ষিত মধ্যপর্যায়ের ব্যক্তিদের বলা হয় 'মহাশয়' আর মহাশয়রা যাদের শিষ্য করেন তাঁদের নাম 'বরাতি'। ঘোষপাড়ার মেলায় 'আসন' পাতেন মহাশয়রা তাঁদের বরাতিদের নিয়ে। অর্থাৎ কর্তাভজাদের ভাবগত সংযোগ চলে কর্তা > মহাশয় > বরাতি এই ক্রমে। আর বলা হয়,

> 'কর্তা' এই মানবজমিনের স্বামী। জমির জন্যে যেমন জমির মালিককে রাজস্ব দিতে হয়, কর্তাকেও তেমনি প্রণামী দিতে হয়।

এই প্রণামী বা খাজনা জমা পড়ে কর্তাদের গদীতে। তখন অর্থনৈতিক সংযোগ-শৃংখলটি ঘুরে গিয়ে দাঁড়ায় বরাতি > মহাশয় > কর্তা এই ক্রমে। একই সঙ্গে ধর্ম ও অর্থের এমন পাকা প্রকল্প এ-সম্প্রদায়ের উদ্ভাবকদের বাস্তব বুদ্ধির অভ্রান্ত পরিচয়। রামদুলালের পরে 'কর্তা-দের যে ইন্দ্রিয় দোষ বা অন্যতর পতন ঘটেছিল তার একটা কারণ অর্থাগমের এমন সুনিশ্চিত সরণি।

কেমন ক'রে স্বচ্ছভাবে এই রোজগারের পথটিকে পরিচালনা করা হ'ত তার একটি বিবরণ রেখে গেছেন যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর ১৮৯৬ সালে লেখা Hindu Castes and Sects বইতে। তাঁর মতে অবশ্য আয়ের উৎস রামশরণের পরিকল্পনাজাত। তিনি লিখেছেন:

> Like most other sect founders Ramsaran was a man of great originality. To be ready with a pretext for exacting money from his followers, he declared that he was the proprietor of every human body and that he was entitled to claim rent from every human

being for allowing his soul to occupy his body...... To enforce his right and to give a pecuniary interest to his followers, the Karta appoints the chief men among the latter as his bailliffs and agents for collecting his revenue. The majority of the dupes of the sect are women who readily pay the small tax that is demanded of them, for the sake of securing long life to their husbands and children.

The agents of the Karta are required to pay over their collections to him, at a grand levee held by him at his family residence in the month of March.

সাম্প্রতিককালে ডঃ সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত 'কর্তাভজা ধর্মমত ও ইতিহাস' (১৩৮২) বইয়ের অন্তর্গত 'ঘোষপাড়ার মেলা ও প্রাণভোমরা' প্রবন্ধে মানিক সরকার অনেকগুলি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তুলে লিখেছেন :

আউলচাঁদের প্রথম বাইশজন ফকিরের মধ্যে আবার চারজন প্রধানতম ফকির হন। তাতে নাকি রামশরণের নাম পাওয়া যায়। প্রধান চারজন সদ্‌গোপ, কলু, গোয়ালা, মুচি সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।·· চারজন প্রধান শিষ্যের মধ্যে রামশরণ পাল 'কর্তা' হলেন। কিন্তু কিভাবে হলেন, কি ক'রে হলেন তার কোন তথ্য এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। 'কর্তা' নাই বা হলেন, আর তিনজন প্রধান শিষ্য কোথায় গেলেন? তার কোন উত্তর নেই। এই প্রসঙ্গে মনে আসে এখানকার জমিদারটা তখন মুচি, কলু বা গোয়ালাদের হাতে ছিল না। তা সদ্‌গোপদের হাতে ছিল। রামশরণের পর বংশানুক্রমে রামদুলাল ও ঈশ্বরচন্দ্র 'কর্তা' হন।···· এ ধরণের ঘটনা বাংলার সামন্ততান্ত্রিক জীবনধারার ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

বংশানুক্রমিক 'কর্তা' এবং কর্তার সর্বময় হয়ে ওঠার মধ্যে গণতান্ত্রিক জীবনবোধ অপেক্ষা সামন্ততান্ত্রিক প্রভাব বেশি। নীল বিদ্রোহের অন্যতম পীঠস্থান, 'ফারজী' সম্প্রদায়ের কর্মচঞ্চল কেন্দ্র, তিতুমীরের বিচরণভূমি নদীয়াতে গুরুবাদী ও কর্তাভজনা তত্ত্বের সহায়তায় জমিদারতন্ত্রকে নিরুদ্বিগ্ন রাখবার একটা পরোক্ষ উপায় হিসাবে একে সচেতন ভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

ইতিহাস রচনায় সমসাময়িক নথিপত্রের সাক্ষ্য খুব তাৎপর্যপূর্ণ হয়। সে সব ঘেঁটে নিরপেক্ষ বিচারে দেখা যাচ্ছে কর্তাভজা ধর্ম শুধুই দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা বা অর্থ রোজগারের জন্য সংগঠিত হয়ে থাকলে এতদিন টিঁকতো না। তার ভাবনায় দর্শনে আদর্শে নিশ্চয়ই কোন সারবত্তা ও সত্যবস্তু ছিল যা সেকালে অনেক লোককে টেনেছিল ঘোষপাড়ার দিকে। যেমন ভূকৈলাশের মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষালের মত সেকালকার একজন প্রগতিশীল মানুষ ঝুঁকেছিলেন কর্তাভজা ধর্মে। নবীনচন্দ্র সেন লিখেছেন ঘোষপাডার মেলার তৃতীয় দিন সকালে 'কয়েকজন ভদ্রলোক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তাঁহারা সকলেই প্রায় 'গ্রাজুয়েট' সুশিক্ষিত, পদস্থ। তাঁহারা সকলেই কর্তাভজা। তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, সুবর্ণবণিক সকল জাতিই আছেন। ঘোষপাড়ায় জাতিভেদ নাই।'

এই বিবরণ থেকে বোঝা যায়, কর্তাভজাদের উদার ধর্মাদর্শ ও জাতিভেদ-হীনতা সেকালের শিক্ষিতদের আকৃষ্ট করেছিল। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের দ্বারা মোহসঞ্চারের ঘটনাও লক্ষ করা যায়। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার প্রতিবেদক বিস্মিত হয়ে লিখেছেন : 'যে সমাজের স্ত্রীলোকেরা লজ্জা ও কুলভয়ে গৃহের বাহির হইতে সাহসী হয় না, সেই সমাজের সেই স্ত্রীলোকেরা এক 'কর্তা'র অনুরোধে বহুসংখ্য অপরিচিত পুরুষের সহিত একত্রে বসিয়া আমোদ করিতে লজ্জিত হইতেছে না। এক একটি পুরুষের নিকটে গড়ে ৪।৫ টি করিয়া যুবতী বসিয়া আছে।'

নারীপুরুষের এই অবাধ মেলামেশা সেকালে অনেকে ভাল চোখে নেননি। শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তাভজাদের মতকে উপমা দিয়ে গৃহপ্রবেশের পক্ষে সদর দরজা না বলে বলেছেন পায়খানার দরজা। ঐ দরজা দিয়ে ঢুকলে নোংরা লাগবেই। অক্ষয়-কুমার সেন তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি' বইতে কথাটি এইভাবে প্রাঞ্জল করেছেন :

সমকালে প্রচলিত কর্তাভজা মত।
ভগবানে যাইবার এও এক পথ॥
পথটি বড়ই নোংরা উপমা তাহার।
যেমন বাড়ির থাকে নানান দুয়ার॥
কোন দ্বার সদরেতে প্রবেশের তরে।
কোন দ্বারে যাওয়া যায় অন্দর-ভিতরে॥
মেথরের জন্য থাকে আলাহিদা পথ।
সেইমত আধশুদ্ধ কর্তাভজা মত॥

কথামৃতের ৪র্থ ভাগে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জবানীতে বলেছেন :

> হরিপদ এক ঘোষপাড়ার মাগীর পাল্লায় পড়েছে। সে বাৎসল্যভাব করে। হরিপদ ছেলেমানুষ, কিছু বোঝে না। ওরা ছোকরা দেখলে ঐ রকম করে। শুনলাম হরি নাকি ওর কোলে শোয়। আর সে হাতে ক'রে তাকে খাবার খাইয়ে দেয়। আমি ওকে বলে দিব—ওসব ভাল নয়। ঐ বাৎসল্যভাবে থেকেই আবার তাচ্ছিল্য ভাব হয়।
>
> ওদের বর্তমানের সাধন—মানুষ নিয়ে সাধন। মানুষকে মনে করে শ্রীকৃষ্ণ। ওরা বলে 'রাগকৃষ্ণ পেয়েছিস ?' সে বলে, 'হাঁ পেয়েছি'।

অন্যদিকে সরোজনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁরা 'শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ' বইতে বলেছেন :

> এই ধর্ম্মমত প্রধানতঃ অশিক্ষিত সমাজেই প্রতিপত্তি লাভ করিল বটে সভ্য শিক্ষিতগণ স্ব স্ব জ্ঞানৈশ্বর্য্যাভিমানে নগণ্য মনে করিলেও অগণ্য বঙ্গবাসী উত্তমাধম নরনারী এই মতের পক্ষপাতী হওয়ায় ইহা অবশ্য বঙ্গ সমাজের এক আকস্মিক পরাভূত সংস্কার সূত্র বলিয়া গণনীয়।
>
> ঘোষপাড়ার প্রভাবে তাহারা বর্বর হইরাও সংযমশীল সাধু। ধর্ম্মজ্ঞ না হইয়াও বিশ্বাসী ভক্ত। পল্লীগ্রামের হাতুরিয়া চিকিৎসকগণ যেমন কুটীর-বাসী নিঃসম্বল কৃষকগণের জীবনরক্ষক সেইরূপ ঘোষপাড়ার ঠাকুরগণও বঙ্গ-দেশের বহুতর অশিক্ষিত অধম পাপাচারীর বন্ধু। অতএব আমরা জ্ঞানাভিমানবশে ঘোষপাড়ার ধর্ম্মমতটিকে নগণ্য জ্ঞান করিতে পারি না।

কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মত বাংলার আর কোন লোকধর্ম এত বিতর্কিত নয়। কর্তাভজাদের ক্ষেত্রে যে এতটা বিতর্ক তৈরি হয়েছিল তার কারণ অনেকগুলি। প্রথমত, হাজার হাজার শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মানুষ এই সহজ সত্য ধর্মের দিকে ঝুঁকেছিল এবং এই ঘটনা উনিশ শতকের কলকাতার নৈষ্ঠিক হিন্দুসমাজকে বিচলিত ক'রে তুলেছিল। তারা গড়তে চেয়েছিল প্রতিরোধ। দ্বিতীয় কারণ, এ ধর্মের প্রাণকেন্দ্র ঘোষপাড়া কলকাতার খুব কাছে, তাই নবগঠিত কলকাতার বৈশ্য ও শূদ্ররা কর্তাভজা ধর্মের ছত্রতলে এসেছিল, কেননা ঐ সময় হিন্দুধর্ম খুব গোঁড়া রক্ষণশীল উচ্চবর্ণের সমাজপতিদের নিয়ন্ত্রণে ছিল আর ব্রাহ্মধর্ম ছিল উচ্চশিক্ষিত মানুষের সাধনীয়। কলকাতার ভক্তিমান সাধারণ ব্যবসায়ী ও নিম্নবর্ণের মানুষ কর্তাভজাদের উদার আমন্ত্রণে আকর্ষণ বোধ করেছিল ব্যাপক-ভাবে। খোঁজ করলে দেখা যাবে এখনও কলকাতার তালতলা, বউবাজার,

শাঁখারিটোলা, হাটখোলা, শোভাবাজার, বড়তলা এইসব এলাকার বহু আদিবাসিন্দা বংশ পরম্পরায় দীক্ষিত কর্তাভজা*। ঘোষপাড়ার এখনকার উন্নয়নে ও প্রসারণে এঁদের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক। কর্তাভজাদের 'কর্তা'-বংশ ও বর্তমান দেবমহান্তও দীর্ঘকাল কলকাতাবাসী। কর্তাভজাদের ব্যাপক জনপ্রিয়তার তৃতীয় কারণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক। 'কর্তা' ও 'বরাতি'দের মাঝখানে যে 'মহাশয়'-গোষ্ঠী এই ধর্মে ছিলেন তাঁরা এককালে ভোগ করেছেন বিপুল অর্থভাগ্য ও সামাজিক সম্মান। কর্তাভজাদের সংগঠনে ও নতুন সদস্য সংযোজনে মহাশয়দের স্বার্থ ও সুযোগ ছিল খুব বেশি। এ ব্যাপারে মহিলা প্রচারিকারা (যাঁদের বলা হয় 'মা গোঁসাই') অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। উনিশ শতকের কলকাতার নানা পরিবারের অন্দরমহলে মা গোঁসাইয়ের অবাধ যাতায়াত ও ধর্মপ্রচারের ঘটনা অনেক বইতেই লিপিবদ্ধ আছে। এখনও গ্রাম ও মফঃস্বল বাংলায় সাধারণ অশিক্ষিত পরিবারে মা গোঁসাই আর মহাশয়দের সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লক্ষ করবার মত। উনিশ শতকে কর্তাভজাদের বিপুল জনপ্রিয়তার আরেকটি বড় কারণ অবাধ নারীসংসর্গের সুযোগ। কর্তাভজাদের মূল ধর্মাদর্শে যত শুদ্ধতা ও সতর্কতাই থাক গ্রামভিত্তিক সমাজে কর্তাভজাদের একশ্রেণীর ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ব্যক্তি অসহায় মহিলাদের গুপ্তসাধনার সঙ্গী করার ছলে বিকৃত কামাচরণ করতেন এ কথা ঐতিহাসিক সত্য। লোকসংস্কৃতিবিদ্ আহমদ শরীফ তাঁর 'বাউলতত্ত্ব' প্রবন্ধে যথার্থই বলেছেন যে: 'জনশ্রুতিজাত ধারণা স্বয়ং চৈতন্য-দেবের একটি গুহ্য সাধনপ্রণালী ছিল। এই সাধনা ছিল পরকীয়া মৈথুনাত্মক' এবং একশ্রেণীর মানুষ বলতে থাকেন 'চৈতন্যদেব স্বয়ং আউলচাঁদরূপে পুনরাবির্ভূত হয়ে এই সাধন প্রণালী সাধারণের মধ্যে প্রচার করেন।'

বলাবাহুল্য এই ধারণা নিতান্তই জনশ্রুতিজাত এবং নৈষ্ঠিক কর্তাভজারা এ বিশ্বাসের কোনরকম সমর্থন করেন না কিন্তু কোন জনপ্রিয় ধর্ম যখন লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তখন মধ্যবর্তী কিছু মানুষ তার অপব্যাখ্যা ও বিকৃত ব্যবহার করবেই, বিশেষ করে সম্প্রদায়টির গরিষ্ঠসংখ্যক সমর্থক যখন অশিক্ষিত পল্লীবাসী ও প্রধানত পতিপরিত্যক্তা বা বিধবা নারী। অক্ষয়কুমার দত্ত উপাসক সম্প্রদায় সংক্রান্ত বইয়ে কর্তাভজাদের সম্পর্কে যে-ব্যভিচার দোষের অভিযোগ

*বর্তমানে কলকাতায় কর্তাভজাদের বহু সংস্থা আছে। প্রধান উল্লেখযোগ্য 'সত্যধর্ম সেবকসংঘ' ৪০ বি প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, 'সতীমাতা সেবক সংঘ' ৩৫ কৈলাস বসু স্ট্রীট এবং 'বিপিন আশ্রম' ২ উমেশ দত্ত লেন।

জানেন তা এই দিক থেকে বিচার্য। যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর বইতে ব্যাপারটিকে বুঝিয়েছেন এইভাবে যে,

> Each agent of the Karta is generally on very intimate terms with a childless and friendless widow in the village or group of villages entrusted to his charge, and through the instrumentality of this women he is able to hold secret meetings which are attended by all the female votaries within his jurisdiction, and in which he plays the part of Krishna.

কর্তাভজাদের সম্পর্কে নৈষ্ঠিকসমাজের সবচেয়ে বড় অভিযোগ এই নারীসাধনের প্রসঙ্গে। সামাজিকভাবে সেকালে এটি নিতান্তই সত্য ঘটনা যে, অনেক অসহায় স্ত্রীলোক কর্তাভজাদের একজাতীয় দালালশ্রেণীর হাতের পুতুল হয়ে গিয়েছিল। হয়ত সেইজন্য রামলাল শর্মা তাঁর 'পাষণ্ড দলন' বইতে অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে কর্তাভজাদের উদ্দেশে লিখেছেন :

সাধু কি করিয়া থাকে প্রকৃতির সঙ্গ।
সাধু কি ধরিতে চায় কলুষ ভুজঙ্গ ॥
সাধু কি কপট ফাঁদ বিস্তৃত করিয়া।
ষাঁড় ভাঁড় আতুরান্ধে খায় ভুলাইয়া ॥

কর্তাভজারা যে ভেকধারী বা বিশেষ বহির্বাস ধারণ করত না অথচ ধর্মসাধন করত এ ব্যাপারটি বহু লোকের মনোমত ছিল না। তাদের সমবেতভোজন (জাতিবর্ণনির্বিশেষে) ও স্বাধীন বিচরণ অনেকের উষ্মা জাগিয়েছে। ব্রাহ্মণ হয়েও যারা শূদ্র সংসর্গে কর্তাভজা ধর্ম পালন করত ব্যঙ্গ বিদ্রূপের আঘাত তাদের উপরও প্রবল হয়েছে। এখানে এমন দুটি সাহিত্যিক উদাহরণ দেখানো যায়।

উনিশ শতকের প্রখ্যাত পাঁচালিকার দাশরথি রায় 'কর্তাভজা' নামে যে পাঁচালি লেখেন তার প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিতে তখনকার বিরোধ-ব্যঙ্গের ছবি আছে। যেমন :

নূতন হয়েছে কর্তাভজা শুনো কিঞ্চিৎ তার মজা
সকল হ'তে শ্রবণে বড় মিষ্ট ॥
পরে না কপ্নি বহির্বেশ নয় বৈরাগী নয় দরবেশ

নয় কোন ভেকধারী।
ওরা পুরাণ মানে কি কোরান মানে
তার কিছু বুঝতে নারি ॥

বিধবার নাই একাদশী বিশেষ শুক্রবারের নিশি
হয় ভোজন যার যে ইচ্ছামত।

(তখনকার ব্রাহ্মণশাসিত হিন্দুসমাজের পক্ষে কর্তাভজাদের উত্থান এতদূর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যে তাদের নিয়ে কলকাতার প্রখ্যাত 'জেলেপাড়ার সং' বেরোয় (দ্রষ্টব্য 'জেলেপাড়ার সং নিয়ে হরবেরকম বং' : জ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্বাস। ১৩২২)।) এখানে তার থেকে কিছুটা উদ্ধৃতিতে কর্তাভজা-বিরোধীদের বক্তব্য জানা যাবে। লেখাটি নাট্যাকারে সংলাপের ঢঙে লেখা। পাত্র পাত্রী : মহাশয়, কর্তা মা ও ব্রাহ্মণ বরাতি।

মহাশয়ের উক্তি

আমি মশাই এ দলের চাঁই সবাই মশাই বলে জানে।
ছাড়ে দেবতাগুরু আপন জরু ও যার মন্ত্র ফুঁকি কানে ॥
কলু তেলি বামুন মালী বদ্যি বা কায়েত হাড়ি চণ্ডাল সমেত।
আমার গুণের জোরে এক আসরে সবাই জমায়েত ॥

কর্তামায়ের উক্তি

বড্ড শুচি জাতে মুচি আমি কর্তা মা ওগো আমি কর্তা মা।
আমার হ'লে দয়া যার বাঁজা জায়া ছেলের শোনে রা
সেও ছেলের শোনে রা ॥
পরে শাড়ি কড়ে রাঁড়ী যদি পেটটি উঁচু হয়
যদি কারও পেটটি উঁচু হয়।
আমার চরণ করলে শরণ তার নেইকো কিছু ভয়
ও তার নেইকো কিছু ভয় ॥
ওই ঘোষপাড়ায় ডালিমতলায় আছে আমার মাটি
এই আঁচলে আছে আমার মাটি।
রাখলে ঘরে (সতী) মায়ের বরে (আসে) ভাতার পরিপাটি
পায় ভাতার পরিপাটি ॥

আধবয়সী বর্ষিয়সী ও যার কর্তা বাইরে যায়

মিছে টাকা উড়ে তায়।

মাটির গুণে কথা শুনে লুটিয়ে পড়ে পায়

গিন্নির লুটিয়ে পড়ে পায়।

ব্রাহ্মণ বরাতির উক্তি

শুনি কর্তার মুখে কর্তাভজা মেয়ে হিজড়ে পুরুষ খোজা

হদ্দমজা লুটতে ছিল আশা।

আমি নৈকষ্য কুলীনের ছেলে মোহিনীর রীতিতে ভুলে

কর্তামায়ের ঘরে নিয়েছি বাসা॥

ধর্মে নাই ভেদাভেদ জাতের বিচার

হাড়িমুচি সব একাকার

ঘোর কলিতে পুরুষোত্তমের মত।

সবাই অন্ন পায়স করে

ডালে ঝোলে কাটি মারে

একসঙ্গে অন্ন খেতে রত॥

এ সব উদাহরণে ধরা আছে উনিশ শতকের বাংলার এক বিশেষ সমাজচিত্র ও চরিত্র। এই চিত্র আর বাঙ্গালীচরিত্র আমাদের বোঝায় যে, কর্তাভজা ধর্ম এদেশের সামাজিক বর্ণভিত্তিক ভারসাম্যে তুলেছিল এক অপ্রতিরোধ্য ঘূর্ণন। আজকের ঘোষপাড়ায় গেলে এ সবের কিছুই বোঝা যায় না। এখনকার শিক্ষিত দেবমহান্ত, নিষ্ঠাবান বরাতি ও ভক্তিমান মহাশয়রা পুণ্যক্ষেত্র বলেই ঘোষপাড়াকে মানেন ও সমবেত হন দোলের উৎসবে। যদিও হিমসাগরের জল আর ডালিমতলায় মাটি দিয়ে রোগারোগ্যের কিংবদন্তী অসহায় দুর্বল মানুষের অন্ধবিশ্বাসে সমান সচল, তবু সেই সংঘাতের তীব্র ঘূর্ণিঝড় আজ শান্ত। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ ইতিহাস আজ শান্ত পরিশিষ্টের মত অনুত্তাল।

এই অবসরে আমরা বরং দৃষ্টি রাখি অন্যদিকে। বোঝবার চেষ্টা করি ১৮৩৩ সালে দুলালচাঁদের তিরোধান আর ১৮৪০ সালে সতীমা-র দেহরক্ষার পর কর্তা-ভজাদের গুরুবংশের কী হ'ল। তাঁরা অবশ্যই পেলেন এক সুনিশ্চিত অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার, এক বিশাল ভক্ত মণ্ডলী এবং সাম্প্রদায়িক স্বীকৃতি। সে আলোচনায় যাবার আগে পাল বংশের একটি বংশতালিকা সামনে থাকা দরকার।

পালবংশের লতিকা ১*

সাকিন : ঘোষপাড়া

রামশরণ পা

(সরস্বতী দেবী)

|

রামদুলাল

(দিগম্বরী-৩য়া স্ত্রী ব্রাহ্মণকন্যা)

|

রাধামোহন	কুঞ্জবিহারী	মথুরামোহন	ঈশ্বরচন্দ্র	ইন্দ্রনারায়ণ
×	(কৃতার্থময়ী-ব্রাহ্মণকন্যা)	×	(শিবসুন্দরী)	(কেদারময়ী)

রামদুলালের মৃত্যুর সময়ে কুঞ্জবিহারী, ঈশ্বরচন্দ্র ও ইন্দ্রনারায়ণ জীবিত ছিলেন। কুঞ্জবিহারী তাঁর পিতার জীবিতকালে মনান্তর ক'রে গৃহত্যাগী হন। পরে রামদুলালের মৃত্যুর পর ফিরে আসেন ও সম্পত্তির একতৃতীয়াংশ পান। অপুত্রকভাবে মৃত্যু হওয়ায় তাঁর সম্পত্তি পান ভ্রাতুষ্পুত্র সত্যচরণ। ইতিমধ্যে রামদুলালের পর কর্তা হন ঈশ্বরচন্দ্র (ন'বাবু)। অবশ্য ঈশ্বরচন্দ্রের সমকালে তাঁর কনিষ্ঠ ভাই ইন্দ্রনারায়ণও (ছোটবাবু) কর্তা বলে অভিহিত হতেন। এবারে ঈশ্বরচন্দ্র ও ইন্দ্রনারায়ণের বংশধারার দিকে মনোযোগ দেওয়া যাক। তার আগে আমাদের মনে রাখা চাই দেবেন্দ্রনাথদে-র এই মন্তব্য যে,

> রামদুলালের পাঁচ পুত্রের মধ্যে চতুর্থ ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যেও যোগ্যতা কিছু পরিমাণে ছিল ;···কর্তাভজাধর্ম গৃহী সাধকদের ধর্ম এবং প্রথম কর্তা রামশরণ পালও গৃহী ছিলেন। কিন্তু সাংসারিকতা বলিতে যাহা বুঝায়—ঈশ্বরচন্দ্র ইন্দ্রনারায়ণের সময় হইতেই তাহা পূর্ণমাত্রায় ইঁহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে।···ঈশ্বরচন্দ্র ঠাকুর বংশের শেষ যোগ্য প্রতিনিধি। ইনি নির্লোভ নিরহংকার—সাধক পুরুষ ছিলেন। ভক্তবৎসল বলিয়া ইঁহার

---

*পাল বংশের সম্পূর্ণ লতিকা আমাকে লিখে দিয়েছেন বর্তমান সেবমহান্ত শ্রীসত্যশিব পাল। এ বংশের উত্তরাধিকার ও সম্পত্তিবিন্যাস সংক্রান্ত সকল তথ্য সংগৃহীত হয়েছে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দে-র লেখা 'কর্তাভজা ধর্মের ইতিবৃত্ত' বই থেকে।

বিশেষ খ্যাতি ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম ১২২০ বঙ্গাব্দে এবং তিরোভাব হয় ১২৮১ বঙ্গাব্দে।

এবারে এই ঈশ্বরচন্দ্র ও ইন্দ্রনারায়ণের বংশধারা দেখা যাক।

পাল বংশের লতিকা ২
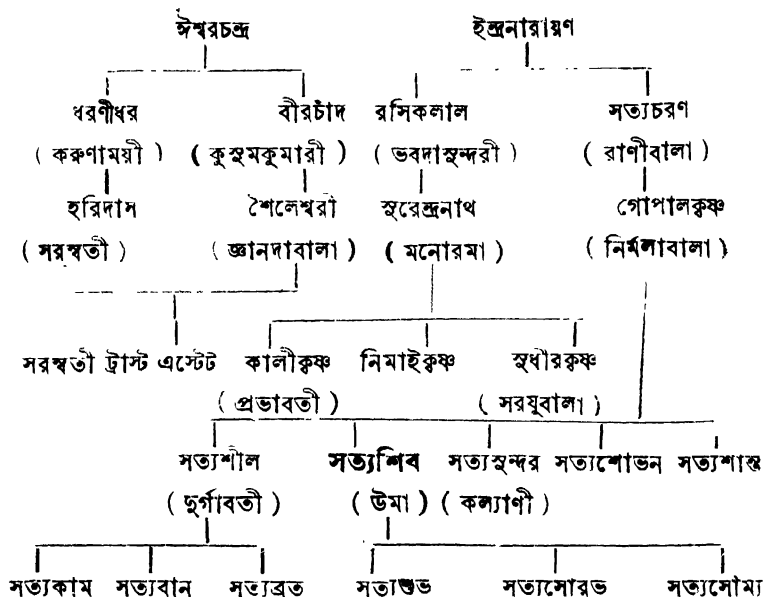
এই বংশলতিকার শেষপর্যায়ের সত্যশিব পাল বর্তমানে ট্রাস্টি ও দেবমহান্তরূপে ঘোষপাড়া পাঠ পরিচালনা করছেন। প্রধানত এঁর উদ্যোগে এবং 'সতী-মাতা সেবক সংঘে'র সহায়তায় এখন দোলের সময় উৎসব পরিচালিত হয়। সে উৎসব সাত্ত্বিক ও আয়োজনবহুল। বহুজনসমাগমে কীর্ণ ও কলরবমুখর। ভক্ত সমাগম, নবদীক্ষাদান, ভাবের গীত গান, সম্প্রদায়ীদের ধর্মসভা সবই আকর্ষণীয়। হিমসাগর ও ডালিমতলা ব্যাধিগ্রস্ত এবং বিশ্বাসীদের ভীড়ে দুষ্প্রবেশ্য। শহর ও গ্রামের অগণিত কর্তাভজার তিনদিনের সমাবেশ দ্যোতনা করে লোকধর্মের গভীর শক্তি। সেই শক্তির উৎস মানুষ।

কর্তাভজাদের মূল তত্ত্ব এই মানুষ আর সত্য। তাঁদের সাধনগীতে বলা

হয়েছে 'ভেদ নাই মানুষে মানুষে খেদ কেন ভাই এদেশে' এবং তাঁদের দীক্ষামন্ত্র 'জয় গুরু সত্য/কর্তা আউলে মহাপ্রভু/জয় জয় সত্য'। মানুষ আর সত্যের উপর ভর দিয়ে দু' শতক অতিক্রম-করা এই ধর্ম এখন কোন্ পর্যায়ে তা জানার ইচ্ছা সমাজবিজ্ঞানীদের আকর্ষনীয় বিষয়।*

যে-কোন লোকধর্মের মত কর্তাভজাদের দীক্ষিত সদস্য নিশ্চয়ই কমছে তবে বাংলার একক লোকধর্মসম্প্রদায় হিসাবে এঁরা একক সংখ্যাগরিষ্ঠ। ঘোষপাড়ার মেলার বিস্তার কমছে, যদিও সাধারণ দর্শনার্থীর সংখ্যা বাড়ছে নিছক বিনোদনের অঙ্গরূপে। বর্তমান দেবমহান্ত লিখিতভাবে আমাকে জানান, আগে মেলা বসত অর্ধ বর্গমাইলব্যাপী জমিতে। রোজ ৫০-৭০ হাজার ভক্ত সমাগম হত। আগে ঘোষপাড়ার মেলা বসত ৬০০ বিঘা আম লিচুর জমির ওপর। ৩৫০০ গাছ ছিল। প্রতিটি গাছের তলায় একাধিক মহাশয়ের 'আসন' থাকত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মেলার জমি অধিগৃহীত হয় রাজশক্তির হাতে। পরে ভারত সরকারের সামরিক বিভাগ মেলার জন্য জমি ছেড়ে দেন কিন্তু স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাত্র ৩০ একর জমি মেলার জন্য সংরক্ষিত রাখেন। জবরদখলকারীরা ঐ ৩০ একরেও ভাগ বসিয়েছে এবং বেশিরভাগ গাছ কেটে নিয়েছে। এ ব্যাপারে বর্তমান সময়ে কর্তা, মহাশয় ও বরাতিরা সমান অসহায়।

দেবমহান্তের দেওয়া অন্য তথ্যে জানা যায় পশ্চিমবঙ্গের সব জেলায় কর্তাভজা আছে, তবে উত্তরবঙ্গে খুবই কম। বেশি আছে কলকাতা, হাওড়া, ২৪ পরগণা নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়ায়। বাংলাদেশের যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর ও রাজশাহীতে সম্প্রদায়ীরা আছে। বাংলার বাইরে কাশী, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বিহার ও উড়িষ্যার অনেক প্রবাসী বাঙালী কর্তাভজা আসনের অধিকারী।

কর্তাভজাদের ধর্ম সংক্রান্ত বইপত্র পড়ে এবং ঘোষপাড়া ঘুরে যে সাত্ত্বিক ধারণা তৈরী হয় তা চিড় খায় গ্রামাঞ্চলের সাধারণ সম্প্রদায়ীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে

*১৯৭৬ সালে শ্রীমানিক সরকার ঘোষপাড়ার মেলার 'মহাশয়' ও 'বরাতি'-দের যে সমীক্ষা করেন তা উল্লেখযোগ্য। নমুনা সংখ্যা ৩৮১ জন। বরাতি ৩০০, মহাশয় ১৩জন। পুরুষ ৫৩, নারী ৩০১, কিশোর কিশোরী ২৭ জন। বিবাহিতা ২৫১, অবিবাহিতা যুবতী ২২, কিশোরী ২৭, বিধবা ১৮৪, বালবিধবা ৫২ জন। নিরক্ষর ৩৪১, সাক্ষর ৫০। সাক্ষর পুরুষ ৩৩, মহিলা ৭। উচ্চশিক্ষিত ১, মধ্যমশিক্ষিত ৫ জন। পরিবারের সংখ্যা ১০৩ (প্রতি পরিবারে ২ থেকে ৫ জন সদস্য)। পরিবারের জমি : ১ থেকে ৫ বিঘা জমি ৭টি পরিবার, ২ বিঘার কম ১ বিঘার বেশি ১০টি পরিবার, ১ বিঘার মত জমি ১৩টি পরিবার, সামান্য জমি ৫৭টি পরিবার, ভিক্ষা বা পরাশ্রয়ী ১৬টি পরিবার।

মিশলে। গ্রামের কর্তাভজাদের সঙ্গে অন্য সব সহজিয়া ধর্মের আচরণের খুব তফাৎ দেখা যায় না। গোপনে পরকীয়া সাধনা এ সম্প্রদায়ে অন্তঃশীল হয়ে আছে। তাই মনে হয় কর্তাভজাদের মূল ধর্মাদর্শ ও বৃহত্তর সম্প্রদায়ীদের আচরণের মধ্যে মস্ত ফাঁক আছে। প্রবর্তক আউলেচাঁদের শিক্ষা, রামশরণের ধর্মীয় নির্দেশ এবং দুলালচাঁদের ভাবের গীতের আইন খুব উদার, সুন্দর ও নিষ্কাম। উনিশ শতকের ধর্মসমন্বয়ে যুগোচিত চেতনা থেকেই গড়ে উঠেছিল কর্তাভজাদের ধর্মতত্ত্ব। তাই এর মর্মমূলে ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনের বিরুদ্ধাচরণ (বিশেষ করে পৌত্তলিকতার বদলে মানুষভজন, বেদাচার ও জাতিবর্ণ অস্বীকার) যেমন ছিল তেমনই ইসলাম, সুফিতত্ত্ব ও এমনকি খ্রীষ্টধর্মের বেশ কিছু আচার সমীকৃত রয়েছে বোঝা যায়। আঠারো শতকের স্বাভাবিক 'সত্য' সম্পর্কে আগ্রহও এ ধর্মে অনতিলক্ষ। 'আউলেচাঁদ দোয়া গরু সঙ্গে বাইশ ফকির বাছুর তার' এই প্রবচনে ফকির শব্দটিতে কর্তাভজাদের ফকিরিতন্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যেমন ব্যক্ত, তেমনই সুফি-সংসর্গের নিশ্চিত স্বাক্ষর। এ সম্প্রদায়ের গানে ও বীজমন্ত্রে 'সত্য' শব্দটির পৌনপুনিক ব্যবহার লক্ষ করে ডঃ সুকুমার সেন যথার্থ বলেছেন :

> অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধর্মসাধনায় ও ধর্মানুষ্ঠানে সেখানে হিন্দু মুসলমান মত-নিরপেক্ষ উদার সমন্বয়ের প্রকাশ হয়েছে সেইখানেই 'সত্য' কথাটি একটি বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে। সুফী সাধকেরা আল্লাহ্‌কে যখন পার্সোন্যাল ঈশ্বর বলে ভাবতেন তখন তাঁকে নাম দিতেন 'হক', সত্য। এই 'হক্'-এরই প্রতিধ্বনি পাই সত্যপীরে, সত্যনারায়ণে আর সত্য মহাপ্রভুতে।

কর্তাভজাদের ধর্মতত্ত্বে ইসলাম সংসর্গের কয়েকটি স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায়। যেমন তাদের সাপ্তাহিক সমাবেশ ও মজলিসের দিন শুক্রবার। ঐ দিন শিরনি ভোগ হয় এ খবরটুকুও তাৎপর্যপূর্ণ। শুক্রবার দীক্ষাদানের পক্ষে সবচেয়ে প্রশস্ত। তাঁদের বিশ্বাস শুক্রবার কলিকালের উদ্ভব। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য শুক্রবার ইসলামি মতে মিলন ও সমাবেশের পক্ষে প্রকৃষ্ট। সতীশচন্দ্র দে তাঁর 'গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী' বইতে বিশেষত জানিয়েছেন : 'কর্তাভজাদিগের উৎসবের সময় প্রথমে মুসলমানকে না আহার করাইলে উৎসব অঙ্গহীন হয়।' ব্যক্তিগত অনুসন্ধানে দেখেছি বাংলাদেশে ও নদীয়া-মুর্শিদাবাদের গ্রামে বহু-সংখ্যক কর্তাভজা 'মহাশয়' ও 'বরাতি' জাতিতে মুসলমান। অথচ তাদের অনেকের নাম মুসলমানের মতই নয়। যেমন একটি নাম পেয়েছি শশিশেখর মণ্ডল। সে চারপুরুষ কর্তাভজাধর্মে আশ্রিত। তাদের পূর্বপুরুষ যে-দিনটিতে

কর্তাভজা ধর্মাশ্রয় পেয়েছিলেন সেই দিনটির স্মরণে মুর্শিদাবাদ জেলার কুমীরদহ গ্রামে মণ্ডল বাড়ি মহোৎসব হয় আজও।

এই ধর্মের অনুজ্ঞায় খৃষ্টিয় ধর্মের প্রভাব খুব প্রত্যক্ষ। কর্তাভজারা দশটি নিষেধাজ্ঞা মেনে চলে। সেগুলি : পরস্ত্রীগমন, পরদ্রব্যাহরণ, পরহত্যাসাধন এই তিন কায়কর্ম এবং এই কায়কর্মের ইচ্ছারূপ তিন মনকর্ম এই ছয় এবং মিথ্যা-কথন, কটুভাষণ, বৃথাভাষণ ও প্রলাপভাষণ এই চার অর্থাৎ মোট দশ। এই নিষেধাজ্ঞার পরিকল্পনায় খৃষ্টিয় দশাজ্ঞার ছায়া বেশ স্পষ্ট। এছাড়া এঁদের মধ্যে প্রচলিত আছে 'দায়িক মজলিশ' ব'লে একরকম আচরণ যা খৃষ্টিয় পাপস্বীকারের সমতুল্য। সংসারে নানা দায়গ্রস্ত ব্যক্তি যখন পাপের ভারে অতিষ্ঠ হয়ে তার থেকে মুক্তিপিপাসু হন তখন তিনি দায়িক মজলিসে সামিল হন। প্রথমে দায়িকের কাছ থেকে সওয়া পাঁচ আনা নেওয়া হয়, তারপর পাপস্বীকার ও পাপনিকাশের পর রগে মাটি লাগিয়ে দেওয়া হয় এবং একজন অনুরাগী ভক্ত তার হয়ে খাটুনী দেন। এরপর 'শ্রীযুতের পদ' গাওয়া হয়। এখানে লক্ষ করবার যে, এঁদের শুক্রবারের মজলিশে সম্প্রদায়ীরা শ্রীযুতের যে দুটি পদ পরপর গান করেন তার ক্রম ঠিক ক্যাথলিকদের Confession > Penance > Satisfaction for sin-এর মত।

শুক্রবারের আবশ্যিক প্রার্থনা-গীতি দুটি পর্যায়ক্রমে লক্ষণীয়। প্রথমে গাওয়া হয় :

অপরাধ মার্জনা কর প্রভু।
এমন মত-ভ্রম জন্মজন্মান্তরে তোমার সংসারে
হয় না যেন কভু
বিকলে করলে বড় কাবু॥
আমার ত্রুটি কত কোটিবার
লেখাজোখায় লাগে ধোঁকা সংখ্যা হয়না তার।
দীনজন হইয়ে অভয় চরণ
ধিয়ে ত্রাণ পেয়েছে কত ভেয়ে বাবু॥ ইত্যাদি

পরবর্তী গানটি এরই সম্পূরক :

অপরাধ মাপ কোল্লে সে এইবারে।
যত পাপচয়ের দফারফা হয়ে
পরম আনন্দে ভাসছে প্রেম সাগরে॥

স্বহস্তে লিখছে কলম ধরে
ছিল যত গত পাপক্ষয়
গুণের মণি দিলেন শূন্যি
অমনি পূর্ণচয়।
এখন যত পার লেখা ক'রে
ধর কেউ কাহারো না ধরায় না ধরে॥ ইত্যাদি

এখন প্রচলিত নেই কিন্তু একসময়ে এ-সম্প্রদায়ে পাপস্বীকারের কিছু আসুরিক পন্থা নিশ্চয়ই ছিল যার অন্তত একটা সাক্ষ্য মিলছে ১৮৪৮ সালের ৩০শে মার্চের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার জনৈক পত্র-লেখকের জবানীতে। তিনি ঘোষ-পাড়ায় প্রত্যক্ষ যা দেখেছিলেন তার বর্ণনা :

> হিমসাগর নামক পুষ্করিণীর নিকট চরণ চালন করিয়া দেখিলাম যে ইহার ঘাটের অধঃসোপানে পাপি লোকসকল এক পদ স্থলে দিয়া অন্য পদ জলে মগ্ন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া কর্তাপ্রেরিত দূতগণের সমক্ষে স্ব স্ব কৃত কলুষ রাশি অম্লানবদনে স্বীকার করত ত্রাণ পাইতেছে, কিন্তু যাহারা স্বীয় ২ অপরাধ ব্যক্ত করিতে বিলম্ব বা সন্দেহ করিতেছে দূতেরা তাহাদের প্রতি প্রকৃত যমদূতের ন্যায় ভীষণ মূর্তি ধারণপূর্ব্বক তর্জ্জন গর্জ্জন শব্দে তাহাদের কেশাকর্ষণ করত মুষ্ট্যাঘাত দ্বারা তাহাদের পাপপুঞ্জ স্বীকার করাইয়া লইতেছে, পরে পাতকিদিগকে কথিত পুষ্করিণীতে অবগাহন করাইয়া তাহাদের দেহ নিষ্পাপ করিয়া দিতেছে।

কর্তাভজাদের সাধারণ বীজমন্ত্র 'গুরু সত্য'। এই গুরুবাদ অন্যবিচারে সহজ সাধনার অবক্ষয়ের সূচক। একসময়ে যে দেশ বলেছে মানুষ সত্য, আঠারো শতকের সামাজিক অবক্ষয়ে সেই দেশ বলতে বাধ্য হল গুরু সত্য। বৈষ্ণব যুগেও ভক্ত আর ভগবানের মাঝখানে গুরুর স্থান ছিল না, কিন্তু কর্তাভজারা উপাস্য আর উপাসকের মাঝখানে আনলেন গুরুকে। এদেশের সামন্ততান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থায়ও এক সময়ে রাজা আর প্রজার মাঝখানে এসে পড়েছিল মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার তালুকদার গাঁতিদাররা। রাজা প্রজার কল্যাণ সম্পর্কের সেদিন থেকেই ইতি ঘটেছে। কর্তাভজাদের গুরুপ্রাধান্যের মূলে তাদের অনিশ্চয় ঐশী শক্তি। অলৌকিকতার কাহিনী দিয়ে কিংবদন্তীর ঘেরাটোপে যে ধর্ম বাঁচতে চায় তাকে মেনে নিতেই হয়ে গুরু সত্যের তত্ত্ব। সাধারণ বরাতির কাছে মহাশয় হলেন

এই গুরু বা মহাশয়রা তাঁদের নিজেদের চিন্তা থেকে ক্রমশ কর্তাভজা ধর্মকে লোকায়ত গুপ্ত সাধনার সঙ্গে একাকার করে ফেলেন। বিশেষ ক'রে গ্রামাঞ্চলে এ-ধর্মের সাধনভজন একটা রহস্যের ও কৌতূহলের সৃষ্টি করে। এই প্রসঙ্গে মনে আসে শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী জনৈক বৈষ্ণবচরণের বিবরণ, যাঁর সম্পর্কে জানা যায় :

এই সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবচরণ।
ভাগবতাচার্য ভক্ত প্রভুপদে মন ॥
সহরের সন্নিকট কাছির বাগান।
যেখানে তাদের গুপ্ত সাধনার স্থান ॥
বৈষ্ণবচরণ ছিল আচার্য তথায়।
সাধক সাধিকা বহু ভুক্ত সম্প্রদায় ॥
গোপনে গোপনে তথা হয়ে একত্রিত।
আচার্যের দীক্ষামত সাধনা করিত ॥

বিচার করলে দেখা যাবে কর্তাভজাদের ধর্মাচার সাধারণভাবে এত পরিশুদ্ধ ও সহজ যে তাতে গোপনতার কিছু নেই। হয়ত সেকালের নৈষ্ঠিক হিন্দুদের প্রতিক্রিয়া ও প্রতিরোধের কথা ভেবেই এই গোপন আস্তানার সন্ধান তাঁরা করতেন। গ্রামাঞ্চলে এমন বহু গুপ্তসাধনার কেন্দ্রে অশিক্ষিত ও স্বার্থান্ধ 'মহাশয়'দের রুচিবিকৃতি ও ব্যক্তিগত ভোগবাসনার সূত্রে অনেকক্ষেত্রে এ-ধর্মাদর্শের মহৎ শিক্ষা যে ধূলিলুণ্ঠিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। গ্রামকেন্দ্রিক বাংলার অগণিত আসনে কর্তাদের কোন প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ সম্ভবপর নয়। সেগুলি চলে মহাশয়দের মর্জিমাফিক। তারা ঘোষপাড়ায় গিয়ে বার্ষিক খাজনাটুকু দিয়ে সতী মার উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে নিজের বুদ্ধি বিবেচনা প্রবৃত্তিমত সারা বছর ধরে বরাতিদের খবরদারি করে। সম্প্রদায়ের এ জাতীয় দীক্ষিতরা আউলচাঁদ ও দুলালচাঁদের মহৎ ধর্মচিন্তা ও নিষ্কাম আদর্শকে অনেকটাই ধ্বস্ত ক'রে তোলে এবং বিকৃতির এই অন্ধকার-পথে কালক্রমে কর্তাভজা নামটিতে এসে যায় একজাতীয় স্বতঃসিদ্ধহীনার্থ। এখনকার অনুসন্ধানে ধরা পড়ে এই লোকায়ত গুপ্ত সাধনতত্ত্বের সঙ্গে কর্তাদের অনুমোদনের সঙ্গতি নেই অথচ এর দুর্নামের দায়ভাগ সব যুগেই তাঁদের ওপর বর্তেছে। ১৮৭০ সালে অক্ষয়কুমার দত্ত মন্তব্য ক'রে গেছেন : 'বোধহয় সম্প্রদায়-প্রবর্তকের অভিপ্রায় উত্তমই ছিল, কিন্তু তাঁহার গতানুগতিকেরা তৎপ্রদর্শিত পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন। বিশেষতঃ

ব্যাভিচারদোষ তাঁহাদের সকল গুণগ্রাম গ্রাস করিয়াছে।' ঘোষপাড়ার ধর্মকেন্দ্র এবং তার অসংখ্য অনিয়ন্ত্রিত অনুগামীর মধ্যে এইভাবে তৈরি হয়েছে শূন্যতা।

মুর্শিদাবাদ জেলার এক গ্রাম থেকে ১৯৭০ সালে আমি খুঁজে পাই 'সতীমার ঘরের মন্ত্র' নামের এক লাল কালিতে লেখা খাতা। তাতে লেখা :

ব্ চং হং সত্য
ভগ শুদ্ধ নিরঞ্জন
সতীমা সত্য গুরু সত্য বাক সত্য ঠাকুর সত্য

স্পষ্টত এ মন্ত্রে ঘোষপাড়ার দেবমহান্তদের অনুমোদন নেই অথচ এ-মন্ত্রের যে-লৌকিক প্রয়োগ তাকে রুখবার ক্ষমতাও তাঁদের নেই। এখন সিদ্ধান্ত করা যায় যে, কর্তাভজা ধর্মমত ও সাধনতত্ত্বের দুটি ধারা এদেশে বহুদিন চলেছে। প্রথম ধারা ঘোষপাড়ার শাস্ত্রানুমোদিত শুদ্ধ ও নিষ্কাম, দ্বিতীয় ধারা বাংলার চিরায়ত লৌকিক কায়াসাধনা ও সহজিয়া শাখার ঘনিষ্ঠ। এই দ্বিতীয় ধারার সম্প্রদায়ীরা খুব ধীরে ধীরে নানা ধর্ম-সম্প্রদায়ের সাধনাচারের সঙ্গে লেনদেন করতে করতে গ'ড়ে তুলেছে ধর্মাচরণের এক সার্বজনিক লৌকিক রূপ। এই প্রসঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার যে অন্য লৌকিক ধর্মেও কর্তাভজাদের মন্ত্র বা বিশ্বাসের সংক্রমণ ঘটেছে। তার অকাট্য প্রমাণ মেলে সাহেবধনীদের সাধন-মন্ত্রে আউলচাঁদের উল্লেখে। বৃত্তিহুদার পাল বাড়িতে রক্ষিত 'সাহেবধনী ঘরের সত্য নাম' খাতায় অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে এই মন্ত্রও আছে। মন্ত্রটি :

পুরুষ

বীরনীরক্ষীর নিত্যানন্দ পদং ভরং মনসকর।
নিত্যানন্দ চৈতন্যপ্রভু অদ্বৈত কর সার। দিলাম তোমার দোহাই।
যেখানকার বীজ সেইখানেতে রয়।
দোহাই কর্তা আউলেচন্দ্র দোহাই কর্তা আউলেচন্দ্র।

প্রকৃতি

গুরুসত্য কর্তার কর্তা আউলেচন্দ্র।
মহাপ্রভু সত্যি সত্যি।
সত্যনামে আমি সত্য কর্তা আউলেচন্দ্র।

যদি মনে হয় এ-মন্ত্র সাহেবধনীদের খাতায় নিতান্তই প্রক্ষিপ্ত বা কৌতূহল-

বশত টুকে রাখা তবে অন্তত একথা প্রমাণ হয় যে কর্তাভজাদের একটা গুপ্ত-সাধনা। ('যেখানকার বীজ সেইখানেতে রয়' স্পষ্টতই মৈথুনতত্ত্বের ইঙ্গিত) আছে। অবশ্য সাহেবধনীদের মন্ত্রে কর্তাভজাদের প্রভাব বোঝাতে আমরা ব্যবহার করতে পারি আরেকটি মন্ত্র যাতে আর কোন দ্বিধা বা তর্ক নেই। মন্ত্রটি:

গুরু সত্য

গুরু তুমি সত্যধন সত্য তুমি নিরঞ্জন।

এবারে উদ্ধার করা চলে কুবির গোঁসাইয়ের দুটি পদাংশ।

১ শোন কহি সত্য কথা সতীত্ব পতিব্রতা
সত্যতে মুড়িয়ে মাথা করঙ্গ লয়েছি।
সদা বলি সত্য চলি সত্য সত্য ভাবে ভুলেছি ॥

২ মানুষ সত্য মানুষ সত্য গুরু সত্য গুরু সত্য সত্য দীনবন্ধু হরি।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি মানুষ সত্য চলাচলি
সত্য সত্য বলি চলি
সত্য প্রেমের ভিখারী ॥

তাই বলে একথা ভাবা সংগত হবে না যে কর্তাভজা আর সাহেবধনী একই ধর্মের প্রকরণে বাঁধা বা সাহেবধনী কর্তাভজাদের শাখা সম্প্রদায়। অবশ্য উভয় সম্প্রদায়ে কয়েকটি ঘনিষ্ঠ সন্নিপাত লক্ষ করা যায়। যেমন দুই ধর্মই বেদ ও ব্রাহ্মণবিরোধী। দুজনদেরই কোন আলাদা অঙ্গচিহ্ন বা বহির্বাস নেই। ঘোষপাড়ায় একজনদের মূল আসন, বৃত্তিহুদায় আরেকজনদের। দুজায়গায়ই বার্ষিক উৎসব হয় যথাক্রমে ফাল্গুনী পূর্ণিমা ও বৈশাখী পূর্ণিমায়। শিষ্যদের কাছে খাজনা নেওয়ার রীতি একই, তবে সাহেবধনীদের খাজনা দিতে হয় চৈতী একাদশীতে অগ্রদ্বীপের মেলায়। দু সম্প্রদায়েই গ্রামে গ্রামে বহু আসন আছে। দুই ধর্মই গৃহী ধর্ম। কর্তাভজাদের প্রবর্তক রামশরণ, সংগঠক তাঁর সন্তান রামদুলাল; সাহেবধনীদের প্রবর্তক দুলীচাঁদ, সংগঠক তাঁর সন্তান চরণচাঁদ। কর্তাভজাদের সাধনতত্ত্ব ভরা আছে লালশশীর গানে, সাহেবধনীদের কুবিরের গানে। দুই ধর্মেই ইসলাম ও সুফিতত্ত্বের ভাবসমকত্ব আছে।

দুই ধর্মের অমিলও অনেক: কর্তাভজাদের সাপ্তাহিক সমাবেশ শুক্রবার, সাহেবধনীদের বৃহস্পতিবার। সাহেবধনীদের প্রচার ও প্রসার অনেক কম। তারা কায়াসাধন করে গুরুর নির্দেশে। তারা মূলত দরিদ্র ও অশিক্ষিত। কলকাতা বা বৃহৎ বঙ্গে তাদের কোনদিন পরিচিতি ঘটেনি। তাদের মুসলমান

সদস্য অনেক বেশি। দায়িক মজলিস বা পাপস্বীকার তাদের অজ্ঞাত। 'ভাবের গীত' জাতীয় আইনপুস্তক তাদের নেই। কোন মননশীল ব্যক্তি কখনও এ-ধর্মে খুঁজে পাননি কোন উৎসাহ। প্রকৃতপক্ষে উপেক্ষিত বনকুসুমের মতই সাহেব-ধনীরা অবজ্ঞাত হয়ে রয়েছে অন্তত দুই শতাব্দী। তাদের নিয়ে তৈরী হয়নি বিতর্ক বা প্রতিরোধ, অপপ্রচার বা ধিক্কার। কলকাতা থেকে বহুদূরে প্রত্যন্ত পল্লীর অন্ধকারে অক্ষত জীবনস্পন্দে চলে আসছে এই বিচিত্র লোকধর্ম আর তাদের আশ্চর্য সজীব গানের ধারা।

মানুষের কণ্ঠবাহিত ব'লে গানের রহস্য যেমন অতল তেমনই আশ্চর্য তার বিচরণ শক্তি। পাখি যেমন ক'রে বীজ বহন করে তেমনই কোন্ যুগে কোন্ হাওয়ার পথে যে গানের যাতায়াত তা ধরা শক্ত। তাই অবাক হয়ে আবিষ্কার করা ছাড়া উপায় কি যখন দেখি ১৮৮২ সালের অক্টোবরে দক্ষিণেশ্বরে ব'সে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস গাইছেন কুবির গোঁসাইয়ের গান? শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে ধ'রে রাখা সেই গান তো প্রায় সব বাঙালিই শুনেছেন কিন্তু কজন সনাক্ত করতে পেরেছেন? গানটি :

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবিরে প্রেম রত্নধন॥
খোঁজ্ খোঁজ্ খোঁজ্ খুঁজলে পাবি হৃদয়মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতি হৃদে জ্বলবে অনুক্ষণ॥
ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ ড্যাঙায় ডিঙ্গে চালায় বল সে কোন্ জন।
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥*

* বৃত্তিহুদা থেকে পাওয়া রামলাল ঘোষের অনুলিখনে এই গানের (সংখ্যা ৪৩১) সম্পূর্ণ রূপটি পাওয়া যায়। এখানে তা হুবহু দেওয়া গেল (দ্রষ্টব্য : ফটোস্ট্যাট)। মূল গানে কুবিরের নাম নেই, চরণের আছে।

ডুব ৩ রূপ সাগরে আবার মোন :।
তলাতল পাতাল খুজে : পাবি নাক রত্ন ধোন :॥
ঢুপ ৩ ঢুপে চাগে হত্র থাকো সচেতন :।
আবার দুপ ৩ জ্ঞানের বাতি হৃদয় জলবে সর্ব্বক্ষণ :॥
খোজ ৩ হ্রিদয় মাজে দেখতে পাবি বিন্দাবন :।
আবার খোজ ৩ বুজলে হবে সহজ মানুষের করণ :॥
ডেঙ্গ ৩ ডেঙ্গায় ডিঙ্গে চালায় আবার সে কোন জোন :।
সোন মোন ৩ একমোনেতে ধর গুরুর শ্রীচরণ :॥

এ-গান কোথা থেকে এল শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে? গানের শেষে কুবীর আর চরণের উল্লেখ স্পষ্ট ও নিঃসন্দিগ্ধভাবে গানটির সাহেবধনী-চরিত্র বোঝাচ্ছে। সমন্বয়বাদের ভাবসাধক দক্ষিণেশ্বরের শাক্ত যুগাবতার কুবিরের সহজিয়া গানে কেমন ক'রে পেয়ে গেলেন তাঁর নিজের উচ্চারণ? এ সৌভাগ্য আর কজনের হয়েছে বলা কঠিন। তার চেয়েও কঠিন এই উত্তর যে কেমন ক'রে বৃত্তিহুদার গ্রামীণ গান খুব ঘনিষ্ঠ সমকালে পৌঁছে গেল দূরান্তের জনপদে।

লৌকিক গানের পরিবহণের রহস্য অন্যভাবে মীমাংসা হয় যখন দেখি বিশ শতকের গোড়ায় ঠাকুরবাড়ির সরলা দেবী তাঁর কর্তা দাদামশায়ের সঙ্গে চুঁচুড়ার গঙ্গাবাসকালে নৌকার মাঝিদের গান শুনে তাদের কাছ থেকে টুকে নেন নানা লোকগীতির নমুনা। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের আমলে রবীন্দ্রনাথ সেই সুরের ওপর ভিত্তি ক'রে লেখেন অনেক স্বদেশী গান। সংগৃহীত গানের অনেক নমুনা সরলা দেবী ভ'রে রাখেন তাঁর 'শতগান' বইতে। আশ্চর্য নয় কি যে তাতে একখানা কুবিরের গান রয়ে গেছে? গানটি:

(হায়রে) আমি নিকলাম সব, ঠিক দিতে পারলাম না!
জেনে শুনে বয়রা পাগল।
(ও ভোলামন) হিসাবের গোল মিটল না!
ভেক নিয়ে বৈরাগ্য হলাম।
(ও ভোলামন) মুড়িয়ে মাথা ছেঁড়া কাঁথা গলেতে নিলাম
আমি জাত খোয়ালাম কিছুই হলাম না।
(ও সেই) কুবীর বলে শোন্‌রে নবী
গোঁসাই জেনে বিচার করল না।
কেন চরণে মন ডুবল না।

এই ছোট গানখানির মূল রূপ রামলাল ঘোষের অঙ্গুলিখিত খাতায় পাওয়া যায় খুবই দীর্ঘ আকারে (উৎসাহী পাঠক দেখে নিন এই বইয়ের শেষাংশে ২৯ সংখ্যক গান।) এইরকম অসতর্কভাবে মনসুরউদ্দীন রাজশাহীর কালীগ্রাম থেকে পাওয়া একটি কুবিরের গান তাঁর 'হারামণি' তে গেঁথে নেন। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর সুবৃহৎ সংকলনে ভ'রে দেন চারখানি কুবিরগীতি অ-সনাক্তকৃত-ভাবে এই পরিচয়ে যে 'কেঁদুলির মেলায় বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মানভূম, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান প্রভৃতি জেলা হইতে সমাগত বাউলদের' কাছ থেকে

সংগৃহীত। একেই হয়ত বলে 'ঘরের পাশে হয়না খবর/ঘুরে বেড়াও দিল্লী-লাহোর'।

তবে কি এইটাই সত্য যে ১৮৭০ সালে ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে অক্ষয়কুমার দত্তের প্রথম উল্লেখের পর সাহেবধনীদের খবর কেউই নেননি বা নেবার প্রয়োজন বোধ করেন নি? সম্ভবত সেটাই ঠিক এবং সে কারণেই আমাদের দায়িত্ব আরো বেড়ে যায়। উন্মোচন করার দরকার হয় সাহেবধনীদের সমস্ত অনুপুঙ্খ, সংগ্রহ করতে হয় তাদের গান, বিশ্লেষণ করতে হয় তাদের ধর্মতত্ত্ব ও মন্ত্র। সে প্রয়াস সম্পূর্ণ হলে এমন কেবল কথা বোধহয় বলা যাবে না যে, সাহেবধনী কর্তাভজাদেরই এক শাখা। বরং বলতে হবে সাহেবধনী সম্প্রদায় বাংলার এক অভিনব স্বয়ম্বশ লোকধর্ম।

(সাহেবধনীদের উপাস্যের নাম দীনদয়াল। তাই এঁদের 'দীনদয়ালের ঘর'ও বলে। কোন বিগ্রহ বা প্রতীক এঁরা মানেন না। বিশ্বাস করেন মানুষভজনে।) তাকেই বলে মানুষের করণ। বেদ, ব্রাহ্মণ ও শাস্ত্রবিরোধী এঁদের ধর্ম। অন্ধবিশ্বাস, পুতুলপূজা, অপদেবতা বন্দনা খুব নিন্দাহ। কথাগুলি প্রাঞ্জলভাবে বোঝা যাবে কুবিরের গানে :

মানুষের করণ কর।
এবার সাধন বলে ভক্তির জোরে মানুষ ধর॥
হরিষষ্ঠী মনসা মাকাল*
মিছে কাঠের ছবি মাটির ঢিবি সাক্ষীগোপাল
বস্তুহীন পাষাণে কেন মাথা কুটে মর?
মানুষে কোরো না ভেদাভেদ
কর ধর্মযাজন মানুষভজন
ছেড়ে দাওরে বেদ।
মানুষ সত্যতত্ত্ব জেনে মানুষের উদ্দেশে ফের॥
পটে পটে দিওনারে মন
পান কর সদা প্রেমসুধা অমূল্যরতন।
গোঁসাই চরণ বলে কুবির যদি চিনতে পার॥

---

* হরিষষ্ঠী নদীয়ার গ্রাম্যদেবতা। এর অন্য নাম কাঁচাঘট পূজা। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা প্রতিপদে এই পূজার অনুষ্ঠান হয়। মাকাল বা মাখাল বাংলার পল্লীঅঞ্চলের মৎস্যজীবীদের লৌকিক দেবতা। মাটির তৈরি দুটি ছোট পাশাপাশি ঢিবি মাখালের প্রতীকরূপে পূজিত হয়।

এই একখানি গানেই বস্তুত সাহেবধনীদের করণীয় ও অকরণীয়ের হদিশ দেওয়া আছে। এঁদের খাতায় লেখা থাকে 'শ্রীশ্রী৺দীনদয়াল প্রভুর পাদপদ্ম ভরসা'। প্রতি বৃহস্পতিবার দীনদয়ালের ভোগ দেওয়া হয় তাঁর মূল আসন বৃত্তিহুদার পালবাড়িতে। এখানেই থাকেন চরণ পালের বংশধর প্রধান ফকির। এই ঘর থেকে যাঁরা দীক্ষা নিয়ে নিজের বাস্তুতে দীনদয়ালের আসন পাতার অধিকারী হন তাঁদের বলে 'আসুনে ফকির' (যেমন কর্তাভজাদের 'মহাশয়')। এই আসুনে ফকিররা দীক্ষাদানের অধিকারী। তারাই সাহেবধনীদের প্রচারক ও সংগ্রাহক। প্রতি বছর চৈত্রী একাদশীতে তিনদিনের বার্ষিক সমাবেশ হয় বর্ধমানের অগ্রদ্বীপে। সেখানে পাল বাড়ির মূলফকির মূল আসন পেতে বসেন। তাঁর মাথায় থাকে সাদা চাদরের গুণ্ঠন আবরণ এবং হাতে থাকে পূত ফকিরিদণ্ড। তিনি যতক্ষণ আসনে থাকেন ততক্ষণ থাকেন মৌনী। একটি নতুন মাদুরে তিনি বসেন। লাল খেরোর খাতা নিয়ে সামনে বসেন গোমস্তা। আসুনে ফকিররা এসে জমা দেন বার্ষিক খাজনা বা নামান্তরে 'জরিমানা'। সে হিসাব খাতায় লেখা থাকে। এছাড়া তাঁদের দিতে হয় চাল ডাল সব্জী ও খন্দ। তাতেই অগ্রদ্বীপের মহোৎসব এবং বৈশাখী পূর্ণিমায় বৃত্তিহুদার মহোৎসবের ব্যয়-নির্বাহ ও অন্নভোজ হয়। মূলফকির আসুনে ফকিরদের প্রত্যেককে দেন একটি করে নতুন পাটি ও হুঁকো।

অগ্রদ্বীপের সমাবেশ তিনদিনের। সেখানে সম্প্রদায়ীরা দল বেঁধে গিয়ে গাছতলায় গিয়ে আশ্রয় বাঁধেন। প্রথম দিন হয় চিঁড়ে মহোৎসব, দ্বিতীয় দিন অন্ন মহোৎসব এবং তৃতীয় দিন সংলগ্ন গঙ্গায় বারুণীর স্নান সেরে সবাই বাড়ি ফেরেন। কথিত আছে অগ্রদ্বীপেই চরণ পাল দীনদয়ালকে পেয়ে সিদ্ধ হন। সেইজন্যই এই সমাবেশ। বহু বাউল ফকির দরবেশ এখানে আসেন। মূল ফকির এখানে দিনের বেলা খাদ্য ও বাক্য থেকে বিরত হয়ে শুদ্ধাচারে বসে থাকেন। মধ্যরাতে বিরলে একবার আহার করেন। চৈত্রী একাদশীর অগ্রদ্বীপ সমাবেশ আর বৈশাখী পূর্ণিমার বৃত্তিহুদার মহোৎসবের মাঝখানে একদিন পাল বাড়িতে পাঁচজন ব্রাহ্মণভোজন করাতে হয়। তাঁদের বসানো হয় নতুন মাদুরে। ব্রাহ্মণব্যবহৃত সেই মাদুর দেওয়া হয় আসুনে ফকিরদের।

এঁদের সাধারণ অবস্থা দরিদ্র। উৎসবে জাঁকজমক ও আড়ম্বরের পক্ষে শোচনীয় অর্থাভাব। একজন সাধারণ আসুনে ফকির আমাকে ব্যক্তিগতভাবে জানান, রোজ তিনি দীনদয়ালকে চালজল দেন, মাঝে মাঝে হয় চিঁড়ের

মালসাভোগ। বৃহস্পতিবার দীনদয়ালের সেবাপূজায় লাগে পায়েস ও পঞ্চতত্ত্ব। পঞ্চতত্ত্ব মানে চাল ডাল ও তিনরকম আনাজের সমন্বয়। হৃতদরিদ্র গরীব এই ধর্মসম্প্রদায় তাঁদের উপাস্যকে যে 'দীনদয়াল' 'দীনবন্ধু' বলে ডাকেন তা সব অর্থেই সত্য। বৃত্তিহুদার পাল বাড়ির বিশাল বাড়ি ভেঙ্গে পড়ছে। দীনদয়ালের ঘরের ছাদ পড়ো পড়ো। পালেরা নানা সরিকে বিভক্ত।

সমাজবিজ্ঞানীদের কৌতূহল মেটাতে এখানে পেশ করা যায় একটি তথ্য। ১৩২১ বঙ্গাব্দের 'অগ্রদ্বীপের খাতা' থেকে দেখা যায় সে বছর মেলায় যোগ দিয়েছিলেন শতাধিক আসনে ফকির। ব্যয় হয়েছিল ৪-৫ টাকা ১৫ পয়সা। ভোগের জন্য লেগেছিল ৩০ মণ চাল, ১৬ মণ চিঁড়ে এবং ৫৷৷ মণ কলাই। চিত্রটি বর্তমানে সকরুণ। আসনে ফকির বর্তমানে ৪০ জন। চাল ৫ মণ চিঁড়ে ২ মণ আর ১ মণ কলাইয়েই এখনকার নমো নমো উৎসব। কর্তাভজাদের সঙ্গে সাহেবধনীদের অর্থনৈতিক ফারাকটিও তাই চোখে পড়বার মত।

সাহেবধনীদের ধর্মসাধনায় গোপনতা আছে। যথার্থ গুরুর কাছে দীর্ঘ চর্যার পর সকল আচারের অধিকার আসে। 'সাহেবধনী ঘরের শিক্ষার সত্যনাম' বলে একটি আলতায় লেখা দুর্লভ খাতা আমি পাই ফকির শরৎকুমার পালের কাছে। তার মধ্যে যেসব মন্ত্র ও আচরণবিধি আছে তা অসম্প্রদায়ীর পক্ষে সংগতকারণেই দুর্বোধ্য। তবে কোন কোন মন্ত্র আমাদের কাছে তাদের আচরণ সম্পর্কে কিছু স্পষ্টতা আনে। যেমন :

করোয়া সাধন

চারিচন্দ্র একত্তর। করোয়াতে করেতে করে ভর। দোহাই শ্রীগুরুর দোহাই।

এই মন্ত্রে চারিচন্দ্রের উল্লেখ থেকে বোঝা যায় অন্তত কোন এক স্তরে সাহেবধনী সাধক মল-মূত্র-রজ-বীর্য গ্রহণ করে। দীনদয়ালের জোকার দিয়ে তারা বলে 'জয় দীনদয়াল অটলবিহারী করোয়াধারী'। করোয়া একরকম পাত্র।

এঁদের প্রধান তিনটি মন্ত্র পরপর উদ্ধৃতি দিলে অনেক ইঙ্গিত স্পষ্ট হবে। তবে যেহেতু এসব আচরণীয় তাই খুলে বলা দুরূহ। মন্ত্র তিনটি :

১ ক্লিং খ্লিং দীনদয়াল সাহেবধনী সহায়। গুরু সত্য। চারিযুগ সত্য। চন্দ্রসূর্য সত্য। খাকি সত্য। দীননাথ সত্য। দীনদয়াল সত্য। দীনবন্ধু সত্য।

গোঁসাই দরদী সাঁই / তোমা বই আর আমার কেহ নাই ॥

২ গুরু তুমি সত্য ধন। সত্য তুমি নিরঞ্জন। গুরু তোমার নাম সত্য। কাম সত্য। করণ সত্য। দীননাথ দীনদয়াল সত্য। দীনবন্ধু সত্য।

গোঁসাই দরদী সাঁই / তোমা বই আর আমার কেহ নাই।

৩ ক্লিং সাহেবধনী আল্লাধনী দীনদয়াল নাম সত্য। কাম সত্য। করণ সত্য। ঠাকুর সত্য। সেবা সত্য। বাক সত্য।

গোঁসাই দরদী সাঁই / তোমা বই আর আমার কেহ নাই।

এসব মন্ত্রে বহুরকম ভাবনা মিশে গেছে। তবে ইসলামী প্রভাবটুকু আলাদা দেখার মত। তিনটি মন্ত্রে অনেকগুলি একার্থক কথা বারবার আছে। আসলে একার্থক শব্দ কতকগুলি বিশ্বাসের উচ্চারণ। যেমন 'চারিযুগ সত্য' কথাটির মধ্যে এই বিশ্বাস ব্যক্ত যে, সত্য ত্রেতা দ্বাপরের সঙ্গে কলিযুগে দীনদয়ালের আবির্ভাবকে এরা সমচক্ষে দেখেন ও মানেন। 'করণ সত্য' বলতে শাস্ত্রীয় পুঁথি বিগ্রহ বাদ দিয়ে মানুষের করণ যে অনেক বড় একথা বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য মানুষের করণ বলতে মৈথুনাত্মক যোগাচার বোঝায়।

মন্ত্রের শুরুতে ক্লীং মন্ত্র আর কাম সত্য বলতে কামবীজ কামগায়ত্রী বোঝানো হয়েছে। দুটোই সহজিয়া বৈষ্ণবসাধনার অনুষঙ্গী। আর 'খাকি সত্য' বোঝাতে কুবিরের গানের সহায়তা নেওয়া ভাল। খাকি শব্দটি 'খাক' শব্দের নামান্তর। ফকিরি মতে এই পৃথিবীর চার উপাদান : আব আতস খাক বাদ। তার মধ্যে খাক বা মাটি সাহেবধনীদের টোটেম। সংকেতে তাঁদের গুহ্য সাধনতত্ত্বকে মাটির কাজও বলে। এই খাক বা মাটি তত্ত্ব কুবির এইভাবে বোঝান তাঁর গানে :

নাই এমন আর
এই মাটিতে খাঁটি করো মন আমার।
মাটি ব্রহ্মাণ্ড মূলাধার
এই মাটিতে একে একে দীননাথ হয়েছেন দশাবতার ॥

নীচ হয়ে রয়েছেন মাটি এই মাটিতে বসতবাটি
হ'লে মাটি ম'লে মাটি মন মাটি কর সার ॥

এই মাটি তত্ত্বের ভিতরস্তরে রয়েছে খাকিতত্ত্ব। তাই বলা হচ্ছে :

আগে ছিল জলময় পানির উপর খাকি রয়
খাকির উপর ঘর বাড়ি সকল রে।

ভাইরে যে আল্লা সেই কালা সেই ব্রহ্মবিষ্টু
ও সেই বিষ্ণুর পদে হল গঙ্গার সৃষ্টি রে।
ভাই রে হিন্দু ম'লে গঙ্গা পায় যবন থাকে জমিনায়
শাস্ত্রমতে বলি শোন স্পষ্টরে ॥

সাহেবধনীদের ন্যায়শাস্ত্রমতে তাহলে তত্ত্বটি এইরকম যে, আদিতে জল তার ওপর খাকি। সুতরাং খাকি আর পানি এক। তাই হিন্দুর গঙ্গাপ্রাপ্তি আর মুসলমানের কবর আসলে এক। আর যেহেতু বিষ্ণুর পদে গঙ্গার সৃষ্টি এবং সেই পানির উপরে খাকি তাই আল্লা আর কালা এক। এবারে বলা হচ্ছে:

পানি আছেন কুদরতে খাকি আছেন পানিতে।
আর আতস খাক বাদ চারে কুলে আলম পয়দা করে
হিন্দু যবন জানে না কিছু বোঝে না এই সংসারে ॥

জল আকাশ মাটি আর হাওয়া এই চারকারের মধ্যে খাকির তত্ত্ব বুঝলেই আর সব বোঝা সহজ হয়ে যায়।

কিছু মন্ত্রের ইঙ্গিত এইভাবে ভেদ করা যায় কিন্তু দীনদয়ালের ঘরের অনেক মন্ত্রই থেকে যায় অস্পষ্ট। রাজমোহিনী জপ, মোহিনীমায়া, রসতত্ত্ববীজ, রূপতত্ত্ব-বীজ, রতিতত্ত্ববীজ নামধারী বহুতর মন্ত্র ও আচারের জগৎ আমাদের বোধবুদ্ধির সামনে থাকে অর্গলবদ্ধ। আবার কিছু মন্ত্র তৈরী করে হেঁয়ালি, যেমন:

মুলে ব্রহ্মা স্থূলে বিষ্ণু শিব ধরিয়ে ত্রিশূল কয় রতি।
দুই চন্দ্র দেহ মুক্তি। তিনচন্দ্র কয় পাতা।
চারিচন্দ্র আলেক লতা।

কিন্তু সব লোকধর্মে ব্যাধিগ্রস্ত ও আর্ত মানুষদের জন্য মন্ত্র থাকেই। আর থাকে কবচ তাবিচের ছক। দীনদয়ালের ঘরে তার অভাব নেই। বিপন্ন ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের রোগমুক্তির যে প্রার্থনামন্ত্র আমি এঁদের কাছ থেকে পেয়েছি তাতে কোন হেঁয়ালি বা ধূপছায়া নেই। দীনবন্ধু দীনদয়ালের ব্যাধিবিদারণ রূপটিও তো আমাদের দেখা দরকার নইলে যে তাঁকে সম্পূর্ণরূপে দেখা হয় না। তাঁর কাছে আত্মনিবেদনের মন্ত্রের ভাষা যেমন সরল তেমনই মর্মস্পর্শী:

নালিশ করি দীননাথ শুন শুন আপনি।
তুমি থাকতে এত দুঃখু পাইতেছি দিবারজনী ॥

পূর্বে লাল উঠিল ভানু পশ্চিমে যায় রথ।
আমার রোগশান্তি কর দোহাই দীননাথ।

বাউলের নিঃসঙ্গ একতারার মতই সাহেবধনীদের আজকের অবস্থা বড় নির্জন। অনতিঅতীতের গৌরবসাক্ষী বৃত্তিহুদার ভগ্নাবশেষ পালবাড়ি জলাঙ্গী নদীর দিকে চেয়ে অভিমানে ক্রমশ ভেঙে পড়ে। তেমনই করে ক্ষয়ে যায় লোকবিশ্বাসের এক একটি অবলম্বন। এখন চরণচাঁদের নামের জোরে আর ব্যাধির উপশম হয় না। নতুন ক'রে দীনদয়ালের ভক্ত আর কে হবে এই বস্তুগত বৈশ্যযুগে? সাহেবধনীদের সঙ্গে কর্তাভজাদের এক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখে যদিও বলি 'একটি বৃক্ষের দুটি শাখা' তবু করুণ সত্য এই যে একটি শাখা আজ ভগ্নপ্রায়! তবু সান্ত্বনা এই যে সেই-শাখায় একদিন আশ্রয় নিয়েছিল এক অলৌকিক পাখি। পাখির মতই স্বতোৎসারে ঝরে-পড়া কুবির গোঁসাইয়ের গানের সুরে আজও ধরা রয়েছে এক অত্যাশ্চর্য স্বরলিপি। হয়ত একদিন সাহেবধনীদের কথা সবাই ভুলে যাবে কিন্তু থেকে যাবে কুবিরের বিচিত্র গানের জগৎ। ফুটে উঠবে ক্ষীয়মাণ এক ধর্মসম্প্রদায়ের বাতাবরণে বলিষ্ঠ এক মানুষের উচ্চারণ। যে একবার বিনম্রভাবে বলে: 'আমার নাম কুবির দীনহীন' পরক্ষণেই পরম গর্বে ব'লে ওঠে: 'আমার নাম কুবির কবিদার!'

'আমার নাম কুবির কবিদার'

সাহেবধনীদের গান লিখেছিলেন দুজন : কুবির গোঁসাই আর তাঁর শিষ্য যাদুবিন্দু গোঁসাই। যদিও কুবিরের রচনাপ্রতিভা, প্রকরণ ও গানের সংখ্যা যাদুবিন্দুর চেয়ে অনেকবেশি তবু লৌকিক গানের জগতে যাদুবিন্দুর প্রসিদ্ধি ও পরিচিতি অনেক ব্যাপক। তার একটা কারণ যাদুবিন্দু অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের মানুষ (১৮২১-১৯১৬), তাঁর গানগুলি সহজ ও সুবোধ্য এবং তাঁর বাড়ি রাঢ় অঞ্চলে, যেখানে তাঁর গান গাইবার মত বাউল দরবেশ অজস্র। কুবিরের বিচরণকাল (১৭৮৭-১৮৭৯) অপেক্ষাকৃত অনাধুনিক পর্বে, তাঁর গান তত্ত্বগর্ভ ও জটিল এবং তাঁর আবাস ছিল দুর্গম পল্লীর অভ্যন্তরে। সেইজন্য তাঁর গানগুলি তেমন ক'রে কারুর চোখে পড়েনি। তাছাড়া কুবিরের গান খুব মৌলিক রচনারীতি ও গভীর সাধনতত্ত্বে নিবিড়, সে গান জনপ্রিয় হওয়া কঠিন। অথচ যাদুবিন্দুর গানের ভাব ও ভাষা চিরকালের বাংলা সহজিয়া গানের সঙ্গে চমৎকার ভাবে মিশে যায়। তাই উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মত সংগ্রাহক মন্তব্য করেন : 'যাদুবিন্দু রাঢ়ের বাউল ও বহু সংগীত রচয়িতা। গুরুর নাম কুবীর গোঁসাই। ····· যাদুবিন্দুর গান বাংলার বাউল মহলে সর্বত্র গীত হয়। বাংলার, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের, এমন বাউল নাই, যার যাদুবিন্দুর গান দুই চারিটি মুখস্থ না আছে।'

আশ্চর্য যে, উপেন্দ্রনাথ কুবিরের নাম যাদুবিন্দুর গুরু হিসাবে উল্লেখ করেছেন অথচ গুরু সম্পর্কে কোন কৌতূহল দেখাননি, অথচ তাঁর সুবৃহৎ গীতিসংকলনেই কুবিরের ভণিতাযুক্ত চারখানি গান রয়ে গেছে। এ যেমন তাঁর গানসংগ্রহ রীতির অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় তেমনই সুদীর্ঘকালব্যাপী কুবিরের প্রতি যে অবহেলা দেখানো হয়েছে তারও নমুনা। কুষ্টিয়ার ছেঁউরিয়া গ্রামের লালন ফকিরের ভাগ্যেও হয়ত একই অবহেলা জুটত যদিনা রবীন্দ্রনাথ ঘটনাচক্রে ঐ অঞ্চলে তাঁর জমিদারি পরিচালনা করতে যেতেন এবং মতিলাল দাস সংগ্রহ করতেন লালনগীতি। অবশ্য একথা যেন কেউ না ভাবেন যে, কুবিরের গান বাউল সম্প্রদায়ে একেবারে অজ্ঞাত। অনেক বাউলই তাঁর নাম জানে, তাঁর গানও জানে, বোঝে তার মর্ম। তবে বাউল গানের সবচেয়ে চলমানতা যে-

দিকটায়, অর্থাৎ বীরভূম ও রাঢ় অঞ্চলে, সেদিকে কুবিরের চেয়ে যাদুবিন্দুর গান বেশি চলে। আর অন্যদিকে অর্থাৎ বাউল গানের অন্য একটা মুখ যেদিকে, নদীয়ার বাংলাদেশভুক্ত সেই অংশে ও যশোহরে প্রচলিত গানের অপ্রতিহত সম্রাট লালন শাহ্ এবং তাঁর অনুষঙ্গে পাঞ্জু শাহ্, হাউড়ে গোঁসাই ও দুদ্দু শাহ্। কুবির বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যই যে অনেকাংশে তাঁর প্রাপ্য পরিচিতি ও মর্যাদা পাননি সেকথা স্পষ্ট বলা যায়। তাঁর কবিত্ব ও রচনার গভীরতা যে অত্যন্ত উঁচুপর্যায়ের তার একটা বড় প্রমাণ হ'ল কোন ভাবে-বেরিয়ে-যাওয়া তাঁর একটি মাত্র গানই ('ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন') সকলের মন জয় করেছে।

কুবির গোঁসাইয়ের ব্যক্তিপরিচয়টুকু আগে জেনে নেওয়া দরকার। তাঁর মূল বাসস্থান ও জন্মস্থান ঠিক কোথায় তা নির্ণয় করা যায়নি। তবে জীবনের খুব বড় অংশ যে তাঁর গুরুপাট বৃত্তিহুদা গ্রামে কেটেছিল এবং সেখানেই যে তিনি দেহ রেখেছেন তার প্রমাণ তাঁর সমাধি মন্দির। সেখানে তাঁর প্রপৌত্র আজও সমাধিমন্দিরে প্রদীপ জ্বালে, পৌত্রের স্ত্রী আজও তাঁর গান করে। আর কুবিরের সমাধিমন্দিরে উঁকি দিলে দেখা যাবে একটি মাটির স্তম্ভ, একটি সুসজ্জিত চৌকি ও শয্যা, তাঁর ব্যবহৃত ফুলের সাজি, ফকিরি দণ্ড, বাঁকা লাঠি, ত্রিশূল, খড়ম ও কাঠের পিঁড়ি। কুবিরের সমাধিমন্দিরের অনতিদূরে তাঁর শিষ্য রামলাল ঘোষের ভিটায় পৌত্র রামপ্রসাদ ঘোষের হেফাজতে রয়েছে কুবিরের গীতি-পদাবলীর অনুলিখিত খাতা। মূলখাতার সন্ধান মেলেনি।

কিন্তু কুবির গোঁসাই মানুষটির সন্ধান অনেকটাই মেলে তাঁর গানে, শিষ্য রামলাল ঘোষের কয়েকটি পদে ও যাদুবিন্দুর পদের ভণিতায়। কুবির গোঁসাইয়ের আসল নাম কুবের সরকার। জাতে যুগী। বৃত্তি তাঁত বোনা। তাঁর এই সরকার পদবীর কারণ তিনি 'বঁদ' গান ব'লে একরকমের প্রশ্নোত্তরমূলক গানের গায়ক ছিলেন। সেকালে 'বঁদ' গানের মুসলমান গায়কদের বলা হত মুন্সী আর হিন্দু গায়কদের বলা হ'ত সরকার। এই জন্যই কুবির গোঁসাইয়ের প্রচলিত নাম ছিল কুবির সরকার। যুগীদের সঙ্গে বাউল ও বৈষ্ণব সহজিয়াদের যোগাযোগ বহু যুগের। তার পশ্চাদ্‌পটে রয়েছে এক ধর্মগত শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস।

মধ্যযুগের বাংলায় তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম ও তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের মিশ্রণে যে রূপান্তরিত ধর্ম জাগে তার একটি কৌলধর্ম। কুলকুণ্ডলিনী তত্ত্বে যারা বিশ্বাসী তারাই কৌলমার্গী। তারা ছিল ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রম আশ্রয়ী। কিন্তু একই গুহ্য

সাধনরীতি থেকে জাত নাথধর্ম ছিল বর্ণাশ্রমবিরোধী। নাথপন্থ বিশ্বাস করত দেহযোগে। তাদের বিশ্বাস যে, মানুষের দুঃখবেদনার মূলে তার অপক্বদেহ। দেহযোগরূপ আগুনে অপক্ব দেহকে পক্ব করে নিলে তবে সেই দিব্যদেহ দিয়ে পাওয়া যায় অমরতা। ব্রাহ্মণবিরোধী এই নাথসম্প্রদায় বহু রাষ্ট্রীয় কারণে ও সমাজ-সংঘাতে অবনত হয়ে যায়। পরাজিত নাথ সম্প্রদায় আর মাথা তুলতে পারেনি। শ্রেণী ও বর্ণের নিয়ন্তা ব্রাহ্মণরা নাথদের বসায় নিচুস্তরে। তাদের বৃত্তি হয় তাঁত-বোনা। তাদের মধ্যে যারা মুসলমান ধর্মান্তরিত হ'ল তাদেরও বৃত্তি রইল তাঁত-বোনা। যশোর, কুষ্টিয়া, পাবনা, নরসিংদি এই সব অঞ্চলে অধিকাংশ মানুষের জীবিকা তাঁত-বোনা। এ অঞ্চলেই বাউল মতবাদের সবচেয়ে বিস্তৃতি। বেশিরভাগ বাউল ফকিরের রক্তে যে বেদ ও ব্রাহ্মণ বিরোধিতা তার মূলে এক পরাজিতের অভিমান লুকিয়ে আছে। হিন্দু যুগী আর মুসলমান তাঁতীরা আঠারো শতকে নানা জাতীয় সহজিয়া ধর্মকে আশ্রয় ক'রে তাদের রক্তের ক্ষোভ মিটিয়েছিল। কুবের সরকার এমনই একজন পরাজিত ও অভিমানী নাথপন্থী। তাই প্রথম সুযোগেই তিনি নেন সাহেবধনীদের আশ্রয় এবং ব'লে ওঠেন 'ঘটে পটে দিওনারে মন'। বলেন 'মিছে মাটির ঢিবি কাঠের ছবি সাক্ষীগোপাল', ফতোয়া দেন 'ছেড়ে দাওরে বেদ'।

তাঁর নিজের বৃত্তি তাঁত-বোনা সম্পর্কে কোন অগৌরবের হীনতাবোধ ছিল না। খুব বুক ফুলিয়েই কুবির জাত ও বৃত্তিসম্পর্কে ঘোষণা করেছেন :

যুগীর ব্যবসা ভাতছানা।
এই সুতোর গায়ে মাখিয়ে তাই কাড়াই তানা॥
আমার দুইদিকে খাটুনী।
আমি একবার কাড়াই একবার করি তাম্বনি॥
আমি গেঁথে সানা মেড়ো তানা
করি নরাজ গুটানি।
দিই বোয়া জুড়ে গেঁড়েয় পড়ে
ঝাপে কোপে তাঁত বুনি॥

বর্ণনা থেকে বোঝা যায় তাঁত-বোনার অনুপুঙ্খ কুবিরের জানা ছিল। ঐ বৃত্তিগত পরিভাষা তিনি এমন স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করেছেন যার থেকে তাঁর অভিজ্ঞতা ফুটে বেরোচ্ছে। এই সূত্রে তাঁর পূর্বাশ্রম সম্পর্কে একটু ইঙ্গিত অনুমান করা চলে। মানুষটি যে বৃত্তিহুদার খাদিলোক ছিলেন না সেকথা

সবাই বলেন। চরণ পালের কাছে এসে তিনি দীক্ষা-শিক্ষা নিয়ে হুদাতেই থেকে যান ও দেহ রাখেন এ তথ্যে কোন বিতর্ক নেই। কিন্তু তিনি এলেন কোথা থেকে? সরেজমিন অনুসন্ধান থেকে যে-অনুমান করা চলে এখানে সেটুকুই ব্যক্ত করা যায়, কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। জানা যায়, নদীয়া জেলার যে-অংশ বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত তার চুয়াডাঙ্গা মহকুমার আলমডাঙ্গার ঘোষবিলা গ্রামে কুবির নামে একজনের পাট আছে। তাঁর তাঁত আজও পুজিত হয় এবং বারুণীর দিন হয় মহোৎসব। এই ঘোষবিলা থেকে বৃত্তিহুদার দূরত্ব খুব বেশি হলে ২০ মাইল। চরণ পালের নামডাক শুনে কুবিরের পক্ষে হুদার চলে আসা এবং বরাবরের জন্য বাসা বাঁধা একেবারেই কি অসম্ভব? কুবির যে নদীয়াবাসী ছিলেন তার প্রমাণ যেমন তাঁর নামের উচ্চারণগত স্বরসঙ্গতিতে (কুবের>কুবির) তেমনই তাঁর গানের ভাষা ও শব্দ চয়নেও বেশ বোঝা যায়। তাঁর জন্মস্থানসংক্রান্ত এই অনুমানের আরেক ভিত্তি হল তাঁর বৃত্তি। চুয়াডাঙ্গা মেহেরপুর আর কুষ্টিয়া তো এককালে যুগীদের বড় কেন্দ্র ছিল।

কুবিরের গান ভাল করে পড়লে দেখা যায় তাঁর স্বভাবে ভ্রাম্যমানতা ছিল এবং তিনি কবিগান ক'রে বেড়াতেন। এই সুবাদে তিনি বৃত্তিহুদা এসে পড়েন নি তো? তিনি যে কবিদার ছিলেন তার সাক্ষ্য রয়েছে একটি আত্মজৈবনিক গানে। সেখানে স্পষ্টই বলা হয়েছে:

আমার নাম কুবির কবিদার।
এই দেশে দেশে বেড়াচ্ছি ক'রে রোজগার॥

চরণ পালের কাছে দীক্ষাশ্রয় পাবার পরও তাঁর কবিদারী করতে হয়েছে জীবিকার জন্য। কবিগানের প্রতিপক্ষ গোলামজাদাকে উদ্দেশ্য ক'রে লেখা তাঁর এই গানে যেমন বলেছেন 'ওরে নাই আমার ঘরদুয়ার,' তেমনই জানাতে দ্বিধা করেননি:

আমি সন্ন্যাসী উদাসীন।
থাকি চরণতলে চরণ ভাবি নিশিদিন
আমি সাধুর দ্বারে পাতড়া চাটা কুলে খোটা বছর তিন।
করি গুরু প্রতি নিষ্ঠা রতি যাবে সকল পাপের ঋণ॥

এখানে বছর তিনের উল্লেখ থেকে অনুমান হয় যে এই গান লেখার সময় চরণ পালের শিষ্যত্ব গ্রহণের তিনবছর চলছে কুবিরের। কবিগানে খ্যাতি বিষয়ে তাঁর বিনয়বচন এই প্রকার যে,

আমি নই কিছু এলেমদার।
সেই কেতাব কোরান জানিনেক সন্ধি তার।
শুনে সাধুর মুখে প্রেমের কথা হক নাম করেছি সার॥
হ'ল তাতে মুগ্ধ মুলুক সুদ্ধ, না ক'রে কি করে ভাই।

কবিগানে তাঁর প্রতিপক্ষ জাতিতে মুসলমান। সম্ভবত তার ধর্মকেন্দ্রিক কোন বক্রোক্তি বা কটাক্ষের জবাবে কুবির বলেন :

এই নাম ভরসা শ্রীগুরু করেছি সার।
এই পরমার্থতত্ত্ব জানলে তাতে নাইক জাতবিচার॥
আমি তোদের শত্রু নই।
জাতে হিন্দুর ছেলে আল্লা ব'লে করি শমনজয়ী॥

মুসলমানদের সঙ্গে কুবিরের ভালই মেলামেশা ছিল, যা সেকালের গ্রামে ছিল নিতান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু হয়ত সাহেবধনী ধর্মের গূঢ় প্রয়োজনে তিনি ইসলামী তত্ত্ব ভাল ক'রে পড়েছিলেন (তাঁর লেখা প্রায় প্রায় দুশো ইসলামী তত্ত্বের গান আছে) এবং সে কারণে সম্ভবত স্বসমাজে তাঁর শূদ্র নামের কলঙ্ক রটে। এর প্রমাণ একটি গানে রয়েছে। যেখানে তিনি গভীর খেদে বলেন :

মরি হায়রে আমি বুদ্ধি বিদ্যেহীন
তাই ভেবে মরি রাত্রিদিন।
এই মুসলমানের শাস্ত্র জেনে
আমি শূদ্র হইলাম কি কারণে।

তাঁর গানের ভুবনে আর একটু এগোলে দেখা যায় হিন্দু মুসলমান যৌথ অভিজ্ঞতা তাঁকে পৌঁছে দিয়েছিল এমন এক উদার সমন্বয়বাদে যা খুব বড় সাধকও আয়ত্ত করতে পারেন না। কুবির খুব সহজে দ্বিজাতিতত্ত্বের বানানো কৃত্রিমতায় ঘা দিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দেন :

সৃষ্টিকর্তা এক নিরঞ্জন।
হিন্দু যবন জাত নিরূপণ দুই কিসের কারণ।
পুরুষের লক্ষণ প্রকৃতি আশ্রয়।
হল যুগলেতে জন্ম সবার মর্ম বোঝো মহাশয়।

আশ্চর্য কি এই ভূয়োদর্শী সাধক পরবর্তীকালে আমাদের চমকে দেবেন এই উচ্চারণে যে 'আল্লা মহম্মদ রাধাকৃষ্ণ একাঙ্গ একাত্মা সার' এবং তারচেয়েও চমকপ্রদ অনুভবে বলবেন,

একের সৃষ্টি সব পারি না পাকড়াতে।
আল্লা আলজিহ্বায় থাকেন আপনসুখে
কৃষ্ণ থাকেন টাকরাতে।

চিন্তাটি তবে কি এতদূর অভিনব যে আমাদের প্রতিটি উচ্চারণ সম্পৃক্ত হয়ে যাচ্ছে যুগ্ম দোতনার সম্মিলনে? এই যুগ্ম তত্ত্ব কুবিরকে করে আরও উদারদৃষ্টি-সম্পন্ন, আরও সমদর্শী। ফলে তিনি আর এক ধাপ এগিয়ে বলেন:

তিনি কায়া তিনি ছায়া তিনি দয়া তিনি মায়া।
তিনি শক্তি তিনি শ্যামা তিনি উমা তিনি ধূমা
তিনি ক্ষেমঙ্করী ক্ষেমা দশ মহাবিদ্যে দরশন॥
ঋতুঘট মনসা মাখাল হরিষষ্ঠী কাল মহাকাল
মঙ্গলচণ্ডী সর্বকুশল গ্রাম্যদেবতার রূপ কল্পন।
ঘটে বিরাজ করেন রূপ ধরেন বাঞ্ছা যার যেমন।
তিনি পশু তিনি বৃক্ষ তিনি নানাজাতি পক্ষ
তিনি জীবের প্রাপ্তি মোক্ষ ত্রৈলোক্যতারণ॥

বৃত্তিহুদায় প্রাপ্ত নথি অনুসারে কুবির বেঁচেছিলেন সুদীর্ঘ ৯২ বছর। দীর্ঘ-দেহী শ্মশ্রুগুম্ফসমন্বিত জীবনরসিক মানুষটি বাস করতেন স্ত্রী ভগবতী আর সাধনসঙ্গিনী কৃষ্ণমোহিনীকে নিয়ে। সাহেবধনী ধর্মসংগত সহজিয়া কায়াসাধনে তাঁর আগ্রহ ছিল। তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্য রামলাল ঘোষ অপটু কবিত্বে লিখে গেছেন কুবিরের চেহারার বর্ণনা এইভাবে:

হইও নাকো বিস্মৃতি কেমন রূপের জ্যোতি
দেখ দেখি মনে করে তাই।
কেমন দাড়ির শোভা যেন কাঁচা সোনার আভা
গোঁপের তুলনা দিতে নাই।
ওষ্ঠ জলবিম্বপ্রায় নাসিকা শোভিছে তায়
জোড়া ভুরু কপাল বিস্তর।
বাম ললাটে অঞ্জলি যেন মেঘেতে বিজলী
দীর্ঘ কেশ তিলক সুন্দর।

দাড়ি সম্পর্কে কুবিরের খানিকটা দুর্বলতাই ছিল মনে হয় এবং সেইজন্য তাঁর একটি গানে দাড়ির স্বপক্ষে খাড়া করেছেন নানা যুক্তি। ব্যাপারটি বেশ মজার বলেই উদ্ধৃতিযোগ্য:

দীনের কাঙাল দরবেশ বলি তাকে।
মুখে গোঁপ দাড়ি ধন্য জগৎ মান্য শুনেছি শাস্ত্রে লেখে—
দেবের দেবতার শ্মশানে বাড়ি গোঁপদাড়ি তার চন্দ্রমুখে।
যার মুখে নেইকো দাড়ি যেন ঠিক ছড়া হাঁড়ি
যায় সদা গড়াগড়ি কানাচে ফেলায় লোকে।
সেই মেয়েমুখো খেটের চকো যাত্রা হয়না তাদের দেখে।
ব্রহ্মা আর বিষ্ণু যারা ব্রহ্মভাবিকে তারা
মুখে গোঁপদাড়িভরা এ ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিকে।
নাইক দাড়ির তুল্য মূল্য দিতে অবধৌত জানে তান্ত্রিকে।
পুরুষ প্রকৃতি চিহ্ন দুই দেহ ভিন্ন ভিন্ন দাড়ির মাহিম্ম্য
জানিবে কে অভাবিকে।
কুবির বলে দাড়ির মান্য করে চরণ রেখো মস্তকে ॥

কুবিরশিষ্য রামলাল অক্ষরবৃত্ত ছন্দে বৃত্তিহুদায় কুবিরের পরিপার্শ্ব ও সে সময়কার প্রধান সাহেবধনী সাধকদের তালিকা লিখে রেখেছেন। তথ্য হিসাবে তার কিছুটা এখানে ব্যবহারযোগ্য :

প্রণমামি গোস্বামীর চরণে নিবেদন।
বন্দিব চরণচাঁদের যত ভক্তগণ॥
প্রথমে বন্দনা করি গোঁসাই কুবিরচাঁদের চরণ।
যাহারে শ্রীবড় গোঁসাই বলে সর্বজন॥
কৃষ্ণমণি ভগবতী বন্দিব দুই মাতা।
গোপাল ঘোষকে বন্দিব শ্রীচরণ চাঁদের ভক্ত্যা॥
বন্দিব বিদ্যার গুরু জঙ্গলী সরকার।
ঐহিক পারমার্থিক যেন হয়গো নিস্তার॥
বন্দিব গৌরখুড়ার চরণারবিন্দু।
বন্দিব তাহার পুত্র নাম যাদবিন্দু॥
বন্দিব রামচাঁদ গোঁসাই বামুনপুকুরবাসী।
বন্দিব জগত্তী মাতা দিনুরতন দাসী।
বন্দিব প্রহ্লাদ গোঁসাই দিয়ে জয় জয়।
দিল সিং যাহার কাছে হয়েছে পরাজয়॥
বন্দিব রতিমতি খ্যাপার চরণ ধরিয়ে।

বন্দিব হীরেলাল সাঁই বিনয় করিয়ে ॥
বন্দিব চরণ বিশ্বাসে ছমির কালু হালদানা।
বন্দিব ওয়ারিশ জায়া লক্ষ্মীটগর সোনা ॥

এখানে নিপুণ তথ্যনিষ্ঠায় বিবরণটি লেখা। এ বিবরণ আমাদের এ-কথাই বোঝায় যে, কুবিরের বিকাশ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সাধনভজন ও ভক্ত সাধকদের একটি পরিমণ্ডল তাঁর চারপাশে ছিল। তার মধ্যে কুবিরের নাম ছিল বড় গোঁসাই এ কথাও জানা যাচ্ছে। কুবিরশিষ্য প্রহ্লাদ ও রামচন্দ্র গোঁসাই ছাড়াও উল্লেখ আছে অনেক তৎকালীন সম্প্রদায়ীর। তাদের মধ্যে যেমন গোপাল ঘোষ, হীরেলাল সাঁই, চরণ বিশ্বাসের উল্লেখ আছে তেমনই উপেক্ষিত হয়নি জগতীমাতা, দিমুরতন দাসী, রতিমতি খ্যাপা বা লক্ষ্মীটগরের নাম। এই লম্বা তালিকা থেকে আমরা বিশেষভাবে বেছে নেব দুটি পংক্তি, যেখানে বলা হয়েছে :

বন্দিব শ্রীগৌর খুড়ার চরণারবিন্দ।
বন্দিব তাহার পুত্র নাম যাদুবিন্দু ॥

কুবিরের প্রধান গীতিশিষ্য যাদুবিন্দুর পিতার নাম যে গৌর গোঁসাই তা এখান থেকে স্পষ্ট হয়। আরো জানা যায় গৌর গোঁসাই চরণ-কুবির পরিমণ্ডলেই মানুষ। যাদুবিন্দু একটি পদে তাঁর পিতা গৌরমোহনকে চরণ পালের অন্যতম প্রধান শিষ্যের আসনে বসিয়ে লিখেছেন :

প্রধান ভক্ত গোঁসাই কুবির মধ্যমে রামচন্দ্র গভীর
তৃতীয়েতে প্রহ্লাদ সুধীর কনিষ্ঠ গৌরমোহন।
চরণভক্ত অনেক ফকির দেশে দেশে করছে জাহির
হিন্দুর গুরু যবনের পীর দয়াময় পতিতপাবন।
চরণচাঁদের ঘর সাবধানী (সাহেবধনী ?) আকাশে পাতালে ধ্বনি
গুরু সত্য সত্যবাণী সত্যকে করে সাধন ॥

গৌরমোহন গোঁসাই যে চরণশিষ্য ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর পুত্র যাদুবিন্দু কুবিরের শিষ্য হন এবং সাহেবধনীদের গান রচনার ধারাকে লোকোত্তর থেকে ক্রমশ লোকায়তের দিকে নিয়ে যান। এই যাদুবিন্দু গোঁসাই (১৮২১-১৯১৬) কুবিরের শেষবয়সের শিষ্য। শিষ্য গুরুর চেয়ে ছেষট্টি বছরের ছোট ছিলেন। যাদুবিন্দু নামটি বেশ রহস্যজনক। যাদবেন্দ্র নামের অপভ্রংশ নয় যাদুবিন্দু। এই নাম যাদু ও বিন্দু এই দুই নামের সমন্বয়। বিন্দু ছিল যাদুর সাধনসঙ্গিনী

বা মতান্তরে স্ত্রী। কথাটা প্রমাণ হয় দুটি পদাংশ থেকে। একটি যাদুবিন্দুরই লেখা ভণিতা :

আছে কুবির পদে আজ্ঞাকারী
যাদু বিন্দু দুজনা ॥

আরেক পদাংশ তিনজনের লেখা, যাতে বলা হয়েছে :

যাদুবিন্দু এরাই দুজনা।
পাঁচলখি গাঁয় তার ঠিকানা ॥

এ থেকে বোঝা গেল গৌরমোহন গোস্বামীর পুত্র যাদু সারাজীবনের মত তাঁর নামের সঙ্গে অঙ্গীকার করে নিয়েছিলেন জীবন বা সাধনসঙ্গিনীর নাম। বাংলা লৌকিক গানের ইতিহাসে এমন প্রেমের কাহিনী আর কখনও শোনেনি কেউ।

যাদুবিন্দু তাঁর একটি পদের ভণিতায় নিজের বাসস্থান, গুরু কুবির ও গুরুর গুরু চরণ পালের নাম একসঙ্গে গেঁথে লিখেছেন :

গোঁসাই কুবির গুণনিধি বৃত্তিহুদায় গদী
সাধন করেছে চাঁদে শ্রীচরণে মনে রেখে।
ও সেই যাদুবিন্দু জুয়াচোর বৃথাই পড়া কপ্নিডোর
আছে সেই বোকার কুঁড়ে পাঁচলখীতে ॥

এই কুবির আর যাদুবিন্দুর যুগলবন্দী গান আজ এই মুহূর্তে আমাদের সামনে ক্ষীয়মাণ সাহেবধনী সম্প্রদায়ের সবচেয়ে ফলবান উত্তরাধিকার। ইতিহাস আমাদের এই কথা শেখায় যে, ধর্মসম্প্রদায় বিলীন হয়ে যায় নিষ্পেষণে, স্ববিরোধে, বিকৃতিতে, কিন্তু তাদের গান থেকে যায়। আর গানের মর্ম আরো প্রগাঢ় হয়ে ওঠে যখন তার অন্তরাল থেকে আমরা খুঁজে নিতে পারি সেই গান লেখার মানুষটিকে, পাই তার দেশকালের ছবি। অন্তঃশীল আত্মবেদনার কোন যুগগত আর্তি ফুটে ওঠে সেই গানে, ধরা থাকে কোন গাঢ় পর্যবেক্ষণের তাপ। কুবিরের গান আমাদের সেদিকেই টানে।

কিন্তু কুবিরের সেই সামগ্রিক বিগ্রহটি সমূহভাবে বুঝে নিতে গেলে তাঁর জীবন-তথ্যের দিকে আর একটু চাইতে হবে। আগেকার বীক্ষণে আমরা জেনেছি কুবির ছিলেন জাতে যুগী, বৃত্তিতে তাঁতশিল্পী, জীবিকায় কবিদার, আর ধর্মে সাহেবধনীমতে দীক্ষিত। এবারে দেখা যাবে তিনি জীবনরসিক, অভিজ্ঞ ও সমকালীন সমাজের রূপকার। চারপাশের জগৎ আর জীবনকে অন্তরঙ্গভাবে

দেখার চোখ আর তাকে দেখাবার লেখনী তাঁর ছিল। এ কথা বোঝাতে আমরা তুলে ধরব পর্যায়ক্রমে তাঁর কিছু পদের অংশ :

১ এই মানুষে করো রে বিশ্বাস মানুষে মানুষের ভাবপ্রকাশ।
যেমন চকমকির ভিতর হ'তে রূপ ঝলকে দেখতে পাই॥

২ তেমনই মন ঘুরিয়ে মারে আমারে
যেমন উপুসী সন্ন্যেসী ঘোরে চড়ক গাছের উপরে।

৩ ঘুরে ঘুরে হ'ল ঘুরণবাই
পড়ে মায়াঘোরে মনচক্রে ঘুরতেছি সদাই।
মাটির বাসন গঠনেতে চাক ঘুরায় যেমন কুমারে॥

উপমা তৈরির পেছনে যে অভিজ্ঞতার নির্মিতি তারও পেছনে রয়েছে কবির সর্বদর্শী মন।

মানুষহিসাবে কুবিরের বহুদর্শিতা ও লৌকিক পুরাণের জ্ঞান ছিল ঈর্ষাজনক। অনায়াসে পুরাণ প্রসঙ্গ ও জীবনের অভিজ্ঞতা তিনি তাঁর গানে গেঁথে দিতেন উপমা আর উল্লেখের বিস্ময়কর বহুমুখিতায়। তার নমুনা হিসাবে প্রথমে পেশ করা যাক তাঁর লেখা এক আশ্চর্য পদাংশ যার উপজীব্য কোন তত্ত্ব বা ধর্মাদর্শ নয় বরং জীবনের সবদিকে ছড়ানো অসম আয়োজনের তালিকা। বিপরীতধর্মী বস্তুগুলি তিনি এইভাবে সাজিয়ে দেখান :

যেমন শুকসারি আর শালিখে। চাকরে আর মালিকে। ডোঙা আর শালুকে। একখানি গ্রাম আর মুলুকে। পাতালে আর গোলকে। আফিমে আর তামাকে। যেমন মালজমি আর খামারে। যেমন কলু আর কামারে। সেঁয়াকুল আর জামিরে। ব্যাঙে আর কুমিরে। ঠাকুরে আর কুকুরে। সাগরে আর পুকুরে। দরিদ্র আর আমীরে। দেওয়ান আর মেথরে। রাজবৈদ্য আর হাতুড়ে। ধন্বন্তরী আর ভুতুড়ে। ময়ূরে আর বাদুড়ে। আমন আর ভাদুরে।

বিস্ময়কর এই পঙ্‌ক্তি। এখানে একই সঙ্গে ধরা পড়ছে ক্ষুদ্র আর বৃহৎ। জমিজাত ধান থেকে নেশাদ্রব্য, জাতিগত বৈপরীত্য থেকে বৃত্তিগত পার্থক্য সবই আছে। প্রশ্ন ওঠে কি উপলক্ষে এমন গান বেঁধেছিলেন কবি ?

তার জবাবে আমরা জানতে পারব কুবির শুধু গীতি-পদাবলী লেখেন নি, লিখেছেন আর একরকম বিচিত্র গান যাকে বলে 'দ্বন্দ' গান। এ হল উক্তি-

প্রত্যুক্তিমূলক একরকম প্রতিযোগী গান। দুপক্ষ আসরে দাঁড়িয়ে কবি বা তর্জাগানের মত জবাব দেয়। দুশো বছর আগে নদীয়া-মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রাম্য সমাজে 'বঁদ' ছিল খুব বড় বিনোদনের প্রকরণ। এখনও ক্ষীণভাবে 'বঁদ' গানের ধারা ঐ সব জেলার গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত আছে, তবে দক্ষ গীতিকার তেমন নেই। 'বঁদ' গানের সৃজনে লাগে ব্যাপক অভিজ্ঞতা এবং তাৎক্ষণিক রচনানৈপুণ্য। কুবিরের অতুলনীয় সৃজন সামর্থ্য ও জ্ঞানের পরিচয় এ সব গানের সামান্য উৎকলন থেকেই বোঝা যাবে। প্রথম পদাংশের বিষয় তিনের তত্ত্ব। কুবির অনর্গল বলে যান :

ত্রিপদের জন্য বলি পাতালে করে বাস ॥

কেশ বেশ দন্ত বিনে মানুষ বুড়োবুড়ি।
তিন বিনে নারী বিধবা নোয়া শাঁখা শাড়ি ॥
তিনজন্ম দুঃখ পেলেন জয়বিজয় দ্বারী।
তিন বর্ত করেছিলেন ত্রিভঙ্গ মুরারী ॥

এবারে জবাবে তাঁর রচনাতেই শুরু হয় আটের তত্ত্বের অনর্গলতা :

দেব অষ্টাবক্র কুব্‌জা নারী কংস রাজার দাসী।
অষ্টসখী বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ মহিষী ॥
অষ্টমীতে ভগবতীর পূজা হয় ভারী।
অষ্টাবক্র মুনির কীর্তি ভগীরথ উদ্ধারি ॥
অষ্টম গর্ভেতে জন্ম নিলেন নারায়ণ।
ছেলে হয় আটকলায় আছে নিদর্শন ॥
অষ্টাদশ পুরাণের কথা সকলেতে বলে।
আটে কাটে জোড়া লাগলে কলুর ঘানি চলে ॥
জামাই যায় আটমঙ্গলা ভেবে দেখ সত্যি।
অষ্টাহ জর গেলে পরে রোগীর দেয় পথ্যি ॥
অষ্টবসু জন্ম নিলেন দৈবকী উদরে।
অষ্টছিদ্র শ্যামের বাঁশি গোপীর কুল হরে ॥

'বঁদ' গান লেখার এই কল্পনা-কৌশল কুবির তাঁর গীতি রচনায় অন্যভাবেও কাজে লাগান। তার নমুনা হিসাবে দেখা যায় বঁদ গানের বাইরে একটি তাত্ত্বিক ছোট গান যার বিষয় একের তত্ত্ব :

একেতে দুই দুয়েতে এক একের এই করণ।
একের ইচ্ছে হতে হয় সকলি একে একের কথা শোন ॥
একা মেঘের সঞ্চারেতে বরিষণ হয় জগতে।
এক বিন্দু বারি হতে সৃষ্টির লক্ষণ।
একা বিম্বভরে ভেসেছিলেন একা ব্রহ্ম নিরঞ্জন।
একা চাঁদের কিরণেতে উজ্জ্বলা ত্রিভুবনেতে।

একের তত্ত্ব এবারে ম্লান হয়ে যায় দুই বা যুগলতত্ত্বের অভিনবত্বে :

চারিযুগে যুগল মূর্তি জাগে ভক্তের হৃদয়।

লক্ষ্মীনারায়ণ যুগল রামসীতে কি শোভা হয়
আর রাধাকৃষ্ণ যুগলতত্ত্বে থাকে নাক কোন ভয়।

গুরু শিষ্য ভাব উদাস্য যুগল মন্ত্র প্রকাশয়
আরো দীক্ষা শিক্ষা যুগল পাত্র যুগলে যুগল আশ্রয় ॥
হস্তযুগল পদযুগল নাসাযুগল নিঃশ্বাস কয়।
আর ভুরুযুগল নয়নযুগল চরণ পানে চেয়ে রয় ॥
দিবারাত্র জন্ম মৃত্যু যুগলে যুগল উদয়।
আর স্বর্গ মর্ত্য যুগল সত্য চরণ ভেবে কুবির কয় ॥

নির্মিতির অভিনবত্ব এইখানে যে কুবিরের চোখে যুগলতত্ত্ব ধর্ম থেকে শরীরতত্ত্ব, পুরাণ থেকে বস্তু পৃথিবী পরিক্রমা করছে। তাই রাধাকৃষ্ণ লক্ষ্মীনারায়ণের যুগলতত্ত্ব দিবা রাত্র জন্ম মৃত্যুকেও ছুঁয়ে আসে, গুরু শিষ্য ও তাদের দীক্ষা-শিক্ষার যুগল প্রসঙ্গ হাত পা নাক ভুরু চোখের বাস্তবতাকে টেনে আনে। একেই হয়ত বলা চলে সমদৃষ্টির উদারতা, সবকিছুকে ব্যাপকভাবে দেখবার ও চেতনায় তাকে সমীকৃত করাঁর বোধ। কুবিরেয় গানের ভুবনে আমরা যত প্রবেশ করি ততই বিস্ময়াকীর্ণ আবিষ্কারের আনন্দে স্পষ্টতর হয় বিরাট মানুষটি। প্রায়-মধ্যযুগ-ঘেঁষা কুবিরের অপরিবর্তিত পল্লীপরিবেশ তো তাঁকে উদার ধর্মসমন্বয়ের শিক্ষা দেয়নি, ব্রাহ্মধর্মের সংক্রাম তাঁর মধ্যে ঘটেনি, উচ্চশিক্ষার ত্বরান্বিত চেতনা তাঁকে সমুন্নত করেনি, তবে কেমন করে তিনি লাভ করেন এমন ব্যাপক বিচিত্র জীবনের মূলসূত্র যার টানে লেখেন :

ও মন তুই রে সেই উল্লুক চিরকাল।
যেমন ধানের চিটে সোনার ফিটে কলের মিটে বন মাকাল।

শালগ্রামের মধ্যে নোড়া ঘোড়া মধ্যে দুম্ব ভেড়া সিংহ মধ্যে যেমন শৃগাল
যেমন দেবতাদের মধ্যে শনি চন্দ্রেতে রাহু চণ্ডাল।
পুষ্প মধ্যে শুষ্ক শিমুল মধু শূন্য কেতকী ফুল পদ্মমধ্যে শালুকের মৃণাল
যেমন ভ্রমর মধ্যে গুবরে পোকা হংস মধ্যে বকের পাল।
শস্য মধ্যে খড়ের খেলা কাছারি ঠকের বোলবোলা বাজারেতে দোকানীর দালাল।

এসব পদ কোন বিচ্ছিন্ন রচনা নয়। কুবিরের পদাবলীতে এমন অভিজ্ঞতার নির্যাস ও জীবনের তাপ কেবলই পথ খুঁজে নেয়। তাই তাঁর চোখে না পড়ে পারে না এদেশে ইংরেজদের আসার উদ্দেশ্য, তাদের বেনিয়াবৃত্তির ক্ষুদ্রতা, তাই লেখেন :

যার নামে যা বোহাই আছে তাই বেচাকেনা করতেছে।
(সবাই) বিলাত হতে এই বাংলাতে সাধু সওদাগিরি করতে এসেছে।

আরেক পদে 'মন আমার যা মনে করে আঁখির পলকে সেই রূপ ধরতে পারে' এই কথার নানা উদাহরণ দিতে দিতে কুবির লেখেন :

মন কভু করে জমিদারী কভু করে পাটোয়ারী হালসানা চৌকিদারী—
কভু নীলের কুটির দেওয়ান হয়ে মাঠে মাঠে বেড়ায় ঘুরে।

এই দুই বিপরীত অভিজ্ঞতার ধরন একসঙ্গে গেঁথে তুলে কুবিরের রসদৃষ্টি শেষ হয় না, মনের যথেচ্ছ আচরণ বোঝাতে এবারে আমাদের চমকে দিয়ে লেখেন এক নতুন নমুনা :

আপনি নবাবী ভার পায় কখনও বাদশা হয় দিল্লী সহরে।

বাংলার শুভ হয় যখন বিলাতের কোম্পানী যেমন
হুকুম দেয় 'লুট আন যা আছে ঘরে ঘরে।'

এই পংক্তি কশাঘাতের দাগের মত পরাধীন জাতির মর্মবেদনার স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলে আর গানের বাণী দীর্ণ করে বেরিয়ে আসে কুবির গোঁসাই নামে এক আহত মানুষ, নীল আর ভূমিশোষণের অনেক নমুনা যার ভ্রাম্যমান গ্রাম-পরিক্রমায় দেখা ছিল সেকালের নদীয়ায়।

বিস্ময়কর বাস্তবদৃষ্টিসম্পন্ন-দেশকাল-সমাজ শোষণসম্পর্কে সচেতন এই গীতিকারকে কি কখনই আমরা 'সন্ন্যাসী উদাসীন' বলতে পারি যা তিনি নিজের

সম্পর্কে বলেন? তাঁকে উদাসীন বলতে যে পারি না তার আরেক নমুনা বোঝাতে আরেকটি গান হাতের কাছে উঠে আসে:

পেটের জন্যে যে যেমন তেমনি খেটে খায়।
কেউ বা নবাবী করে কেউ বা মুটে কলকাতায়
কেউ কোদাল পেড়ে চাষ করে কেউ ব'সে রত্ন খায়।
কেউ পেটের জ্বালায় চুরি করে ফাটক খাটে বেড়ি পরে
কেউ মুষ্টি ভিক্ষে ক'রে দিনান্তে এক সন্ধ্যে যায়—
কেউ কলা মুলো বেগুন বেচে পরিবার বাঁচায়।
ভিস্তি বা কেউ হস্তীব মাহুত উত্তরে গুণটানা বহুত
মহাজন করে কৌত লবণ বেচে নাও ডোবায়।
বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য সকল রাজ্যে হয়ে পূজ্য
করে সিদ্ধান্ত কার্য রূপার ঘড়া মান্য পায়—
আর রামাত নিমাত ভাট দৈবজ্ঞ শ্রাদ্ধ বাড়ি দান কুড়ায়।
কেউ বা জাহাজের খালাসি কেউ বা সদরের চাপরাসি
কেউ বা হয় ঘোড়ার ঘাসী ঘাস কেটে মজুরি পায়।
কেউ পল্টনেতে ভর্তি হয়ে লড়াই করে মরতে যায়।
কেউ বা করে জমিদারী কেউ বা করে বাবুগিরি
কেউ বা করে মোক্তারী হক মোকদ্দমা উড়ায়—
কেউ ঠক হয়ে ঠকামো করে বাপ পিতামহের নাম ডুবায়।

বহু বিচিত্র জীবনচিন্তার বহুদর্শী অভিজ্ঞতা-ভরা একের পর এক কুবিরের পদ উদ্ধৃত ক'রে যাওয়ার কারণ হল দুটি। মানুষটিকে বোঝানো আর এটাও বোঝানো যে কুবির শুধু সাহেবধনী সম্প্রদায়ের ধর্মতত্ত্বের ভাষ্যকার নন। তিনি দ্রষ্টা এবং ভাবুক। শহর জীবনের চোখ-খোলা পরিবেশ, উচ্চশিক্ষার বিদ্যাসূত্রে পাওয়া নানা জ্ঞান বা দেশবিদেশে বহুভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না, তবে কোথা থেকে এত সব কল্পনা ও বিরোধী উদাহরণ তাঁর মাথায় আসত?

এ প্রশ্নের জবাবে বরং বলা যাক একটা ঘটনার কাহিনী যা বলেছেন এ. এল. লয়েড তাঁর ইংলণ্ডের লোকসংগীত-সংক্রান্ত বইতে। অ্যান্টিলেসের কাছাকাছি একটা গাঁয়ে মেয়েদের সংখ্যা ছিল পুরুষদের চেয়ে বেশি। সেখানকার পুরুষরা সকালবেলা চলে যেত কাছে-পিঠের নগরে রুজিরোজগারের চেষ্টায়। তাদের কাছে কোন জরুরি খবর পাঠানোর দরকার হলেই বৌ বা মেয়েরা একটা গাছের

সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলত। তাই দেখে অবাক পর্যটক তাদের জিজ্ঞেস না করে পারল না: তোমরা ঐ গাছের সঙ্গে কথা বল কেন?

তারা বললে: আমরা তো গরীব, আমাদের তো টেলিফোন নেই তাই।

ঘটনার এই পর্যন্ত বৃত্তান্ত দিয়ে লয়েড করেন এক চমৎকার সিদ্ধান্ত। বলেন, 'The mother of folk-lore is poverty'.

কথাটা থেকে আমরা পেয়ে যাই একটা বড় ইঙ্গিত। দারিদ্র্যই জন্ম দেয় কল্পনার, অভাববোধ টেনে আনে উপকথা। কিন্তু এর একটা উলটো দিকও আছে। দারিদ্র্যকীর্ণ গ্রাম্য জনসমাজে শহর নিরপেক্ষ একটা জীবন-চেতনা গড়ে ওঠে, যার প্রতিফলন ঘটে গ্রাম্যগানে। এই জীবনচেতনার ভিত্তিতে থাকে গ্রাম্য-জীবনের নানা বৃত্তিজীবী মানুষের মধ্যে অভিজ্ঞতার লেনদেন। যে চাষ করে, যে মাছ ধরে, যে নৌকা বানায়, যে তাঁত বোনে, যে গুড় থেকে চিনি তৈরী করে, যে লোহা পিটিয়ে লাঙলের ফাল গড়ে তাদের সকলের সঙ্গে পরস্পর অভিজ্ঞতার লেনদেন চলে। কারণ তারা বৃত্তির ক্ষেত্রে একে অন্যের উপরে নির্ভরশীল। কামার ফাল গড়ে দিলে তবে চাষীর লাঙল সচল হয়। ছুতোর নৌকো গড়লে তবে মাঝি হাল বাইবে জেলে মাছ ধরবে মাঝ দরিয়ায়। তাঁতীর তাঁত সচল হলে তবে চাষী ও জেলের লজ্জা নিবারণ। চাষী ধান বুনলে তবেই সকলের খাওয়া। কুমোর হাঁড়ি বানালে তবে রস জাল হয়, তার থেকে গুড় আর শর্করা। আঠারো শতকের গ্রাম বাংলার পাশে তো বাসরাস্তা ছিল না, শহরও এগিয়ে আসেনি। তাই এসব জিনিস পয়সা দিলেই পাওয়া যেত না। তাছাড়া নগদ পয়সাই বা সব সময় থাকত কই? বেশিরভাগই তো বিনিময়ে চলত। চাষীর খন্দের বদলে কলু দিত তেল, তাঁতীর দেওয়া গামছার বদলে কামার গড়ে দিত মাকু, ব্যাপারটি ছিল এমন। এমনই পরস্পরসাপেক্ষ জীবন থেকে যে-অভিজ্ঞতার সারাৎসার তাই দিয়ে গ্রাম্য-গীতিকারের গান-বাঁধা। সেই জন্য সে গান সকলের গান, সকলের সুবোধ্য। তার রূপক উপমা তারা যেমন বোঝে তারিফ করে আমরা শহুরে শিক্ষিত পুথি পড়া মানুষ তেমন পারিনা। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক যাদুবিন্দুর গান থেকে:

> আমার কাদা মাখা সার হল।
> ধর্ম-মাছ ধরব ব'লে নামলাম জলে
> ভক্তি-জাল ছিঁড়ে গেল।
> কেবল হিংসে নিন্দে গুগলি ঘোঙা পেয়েছি কতকগুলো॥

কুসঙ্গে বিল গাবালাম
কুক্ষণে খাল নাবালাম
গমা-খালুই হারালাম উপায় কি করি বল।
আমি বিল ঘুনে পাই চাঁদা পুঁটি লোভ-চিলে লুটে নিল॥

এ-গানের রস শহরবাসী পাবে কি করে? গুগলি ঘোঙা কি তাঁরা চেনেন? বিল গাবানো ব্যাপারটা কি বোঝেন? খালুই বস্তুটি কি তাঁদের অনেকেরই অদেখা নয়? সেক্ষেত্রে এই গান শুনলে তাঁদের বড়জোর বিষয় বাদ দিয়ে সুরটুক. ভাল লাগতে পারে, নাও লাগতে পারে। কেননা গ্রাম্য গানে সুরের বৈচিত্র্য কম। তার জোরের দিকটা থাকে কনটেন্টে। গ্রাম্য শ্রোতার পক্ষে সেটাই আকর্ষণ। আর গ্রাম্য গীতিকার তো তাদের জন্যই গান লেখেন। তিনি যেহেতু স্রষ্টা তাই তাঁর সৃজনমানসে সব মানুষের জীবনযাত্রার বিচিত্র ও বিপরীত ছকগুলি একটা সামঞ্জস্য পায়। তার থেকে তিনি একটা দর্শন গড়ে নেন। গ্রামের মানুষ তাদের গীতিকারের গানে নিজেদের সমাজ আর তার পরিভাষা, অভিজ্ঞতা আর ঘটনা খুঁজে পেয়ে দ্বিগুণ আনন্দ পান। এ রকম একটি গান, যা শুধু তারাই বোঝে, এখন দেখা যাক কুবিরের রচনা থেকে:

অতি সাবধানে ঘুরাই প্রেমের লাটা।

ভসকে যখন যাবে সুতো
লবো তুলে কলে বলে ভয় কি তায় এত
কতশত ঘুচাই জড়পটা।
নাটিয়ে করব পাতা দেখব না তা বাধবে না কোন নেটা॥
যখন সুতো করব নাতি
লাগাবো তায় পাতায় পাতায় খই ভিজে মাতি।
দু-এক ঘড়ি ছাড়াব জটা
শেষে কাড়িয়ে ভানা গাঁথা সানা
সানপেতে শাড়ির ঘটা॥
হয় যদি তায় কানা ঘরে গুটিয়ে লব
শেষে দিব আলগা খেই পুরে
একনজরে দেখাব সেটা।

শেষে বোয়া গেঁথে নাচলিতে
জুড়ে ফেলব তানাটা ॥*

আমাদের সংস্কৃত শহুরে পুঁথি-পড়া জ্ঞান এই গানের কাছে মাথা নত করে কারণ গানের ভেতরকার বহু শব্দ আমরা জানিনা, অথচ গ্রামের লোক জানে। ফলে তারা এ গান উপভোগ করে। আমরা বড় জোর গানটি সংগ্রহ ক'রে যান্ত্রিক ফিতেয় ধ'রে রেখে গর্ববোধ করি। কাজে লাগে না। এখানে তর্ক উঠতে পারে কুবির জাতে যুগী বলেই এমন তাঁত-বোনার গান লেখেন, তাঁর দৃষ্টি বৃত্তিগতভাবে সংকীর্ণ। তা যে নয় তার প্রমাণ দাখিল করবার জন্য আমরা এখানে দেখাতে পারি তাঁর আরেক গানের দৃষ্টান্ত যা তাঁর বৃত্তিকে ছুঁয়েও ছড়িয়ে পড়েছে বড় ক্ষেত্রে :

ভারি সুতোর বাজার আককারা—
হয়েছে যুগী তাঁতি পুলিশ সৈন্য শিখেছে কেয়াজ করা।
এখন কাপড় বোনায় লভ্য নাইক
উল্‌টো দেনায় হয় সারা ॥
কাপাস তুলো নেইক দেশে
কেশের ফুলকোয় মাঠ ভরা

তাতে হয়না সুতো অনাহত ভাবছে যত চাষীরা ॥
এখন দায়ে পড়ে পৈতে ছিঁড়ে দণ্ডী হবে দ্বিজরা
এখন নাকু বেচে কাকু চুষে বেড়ায় সব জোলারা
কলার পেটোর কপ্নি পড়বে যত বাউল নেড়ারা ॥

এখানে রয়েছে এক সর্বাত্মক দৃষ্টির সরসতা। সুতোর বাজার আক্রা হওয়ায় গ্রাম্য সমাজের সর্বস্তরে কেমনতর বিপর্যয় ঘটতে পারে এখানে তার একটি

* এখানে গানটির দুরূহ শব্দ নিয়ে একটু অর্থসংকেত দেওয়া গেল অদীক্ষিত পাঠকদের জন্য। নটা মানে লাটাই। ভসকে যাওয়া মানে আলগা হয়ে যাওয়া অর্থাৎ লাটাইয়ে ঠিকমত সুতো না-জড়ানো, যারফলে কাপড়ে চক পড়ে। চড়পটা মানে জট পাকিয়ে যাওয়া। মাতি মানে সুতোয় মাড় লাগানো। কাড়িয়ে তানা মানে তানা তৈরি করা। তানা অর্থাৎ টানা, যার উলটো কথা পোড়েন। সানা বলতে বোঝায় টানা সুতো যার ভেতর দিয়ে চালানো হয় তাকে। শেই মানে সুতোর প্রান্ত। বোয়া বলতে বোঝায় টানা সুতোর সঙ্গে যুক্ত মোটা সুতো যা তাঁতের পা-কাঠির সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং যার সাহায্যে টানা ফাঁক হয়।

আশংকিত বাস্তব-চিত্র আছে। তাতে দুঃখ আছে কিন্তু গ্লানি নেই। কেননা এমন বাস্তব দুঃখ বিপর্যয় গ্রাম্যসমাজে প্রায়ই আসে। তবে গীতিকার কোন উদাসীন ব্যক্তি নন ব'লে তাঁর পর্যবেক্ষণে এ-সব জিনিস শাশ্বতরূপ পেয়ে যায়। যেমন ১২৭২ বঙ্গাব্দে নদীয়ার যে বিধ্বংসী খরা আকাল হয় কুবির তাকে গেঁথে রাখেন নির্বিকার গানে :

ভুট করেছে গত সনের ঝড়ে—
আবার এই বাহাত্তর সালে ঘোর আকালে
লক্ষ্মী গেছে ছেড়ে।
বলে অন্ন বিনে ছন্নছাড়া ধান্য গেছে পুড়ে॥
নাইক মুগ মুসুরি মসিনে ছোলা
তেওড়া মটর কাপাস তুলা
জমির মধ্যে শুধুই ঢেলা রয়েছে পড়ে।
অতি অল্পবিস্তর শস্য ছিল তাও মেলে না
হয়ে সবার গেল।
হিতে বিপরীত হ'ল মাঘ ফাগুনের জাড়ে॥

গত সনের ঝড়, এই সনের খরা আর তীব্র ঠাণ্ডার কথা একই সঙ্গে বলা হ'ল। এর পরে আসে ক্ষোভ। এমন অজন্মা আর আকালের দিনেও ইংরেজ সরকার রাজস্ব দেন বাড়িয়ে। কুবির তার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ বেদনায় লেখেন :

মুল্লুক হল লক্ষ্মীছাড়া আট আনা চাউলের ধাড়া
এমনই লোকের কপাল পোড়া মেলে না তাও ঢুঁড়ে।
হ'ল বিচারকর্তার উলটো দাঁড়া
সদা মরার উপর ঢুকায় খাঁড়া
ট্যাক্স করেছে বাড়া জমির অঙ্ক তেড়ে।

গ্রামের অর্থনীতি ও বুভুক্ষার এই বাস্তবচিত্র এখনকার বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে সমাজ-সচেতনতা বলে বাহবা পায়। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, সমাজ-তাত্ত্বিকদের তারিফ কুড়োবার জন্য গ্রাম্যকবি এই গান লেখেননি। তাঁকে গানটি লিখতে হয় জীবনেরই তাগিদে। চিরকালই গ্রামের মানুষ তার চার-পাশের পরিচিত জীবনের ও ঘটনার গান শুনতে চায়। ভাদু টুসু গম্ভীরা বোলান আলকাপে বরাবর সমকালীন বাস্তব প্রতিবেদন থাকে। অন্য ধরনের গানে (এমনকি বাউলজাতীয় গানেও) যে-সমাজ সমালোচনা বা সদ্যঘটিত ব্যাপারের

নিখুঁৎ ছবি ধরা থাকে তা অনেকে বোঝেন না। লালন ফকিরের একটা বিখ্যাত গানে এই প্রশ্ন আছে যে 'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে'! এই গানে লালনের জীবিতকালের সবচেয়ে বিতর্কিত প্রশ্নের দোলাচলটুকু ধরা আছে। আজকে একদল গবেষক বলছেন তিনি আদৌ মুসলমান এবং পরে বাউল, আরেকদলের বক্তব্য তিনি আদৌ হিন্দু এবং পরে ধর্মান্তরিত মুসলমান ও বাউল। এ প্রশ্নের মীমাংসা তো লালনের গানের ঐ পংক্তিতেই রয়েছে। একজন মুসলমান যদি ফকির বা বাউল হয় তবে কি তাকে নিয়ে জাতের প্রশ্ন ওঠে কোনদিন? বোঝাই যায়, লালন ছিলেন জন্মসূত্রে হিন্দু অথচ আচরণ ও জীবনযাপনে মুসলমানদের ঘনিষ্ঠ এবং শেষপর্যন্ত এ দুইয়ের কোনটিই নয়; কারণ বাউল মতবাদের সঙ্গে খাঁটি ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। বাংলাদেশের ইসলামতাত্ত্বিক এ. এইচ. এম. ইমামউদ্দিন তাঁর 'বাউল মতবাদ ও ইসলাম' (১৯৬৯) বইতে স্পষ্টই বলে দিয়েছেন: 'বাউল মতবাদ কুরআন ও হাদিস-বিরোধী মতবাদ। ইসলামী শরিয়তের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই বিধায় বাউলদিগকে মুসলমান বলার পক্ষপাতী আমরা নহি।' লালনের সমকালে বহু মুসলমানই বাউল মতবাদে চলে গেছে তা নিয়ে উত্তেজনা হয়েছে হয়ত কিন্তু কোন সংশয় দেখা দেয়নি। কিন্তু হিন্দু হয়েও তাঁর মুসলমানী জীবনযাপন ও তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্যই সংশয় ও প্রশ্ন উঠেছিল তাঁর জাত নিয়ে। গানে সেই সমকালীন বিতর্কটি বোনা আছে কৌশলে।

লোকধর্মের অংশীদার যারা তারা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের থেকে দলছুট বলে তাদের কিছু হারাবার থাকে না। সেইজন্য শুধু প্রতিবাদী চেতনা নয়, সেই সঙ্গে তাদের গানে থাকে স্পষ্ট উচ্চারিত নির্দিষ্ট প্রতিবাদ। কথাটা বোঝাতে এখানে দুদ্দু শাহ'র পদাংশ থেকে একে একে কয়েকটি পংক্তি তুলে দেখাচ্ছি। প্রথমেই ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যঙ্গ:

> বলিহারি এক জাত এই ব্রাহ্মণ ভবে
> ব্রহ্মত্বের খোঁজ নাহি দেখি, ক্রিং ত্রিং দিয়ে ঠকায় সবে।
> সার করেছে টিকি আর পৈতে
> জাতের বড়াই করে খেতে আর শুতে
> মুখের সেরা শুকনো ট্যারা সাধু কে আখ্যা দেবে।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে বক্রোক্তি:

> মুসলমানে ভাবে আল্লাহ্ আমাদের দলে

এমন বোকা দেখেছ কে কোন্ কালে ॥
আল্লাহ্ কারো নয় মেসো খুড়ো
এ কথাটির পেলি নে মুড়ো
চুল পেকে হলি রে বুড়ো খবর না নিলে।

একই অস্ত্র ছোঁড়া হয় খৃষ্টানদের দিকে :

মিছে কেন এত হীনবুদ্ধি খ্রীষ্টানের
শুধু যীশুখৃষ্ট মুক্তিদাতা কয় তারা ফের ॥

বৈষ্ণবদের বিরুদ্ধে বিরোধীযুক্তি আরো শানদার :

কি ধর্ম প্রচারে গোরা যারে প্রেমের ধর্ম কয়
তবে কেন হরিদাসে 'হরিনাম' নিতে হয় ॥
সর্বধর্মে আছে মুক্তি
বৈষ্ণবেরা বলে যুক্তি
তবে কেন এ রীতি হরিদাসের বেলায় ॥

এইসব খুব স্পষ্ট স্বচ্ছ প্রশ্ন ও বিরোধিতার জবাব কিছু আছে কি? যুগে যুগে এই কারণেই বাউল ফকির ও লোকধর্মের কবি-বাণী অচ্ছুত রয়ে গেল আর উচ্চবর্ণের লেখনীতে কবীর নানক দাদূ সুরদাসের সমন্বয়বাদকে খুব বড করে দেখান হ'ল।

সেই অপরাধ কিছুটা ক্ষালন করার জন্য অন্তত এখন আমাদের উচিত অবহেলিত উপেক্ষিত বাংলার গ্রাম্য গানের সাহসী প্রতিবাদ বা স্বচ্ছ জীবনের প্রতিবেদনগুলি তুলে ধরে দেখানো যে এঁরা কোন ধর্মসম্প্রদায় গড়ে না তুললেও তৈরী করেছেন একটা স্বতন্ত্র মতবাদ। দারিদ্র্য থেকেই লোকধর্মের জন্ম এবং দারিদ্র্য থেকেই জন্ম লৌকিক গানের এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই যাদুবিন্দু একটা গানে বেদনার অশ্রুবাষ্প গোপন রেখে কেমন চমৎকার বলেন :

যে ভাবেতে রাখেন গোঁসাই সেই ভাবে থাকি
আমি অধিক আর বলবো কি।
কখনও দুগ্ধ চিনি ক্ষীর ছানা মাখন ননী—
কখনও জোটে না কেন আমানি।
কখনও আ-লবণে কচুর শাক ভখি ॥

সুখ আর দুঃখ, সুখাদ্য আর অখাদ্য সবই এক জীবনদৃষ্টি দিয়ে দেখার এই যে সরসতা গ্রাম্য কবির, সেই বোধ তাঁর সমাজ পরিবেশ থেকেই পাওয়া। এ সব

গানের উচ্চারণে অসহায়তা থাকে, ক্ষোভ থাকে কিন্তু প্রতিবাদ থাকে না। সব দিক থেকে শোষিত এবং এমনকি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মেরও অবলম্বনহীন কুবির বা যাদুবিন্দু প্রতিবাদের শস্ত্র কোথায় পাবেন? তাই বড়জোর লিখতে পারেন:

মুষ্টি ভিক্ষে করে আমি খেতে পাইনে উদর পুরে;
লয়ে ঝুলি কাঁধে মনের খেদে বেড়াই লোকের দ্বারে দ্বারে॥
বাড়ি বাড়ি হাঁটব কত ভুত খাটুনী খাটব কত
রৌদ্রে পুড়ে মরব কত মনের দুঃখ কই কারে॥

কিন্তু আমাকে যা সবচেয়ে বিস্মিত করে, তা হল এত হতদারিদ্র্য এত গ্লানি সত্ত্বেও কুবিরের সর্বাত্মক দৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণের অনুপুঙ্খ। একটা গানে কেমন অনায়াসে লিখতে পারেন:

চাষা নইলে মানীর মান থাকে না কোনকালে।
চাষার হলে রে তাই খেয়ে সবাই কোঁচা দুলিয়ে চলে॥
চাষা নইলে ভদ্র কেউ বলে না।
চাষায় না দিলে পর মহাজনকে মহাজন কে বলে?
চাষার হ'লে উত্তম অধম সকলে বাঁচে
টপ্পা ঝাড়ে আর নাচে।

উনিশ শতকের গ্রাম্য গীতিকার কৃষিভিত্তিক সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনের মূল কথাটাই তো এখানে বলে দিয়েছেন। খুব উল্লেখযোগ্য নয় কি এই চেতনার গভীরতা? সঙ্গে সঙ্গে এমনও দেখা যায় যে দৃষ্টির এই সামগ্রিকতা থেকে কুবির পৌঁছে যান ধর্মের synthesis-এর দিকে। লেখেন:

যে যেমন সেই নাম সাধনা করে।
হিন্দু আর মুসলমানে যারে মানে ভক্তি অনুসারে॥

উত্তম অধম হিন্দু যারা রাধাকৃষ্ণ ভজে তারা
রেখে গুরু ছত্রধারা মন্ত্র জপে অন্তরে।
বলে হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে রাম হরে হরে॥

মধ্যবিত্ত যবনেরা পান্তভাতে আপনি মরা
পেটের জন্যে খেটে সারা হয় পরিবারের তরে।
বলে সেবার সময় আল্লা রসুল পেট ভরে ঘুম মারে॥

দেখি পঞ্চ পরিবারে বৈষ্ণবীরে শঙ্খ পরে
গৃহীর মত ব্যবহার ফেরে অনেকে ব্যবসায় ফেরে।
কভু ভিক্ষার ছলে হরি ব'লে বেড়ায় দ্বারে দ্বারে ॥

ফরাজিরা রেখে দাড়ি ওজু করে ঘড়ি ঘড়ি
নামাজ পড়ার হুড়োহুড়ি যার যেমন ভাব অন্তরে।
পড়ে আল্লা হামদা মামুদ ভেয়ে মাথা কুটে মরে ॥

অদ্বৈত অবধৌত নিতাই দরবেশেরা বলেন তাই
গৌর প্রেমে মেলে না থাই পড়ে মাঝপাথারে।
তারা রস মেরে রস খাঁটি করে রসতত্ত্বে ফেরে ॥

কেউ ভাবে পীর মানিক মাদার মল্লিকগ্রাম ভক্ত খোদার
কাটাপীর বাঘাতে সোয়ার নাম জারী অনেকদূরে ॥
তাদের নাম ক'রে যায় ভিক্ষা ক'রে ফকির বাবাজিরে ॥*

দ্বিজ দীক্ষে দুর্গানামে বলে তারা উমে ধুমে কুলায় কালীয়ে
দুর্গমে পড়েছি ভবঘোরে।
বলে চামুণ্ডে চণ্ডিকামাতা খিচুড়ি খাবি রে।

ব্রহ্ম অধিকারী লোকে ব্রহ্মমন্ত্র উপাসকে
ব্রহ্মময় সকলি দেখে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরে।
দেখে কুলকুণ্ডলিনী হৃদিপদ্মের মাঝারে ॥

দীনের ভাবনা ভাবি একা করি সদা দীনের লেখা

* নদীয়ার তিন বিখ্যাত পীরের থান এখানে উল্লিখিত। মানিক পীর মাদার, মল্লিকগ্রামের পীর এবং ব্যাঘ্রবাহন কাটাপীর।

কবে পাবো দীনের দেখা অন্ধকার যাবে দূরে।
প্রভু দীননাথের চরণ ভেবে কুবির কয় কাতরে ॥

কুবিরের গানের এই সুদীর্ঘ উৎকলন দিয়ে আমার বলবার কথাটি এই যে, সাহেবধনী মতবাদ তাঁকে শীর্ণ সাম্প্রদায়িক ক'রে তোলেনি বরং করেছে সমন্বয়বাদী। কয়েকপৃষ্ঠা আগে উদ্ধৃত দুদ্দু শাহ্‌র বাউল গানে অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ী সম্পর্কে যে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ আছে তা কুবিরের গানে নেই। কারণ বাউল ধর্ম প্রতিবাদী সাহেবধনী মতবাদ সমন্বয়বাদী। দুই মতবাদই বেদ-ব্রাহ্মণ-শাস্ত্রবিরোধী কিন্তু তার উগ্রতার তারতম্য আছে। এই তারতম্যের কারণ, বাউলদের যতখানি প্রতিরোধ ও আঘাত সহ্য করতে হয়েছে সাহেবধনীদের তা হয়নি। আঘাতে ও অপমানে বাউলরা হয়ে গেছে উগ্ররকম অসহিষ্ণু আর সাহেবধনীদের নিরুত্তাপ ধর্মসাধনা ব্রাত্যজনের নিরুদ্ধ বাতায়নে। তারা গড়ে তুলতে পারেনি কোন শ্রেণী। কিন্তু যুগে যুগে বাউলরা এক প্রতিবাদী শ্রেণী। তাদের অঙ্গচিহ্ন ও জীবনযাপনেই আছে বিদ্রোহ। অথচ সাহেবধনীরা প্রচ্ছন্নতাকামী। বাউলদের উদ্‌ভব নৈষ্ঠিক হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মতবাদের বিরুদ্ধাচরণ ক'রে। পরে তাদের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতার ফলে আশংকিত অন্যান্য বড় ধর্ম বিশেষত ইসলাম-পন্থীরা তাদের প্রচণ্ড প্রত্যাঘাত করে। এর ফলে একদল বাউল আত্মগোপন করে আরেকদল বাউল ফুঁসে ওঠে। দুদ্দু শাহ সেইরকম একজন শ্রেণীসমর্থিত বিদ্রোহী বাউল। ভিক্ষাবাদী দরিদ্র কুবির একজন নিঃসঙ্গ সাহেবধনী। অবশ্য শেষ উপলব্ধিতে কুবির ও দুদ্দু একই মতের পথযাত্রী, দুজনেই মানবতাবাদী, মানুষে বিশ্বাসী। দুজনেই বলেছেন, মানুষের করণ কর। তবে দুজনের ভাষা আলাদা। দুদ্দু এইভাবে বলেন :

মানুষের জনম কারে কয়
মানুষের চরণ ভজে জানতে হয় ॥
সেবা কর্ম নিদ্রা রমণ
পশুপক্ষী করে রে মন
কি জন্যে মনুষ্যজনম শ্রেষ্ঠ ভবে কয় ॥
মানুষের করণ কারণ
মানুষচাঁদের ভজন পূজন
জাতা-জাতের নাহি পালন, মানুষ কহি তায় ॥

আহার-নিদ্রা-মৈথুন-সম্পন্ন পশুজীবনের চেয়ে মানবজীবন যে বৃহত্তর কোন

কিছু তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু দুদ্দু জাতা-জাতের বিরোধিতা করলেও তাঁর পদে অন্য ধর্মমত সম্পর্কে উগ্র অসহিষ্ণুতা থেকে গেছে। কুবির বরং অনেক প্রসন্নচিত্তে বলেন :

মানুষ বই আর কিছু নাই।
এই মানুষ ভাবো যদি প্রাপ্তিনিধি
আছে রে মানুষের ঠাঁই ॥
এই মানুষে করো রে বিশ্বাস মানুষে মানুষের ভাবপ্রকাশ
যেমন চকমকির ভিতর হ'তে রূপ ঝলকে দেখতে পাই।

কুবির মানুষ সম্পর্কে এই যে গভীর প্রসন্নতার দর্শন গড়ে তুলেছেন তার মূলে যেমন সাহেবধনী ঘরের শিক্ষা তেমনই তার নানা বৃত্তিজীবী মানুষ-সম্পৃক্ত সমঝোতাও কাজ করেছে। আজকের গ্রামজীবনের শ্রেণীবিচ্ছিন্নতা, রাজনৈতিক শিবিরবিরোধ ও অসম উপার্জনজাত বিচ্ছেদকাতর সমাজে আঠারো উনিশ শতকের নানা বৃত্তিজীবী মানুষসংশ্লিষ্ট প্রসন্ন ভ্রাতৃত্বের চিহ্নও নেই।

কিন্তু কুবিরের জন্ম ও বিকাশ যে-গ্রামসমাজের মধ্যে তার মধ্যে ছিল সংহত প্রাকৃত এক সমাজ বিন্যাস। সমাজবিজ্ঞানী ডার্কহাইম এই সমাজকে বলেন 'জৈবিক সমাজ' টনিজ বলেন 'কমিউনিটি'। লোকসংস্কৃতির সকল শাখা সহজে জারিত হ'তে পারে এই জাতীয় সমাজের আনুকূল্যে। গোষ্ঠীর সকলের মধ্যে স্বাভাবিক মানবসম্পর্ক, বৃত্তিগত দেওয়া-নেওয়া, আত্মিক সংযোগ, অর্থনৈতিক নির্ভরতা ও আন্তরিক ব্যবহার থেকে উঠে আসে গানের বিষয়। তার প্রত্যক্ষ লক্ষ্য হয়ত থাকে গীতিকারের বিশিষ্ট ধর্মগত মতবাদটিকে বোঝানো, কিন্তু পরোক্ষে থেকে যায় গ্রামীণ জনমাটির চিহ্ন, গানের থিমে, উপমায়, রূপক নির্বাচনে। তাই সে গান sectarian হয়েও সকলের পক্ষে আনন্দদায়ক। কৃষিভিত্তিক গ্রামের সকল মানুষের পক্ষে সুবোধ্য এমন একটি কুবিরগীতি এইরূপ :

আবাদ কর চোদ্দ পোয়া জমি লয়ে
থাকো রে মন খাটো কিষাণ হয়ে।
মন রে জোড়ো ধর্ম-হাল প্রবর্তক-ফাল
সাধক-মুড়ায় সিদ্ধ-ঈষ লাগাইয়ে ॥
জোড়ন দিয়ে রিপুর স্কন্ধে
লাঙল জোড়ো সানন্দে বেয়ে যাও প্রেমানন্দে

অনুরাগ-পাঁচনি লয়ে ॥
মন রে করো ভক্তি-চাষ
উঠাও বিঘ্ন-ঘাস
জমি সমান করো ধৈর্য-মইয়ে ॥
নেত্র বারি করো সিঞ্চন
রূপরসানে দেহমার্জন
প্রকাশিবে বীজ কাঞ্চন
অঙ্কুর হবে প্রেমোদয়ে ॥

এ গান তো একান্তই কায়াসাধনের তাত্ত্বিকতায় ভরা। তবু যে গানটি গ্রামবাসী উপভোগ করে তার কারণ এর রূপকবিন্যাসে আছে কৃষিজীবনের নিতান্ত পরিচিত অনুষঙ্গ। আর শহুরে মানুষ এর মধ্যেকার হাল-ফাল-মুড়া-ঈষ মই কিছুই দেখেনি বলে তার উপভোগ হবে অর্ধেক। হঠাৎ মনে হবে রূপকতার মধ্যে দিয়ে এই যে গান রচনার প্রকরণ এ বোধহয় একান্ত বাংলা গ্রাম্য গানেরই স্বভাব। আসলে বস্তু ও ভাবজগৎকে মিলিয়ে দেখার প্রবণতা চির-কালের বাংলা গানের স্বভাবলক্ষণ। 'হৃদি বৃন্দাবনে বাস করো যদি কমলাপতি' গানটি কি গ্রাম্য গান না গ্রাম্যমানুষের জন্য লেখা? উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবপ্রকাশ করতে গিয়ে বাঙালি গীতিকার সব যুগেই প্রাকৃতজীবনের রূপক টেনে আনেন। চর্যাগান, বৈষ্ণব ও শাক্তপদাবলী উনিশ শতকের টপ্পা গান, দাশরথি রায়ের গান, ফিকিরচাঁদের গান সর্বত্র প্রচুর রূপকের ব্যবহার আছে। এ ব্যাপারে বাঙালির বিশেষ প্রবণতা সম্পর্কে সংগীততাত্ত্বিক অমিয়নাথ সান্যাল তাঁর 'শতবর্ষের বাংলা গানের দিকদর্শনী' প্রবন্ধে বলেন :

বহির্জগৎ ও অন্তরাত্মার মিলনসুখের গভীর সত্য বা তত্ত্বকথা চিরকাল থেকেই ভারতে জ্ঞানগর্ভ ও কাব্যের ভাষায় প্রচারিত হয়ে এসেছে। এই হল ভারতের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এ সকল কথা, এ জাতীয় অনুভব, গানের মধ্যে দিয়ে, সুরের সাহায্যে ছন্দ ও তালের বাহনে—বাংলাদেশে যেমন অপূর্ব প্রকাশরূপ পেয়েছে, এমন ও অন্য কোন দেশে দেখা যায় না। ভারতে যত দেশ আছে তার মধ্যে বাংলাদেশ যেমন রূপকপ্রিয় ও যেমন রূপকশিল্পী এমন কোন দেশ নয়। উত্তর ভারতের কালোয়াতী গান, কাজরী, সাবন, ঝুলন, হোরী, চৈতী প্রভৃতি সাধারণ দেশজ রূপগুলি এবং দক্ষিণ ভারতের মহাত্মা ত্যাগরাজ প্রচারিত জনপ্রিয় গীতরূপগুলির সঙ্গে আলোচনা করে

আমার এই ধারণা হয়েছে এই সকল গীতরূপের মধ্যে কল্পনা, ভাবুকতা বলতে বিশেষ এমন কিছু নেই—যাকে বাঙালির কল্পনা, উচ্ছ্বাস বা ভাবুকতার সঙ্গে তুলনা করা যায়। হিন্দী ভাষার গান—হরিদাস স্বামী, তুলসীদাস, সুরদাস, মীরাবাঈ, কবীর, কুম্ভনদাস, যুগরাজদাস, কৃষ্ণানন্দজী, চতুর্ভুজদাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ গীতকারদের গানের মধ্যে যে রূপক একেবারেই নেই, এমন কথা কখনও বলি না। মাত্র এই কথা বলি, হরিদাস স্বামীজি প্রভৃতির রচনায় যেখানে একটি রূপক পাওয়া যায়, সেখানে বাঙালি গীতকারদের পদে পঞ্চাশটি পাওয়া যাবে। নামকরা বাঙালি পদকর্তাদের ছেড়ে দিয়ে দুটি অনামিকা রচনা ও গানের উদাহরণ দেব।

পূজিব পীরিতি প্রেম-প্রতিমা করি নির্মাণ।
অলংকার দিব তাহে আমার যত আছে অভিমান॥
যৌবন সাজায়ে ডালি কলঙ্কে পুরি অঞ্জলি।
বিচ্ছেদ তাহে দিব বলি দক্ষিণা করিব এ প্রাণ॥

অন্য একটি,

মন, তোর দেহতরী এবার বুঝি চলে নাক আর।
জলধি দেখিয়ে অকূল পাথার
তাহে দুরাশা-তরঙ্গ মায়া-মেঘে হল অন্ধকার॥

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে মনে হবে—গানের এরূপ অভিব্যক্তির মূল কথা খুবই সহজ। দেশে প্রতিমা পূজা আছে, অলংকার, নৈবেদ্য, বলি আছে, তাই ও রকমের গান হয়েছে এবং নদীমাতৃক সুন্দর শস্যশ্যামল দেশের অলস প্রকৃতি ও ভাবুক মনই দ্বিতীয় গানের জন্য দায়ী। কিন্তু ব্যাখ্যা কি এতই সহজ? মন্দির, প্রতিমা, অলংকার, নৈবেদ্য বা বলি কি ভারতে আর কোথাও নেই? বাংলাদেশ ছাড়া কি অন্য কোন নদীপ্রধান দেশ নেই? নাকি শস্যশ্যামল অন্য দেশে অলস ব্যক্তির একান্ত অভাব? আমার মনে হয় এই ব্যাপারের মধ্যে বাঙালির মনের বিশিষ্টতারই পরিচয় আছে। বাঙালির মন নিতান্ত বাস্তবকে অতিক্রম ক'রে ভাবুকতার মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে লালায়িত।

বিশিষ্ট সংগীতবিদের এই বিশ্লেষণ থেকে আমরা বুঝতে পারি, বাঙালির নিজস্ব ভাবুকতা বাস্তবকে গ্রহণ করে অথচ বাস্তবকে অতিক্রম করে গানের মধ্যে নিজস্ব পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে। এই সূত্র থেকে আমরা এখন স্পষ্ট ধারণা করতে

পারি, কেন গ্রাম্যগীতিকায় এত স্বচ্ছন্দে চাষ-করার রূপক, মাছ-ধরার রূপক নৌকা-বানানোর রূপক গানে ভরে দিতে পারেন। অন্য প্রদেশের সঙ্গে বাংলা গানের এই ভাব ও রূপগত পার্থক্য থেকে আমাদের একটা বড় লাভ এই হয়েছে যে, আমরা এই রূপক-প্রবণতার সুযোগে বাস্তব সমাজের নানা নিখুঁৎ ছবি পেয়ে যাই। সেই সূত্রে আমরা জানতে পারি প্রাক্তন গ্রাম জীবনের নানা খুঁটিনাটি রীতিপদ্ধতি, এখন যার আর চলন নেই। যেমন, আগে অনেক গ্রামে লৌকিক একরকম পদ্ধতিতে গুড় থেকে চিনি তৈরি হত, এখন হয় না। কিন্তু গানে ধরা আছে সেই নির্মাণ পদ্ধতির বিবরণ রূপকের কায়দায় :

রসের ভিয়েন করো দেখিরে মন।

সারমেতে দাওরে পেচে
ঝিরিত্রি সব পড়বে নীচে
পাটেতে রস যাবে চেঁচে
হবে চিনির জন্ম পাকের কর্ম
ভাবীজনার সম্মিলন ॥
জেলে দাওরে তিউড়ি চুলা
তার ভিতরে রসাও খোলা
সাফ করো গাদ মাটি মলা
হবে চিনির পাকে মিছরি দানা
চর্বণ সুরস ভোজন ॥

গ্রামের খুব প্রাচীন লোকের কাছে খোঁজ করলে জানা যায় ঠিক এই ভাবেই আগে চিনি ও মিছরি হ'ত। আখের গুড়ের রস ঘন করে মোটা কাপড়ে মুড়ে কাঠের পিঁড়ি চাপা দিয়ে সেই পিঁড়িতে একজন মানুষ বসত। তার চাপে শেওলায় ছাঁকনি দিয়ে রস পড়ে যেত নিচে, থাকত শুকনো গুড়। তাকে ফটকিরি দিয়ে শোধন ক'রে হ'ত চিনি, সেই চিনি থেকে মিছরি।

এই রকম একটা অনুষঙ্গ পাই কুবিরের গানে, যাতে নৌকার 'গাবকালি' করার কথা বলা হয়েছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, এখন যেমন নৌকায় আলকাতরা লাগানো হয় আগে তা হত না, কারণ তখন আলকাতরা এদেশে আসেনি। তার বদলে গাবের আঠা দিয়ে নৌকার ফাঁকফোকর বোজানো হত এবং নৌকায় কালি করা হত। সে রেওয়াজ এখন উঠে গেছে কিন্তু গানে ধরা

আছে তার পদ্ধতিগত ইতিহাস। কুবিরের এমনই এক গানে পাই নৌকা তৈরির ক্রমিক কৌশল :

আগে তলা গড়ে শেষে তক্তা জোড়ে
আড়ে আরফাঁড়ে তাই না জানি।
আরো গুড়ায় বসায় বাঁক তাতে মেরেছে পেরাক
গলুই জলুই আঁটা দুই কিনারায় মুক্তা মানিক ॥

গীতিকার হিসাবে কুবির গোঁসাইয়ের একক কৃতিত্ব এইখানে যে, নানা বৃত্তি ও বস্তু সম্পর্কে তিনি অনর্গল লিখে যান। বিস্ময়কর তাঁর অভিজ্ঞতা আর পর্যবেক্ষণ। লালন, দুদ্দু, পাঞ্জু শা, গোঁসাই গোপাল, পোদো বা হাউড়ে গোঁসাই প্রভৃতি তাঁর অগ্রজ, সমকালীন বা অনুজ কোন গ্রাম্য গীতিকারের গানে এমন বৈচিত্র্য নেই। প্রায় সব কটি গ্রামীণ বৃত্তি নিয়ে তাঁর গান আছে অথচ সবকটি গানেই আছে আধ্যাত্মিক উপধর্মীয় তাৎপর্য-সংকেত।

আগে কুবিরের লেখা তাঁত-বোনা, চাষ-করা ও নৌকা-বানানোর রূপক বিবরণ দেখিয়েছি এবারে দেখানো যায় পর্যায়ক্রমে, প্রথমে আখ মাড়িয়ে রস-নির্যাস ও তার পরে গুড় তৈরীর বিবরণ :

মন পিড়াওরে মানব-ইক্ষু শিক্ষা-কলের চবকি পেতে।
গুরু নামামৃত সুধারস নির্গত হবে তাতে ॥
দয়াধর্মের পোয়াগাড়া প্রবর্তক সাধকের ডাঁরা
গুরু সিদ্ধরসের গোড়া জ্বাল দেয় বিষামৃতে—
রসে নয়ন ধরবে শুচি হয়ে শুদ্ধশুচি রসের পাত্র হবে পঞ্চভূতে ॥

এবারে দেখানো যায় লোহার বিবরণ :

মন হয়েছে লোহারাম হয় না ভাল গঠন তায়।
কামারে হার মেনে গেছে আমার হ'ল এ কি দায় ॥
মন যেন ইংলিশ পাটি সকলি তার মলামাটি
পোড়ালে হয়না খাঁটি চটে ফটে বেরিয়ে যায়—
কেবল পেটাপেটি দুড়ুম শব্দ ছোটে সকল গাঁয় ॥

এবারে ঘরামির রূপক :

হায় ঘরামী ঘর করেছে ছাঁচে ঢেলে।
গোড়োট নাই দেখতে পাই হাওয়ার জোরে আপনি চলে।
নাইক ছাটন পাটন ঢালা গঠন গঠেছে শনি শুককুলে।

এবারে জমি মাপের রূপক :

কোম্পানীর রসিদে জরিপ করেছে আমিন।
জমির নাল খিল খিচে যেখানে যা আছে
রসি ফেলে কষে লয়েছে।
সিকস্তি পয়স্তি রাজ জঙ্গল নদীছাড়া জরিপ সারা আছে মস্তাকিন
খোদের দস্তখতি চিটে লিখি গেছেন এঁটে
দাগে দাগে করি চিন ॥

এই পর্যায়ক্রমিক উদ্ধৃতির মধ্যে তারিফ করবার মত বিষয়টি হ'ল কুবিরের অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যসঞ্চারী দিগন্ত এবং প্রত্যেক বিষয়েই পারিভাষিক শব্দের উপর দখল। এবারে তাঁর অভিজ্ঞতার যে-দিকটি দেখা যাবে তা অম্লমধুর সরসতায় ভরা। গ্রাম্যজীবনে নানারকম আধিব্যাধিতে ছোটখাট টোটকার খবর এই ছোট্ট গানে কুবির ভরে দেন অপূর্ব কৌশলে :

বাতিকেতে কাঁজি সাঁতলা টাটকা ঘোল।
অরুচি হলে খেতে কি মজা আমচুরের ঝোল ॥
তিলের তৈল আর দুবেলা চলে চিনি-ভিজে কুল অম্বল
আর পরশুতি-ভাত সাঁজো-দধি খেলে ভাল হয় পাগল
ধনুষ্টঙ্কার হলে পরে চিনির সরবৎ ডাব নারকোল
আর ওলা ভিজে মিছরির পানা ডুমুরের জল কি শীতল।
মদন বৃদ্ধি হ'লে পরে শক্তিসাধন নারীর কোল।

শেষ পংক্তির কৌশলী আদিরসটুকু কুবিরের মনের ভারসাম্য চমৎকারভাবে ফোটায়।

এই সব গানের মধ্যে দিয়ে গীতিকার কুবির গোসাইয়ের যে-বিগ্রহ প্রবল ভাবে জেগে ওঠে তা মানবিক। বিশেষ এক লোকধর্মীয় মতবাদ তাঁর মনকে গড়ে তুললেও তাঁর একটি অত্যাশ্চর্য জীবন ও যুগসচেতন মনও ছিল। সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর গানে একটা দিক পান, আমরা পাই আরেক দিক। এই বিচারে কুবিরকে কি আমরা লোকগীতিকারের সর্বোচ্চ আসনটি দেব না? অন্তত তিনি যে লালশশীর চেয়ে অনেক বড় কবি এবং লালন ফকিরের চেয়ে অনেক বড় দ্রষ্টা ছিলেন তাতে বিতর্ক নেই। তাঁর বিরানব্বই বছরের সুদীর্ঘ জীবনী বৃত্তিহুদার সংকীর্ণ গ্রামজীবনেই প্রধানত কেটেছে। সম্মান (সবাই খাতির করে বলত বড় গোঁসাই), খ্যাতি, সাধনসিদ্ধি ও গানরচনা সব দিক থেকেই সফল

ছিলেন কুবির। সমকালীন যুগ ও সমাজ তাঁর লেখায় পরোক্ষ ভিত্তি হিসাবে একটা বড় স্থান ক'রে নিয়েছে এজন্যও তিনি গরীয়ান। তাঁর ভ্রাম্যমান জীবনে নদীয়ার যে-অঞ্চলে ছিল যাতায়াত সেই সব স্থান ছিল নীলচাষে শোষিত এবং নীলকরদের অত্যাচারে কাতর। কুবির প্রতিবাদ করতে পারেননি কিন্তু নিপুণ প্রতিবেদকের মত লিখে গেছেন :

এবার নীল এসে নীলকণ্ঠ বেশে
ব্রহ্মাণ্ড বশ ক'রে নিলে।
নীলের জ্বালায় যাব কোথায়
নীলে সব ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে দিলে ॥
নীল অনুষঙ্গী যারা শমনের দূত যেমনপারা
পায় যারে তার করে সারা ডুবায়ে মারে হাত বেঁধে গলে।
প্রথমে নীল বিছন বেশে প্রবেশিল সর্বদেশে
এই করলে সর্বনেশে সকলকে মজালে—
আড়াই সের ওজনে নীল কি বিঘায় ছিটিয়ে জল নিলে ॥
নীলমণির দাদনের কালে দেওয়ানজী তার অর্ধেক নিলে
আমিন জরীপের ছলে কিছু কিছু নিলে।
বিঘেতে তিন বিঘা নীলে চারিদিকে
বগচরের সীমানা নিলে ॥
বেদামীতে লাঙ্গল নিলে
নীলে সব কাঙাল গরীব জ্বালিয়ে দিলে।
এবারে এই নীলমণির কাছে
মান গেছে অপমান আছে
এ কথা নয়কো মিছে জানাবো কি বলে ?

ব্যঙ্গ পরিহাসে যে-গীতিকার নীলকে আদর করে বলেন নীলমণি আর নীলকণ্ঠ, শেষ পর্যন্ত তার গ্লানি ও সন্তাপ তাঁকে নীলকণ্ঠের মতই ধারণ করতে হয়। হৃতমান মানুষের প্রতিনিধি গ্রাম্য গীতিকার তার অপমানের বেদনা কাকে জানাবে? মনে হয় সেকালের শীর্ণ লোকধর্মসম্প্রদায়ের মত দীর্ণ জনগোষ্ঠী একই রকম অসহায় ও নিরুচ্চার ছিল। কবির বড়জোর সঙ্কল্প করেন :

যাব রে দরখাস্ত দিতে দ্বারে খোদ কোম্পানীর কাছে
জানাবো হুজুরে আমার মনের যত দুঃখ আছে ॥

কিন্তু প্রাজ্ঞ গীতিকার এ কথাও জানেন যে তাঁর ন্যায্য আবেদন গ্রাহ্য হবে না। তিনি পাবেন না সুবিচার। কেননা যেমন সমাজে তেমন ধর্মে তেমনই শাসনকর্তার বিচারশালায় :

উত্তম অধম সমান হয়েছে বিচারশূন্য কলিকালে ॥

'সেবার্থে পরমতত্ত্বে সেবাদাসী চাই'

নাগর কালাচাঁদ হে
তোমায় লুকিয়ে থোবো হৃদয়-মন্দিরে।
জায়গা নাই তোমায় রাখি কোথায়
তোমার মাথায় থুলে উকুনে খায়
মাটিতে রাখলে পরে কাকে ধ'রে ঠুকরে মারে ॥
চিল বেড়াচ্ছে পালে পালে
তোমায় ছোঁ মেরে নিয়ে বসবে ডালে
খাবে দুই চক্ষু খুলে মনের দুঃখ বলব কাকে—
তোমার সকল মধু নিঙরে লবে
বিগড়ে দেবে একেবারে ॥

নাগর কালাচাঁদকে নিয়ে এমন সমস্যার কথা বাংলার প্রবহমাণ বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে কখনও শোনা যায়নি। কালাচাঁদের প্রেমিকা রাধা শেষপর্যন্ত তার নাগরকে হৃদয়-মন্দিরে লুকিয়ে রাখাই শ্রেয়তর বিবেচনা করে। কিন্তু একটু চোখ মেললে আমরা ধরতে পারি এই গ্রাম্য গানের রাধার চারপাশে যেসব উকুন কাক আর চিলের ঝাঁক সেগুলি আসলে তার প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বিনীদের বিশেষণ। শিষ্ট কাব্যে রাধা কখনও চন্দ্রাবলীদের এমন লৌকিক বিশেষণে ভূষিত করেনি। এখানে করেছে, কারণ কালাচাঁদের প্রতি তার আসক্তির আন্তরিকতা এত তীব্র যে প্রণয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অন্যান্যদের সে ঐ চোখেই দেখে। এবারে শোনা যাক গানের বাকি অংশ :

চালের বাতায় রাখি যদি
হয় চামচিকে টিকটিকি বাদী
চেটে খায় রত্ননিধি চোখের কাজল চুরি করে ॥
তোমায় বাঁশবাগানে রাখলে পরে
মশায় খেয়ে অঙ্গ জারে।
মনের জ্বালায় যাব কোথা

সব প্রতিবেশীর নাই মমতা দিয়ে অন্তরে ব্যথা
কথায় কথায় জ্বালিয়ে মারে ॥

এই রূপক গানের অন্য একটা দিকও কিন্তু ভেবে দেখবার মত। গানের শেষ অংশটা পড়লে সেই দিকটি উদ্ভাসিত হয়। অর্থাৎ লৌকিক রাধা তার প্রেমিককে প্রতিবেশীদের চোখের আড়াল করবার জন্য যেখানেই রাখতে চাইছে সেখানেই বাধা আর বিপত্তি, অতএব হৃদয় মন্দিরে লুকিয়ে রাখাই সবচেয়ে বিবেচনার কাজ। কিন্তু 'ঈশ্বর পরমকৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহে'র এহেন অবনমন এবং এমনকি তাঁর অঙ্গ যে কাক চিল উকুন টিকটিকির সেব্য এমন উপলব্ধি খুব আশ্চর্য এক জগতে আমাদের নিয়ে যায়, যে-জগৎ বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-সেবিত বৈষ্ণব পদাবলীর উদ্বেলিত অধ্যাত্ম জগৎ নয়। এই নতুন জগতে তাই পা রাখতে হবে খুব সতর্ক অনুধাবনে।

আমাদের মনে থাকে যে, বৈষ্ণবদের রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব তৈরির আগে থেকেই লৌকিক জীবনে কৃষ্ণ-রাধার মিথ খুব প্রচলিত ছিল। জীবনস্পর্শে উষ্ণ সেই কৃষ্ণ-ধামালীর খানিকটা ছাপ রয়ে গেছে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে। চৈতন্যজন্মের পর বৈষ্ণব পণ্ডিত ও তাত্ত্বিকরা ব্যাপকভাবে সেই লৌকিক উষ্ণতাকে ঊর্ধ্বায়িত করতে থাকেন নিষ্কাম শীতলতা আর আধ্যাত্মিকতার পরিকল্পিত ছাঁচে। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর এক দিকনির্দেশী মন্তব্যে জানিয়ে দেন :

> লৌকিক ব্যবহারে, গানে ও ছড়ায়, উদ্দাম প্রেমের বিষয়রূপে রাধা-কৃষ্ণ নাম দুটি সাধারণ নায়ক নায়িকার প্রতীকরূপে গৃহীত হয়েছিল। 'রাধা' নামটির সাধারণ অর্থ ছিল প্রেয়সী। আর কৃষ্ণ নাম নিলে অননুমোদিত প্রেমের অবৈধতা কেটে যায়।

এই মন্তব্যের ইঙ্গিতটুকু মনে রেখে এবারে লক্ষ করবার মত দুদ্দু শাহ্‌র একটি পদাংশ যাতে স্পষ্ট বলা হয়েছে :

যে-রাধাকৃষ্ণের কথা পদে গায়
সে তো বৃন্দাবনের কৃষ্ণ রাধা নয় ॥
যুগে যুগে প্রণয়ের মানুষে
রাধাকৃষ্ণ বলিয়া ভাষে
কবি পদকর্তা বঙ্গদেশে, বলে সবায় ॥
পরকীয়া আত্মরতি করে

রাধাকৃষ্ণ রূপ সৃষ্টি করে

স্বয়ং রাধা কৃষ্ণ জানতো না রে, যা বলিয়া যায় ॥

এবারে বোঝা গেল, রাধাকৃষ্ণ 'অনুমান' নয়, 'বর্তমান'। তাঁদের অধিষ্ঠান ভৌগোলিক বৃন্দাবন নয় বরং দেহ-বৃন্দাবন। সহজিয়ারা এই এক আশ্চর্য উপলব্ধি আর বিশ্বাস নিয়ে স'রে আসে 'বৈধী' থেকে 'রাগানুগা' সাধনে। মনের মানুষ খোঁজার গভীর নির্জন পথেই তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় বাউল ও অন্যান্য কায়াবাদীদের। বাউল মেনে নেয় রাধাকৃষ্ণকে এমনকি গৌরাঙ্গকেও কিন্তু অন্য অর্থে, অনেক অন্তর্গূঢ় তাৎপর্যে।

আর এইখানটায় হিসেবের গণ্ডগোল ঘটে যায় এমনকি ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের মত পণ্ডিতেরও। 'লালন গীতি' বইয়ের ভূমিকায় তিনি লালনের গানগুলিকে দুইভাগে বিন্যস্ত ক'রে এক ধরনের গানকে বলেছেন 'বাউল গান' আরেকধরনকে 'বৈষ্ণবভাবাপন্ন গান'। এই দ্বিধা বিন্যাসের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে তাঁর যুক্তি হ'ল :

> বাউল সাধনার বৈশিষ্ট্য যে গানগুলির ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে সেইগুলিকেই 'বাউল গান' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহা ব্যতীত লালন ফকিরের গানের মধ্যে অনেকগুলি বৈষ্ণবভাবাপন্ন পদ দেখা যায়, এগুলি রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক অথবা গৌরাঙ্গলীলাবিষয়ক। আমরা দেখিতে পাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে অবলম্বন করিয়া ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙলা দেশে বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্যের যে অভিনব প্রসার ঘটিয়াছিল তাহারই ফলে পরবর্তীকালে রাধাকৃষ্ণের লীলা অথবা শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙলার জনগণের নিকটে একটা সামাজিক উত্তরাধিকাররূপে দেখা দিয়াছিল ; ফলে অসংখ্য হিন্দু কবির সঙ্গে বহু সংখ্যক মুসলমান কবিও এই কৃষ্ণলীলা বা গৌরাঙ্গলীলার গান করিয়াছেন। লালন ফকিরের রচিত এইজাতীয় গানগুলির মধ্যে আমরা সেই সত্যেরই সমর্থন লাভ করি।

আমরা কিন্তু লালনের গানে বৈষ্ণবতার অন্য এক পরিপ্রেক্ষিত দেখি। সেকথায় যাবার আগে লালনের একটি ছোট পদ দেখে নেওয়া যায়। লালনের মতে :

শুনে অজানা এক মানুষের কথা

প্রভু গৌরচাঁদ মুড়ালেন মাথা ।।

গৌরচাঁদের সন্ন্যাসগ্রহণের একটি নতুন যুক্তি এখানে ফুটে উঠল, যা আমরা

আগে শুনিনি। বাউল মতবাদসম্পৃক্ত যে 'অজানা মানুষ' 'অচিনমানুষ'-য়ের কথা আমরা জানি গৌরাঙ্গ কি তবে তারই সন্ধানে গৃহত্যাগ করেন? লালনের কথাটা অন্তত তাই।

এবারে বুঝতে বাকি থাকে না যে, গৌরাঙ্গের পরিত্রাতা রূপ এদেশের সব রকমের লৌকিক ধর্মকেই জারিত করেছিল নতুন ভাবনা ও দর্শনে। নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবদের মতে অবশ্য গৌরাঙ্গের আর্বিভাবতত্ত্ব হ'ল অসম্পূর্ণ ব্রজলীলার সমাপন। অথচ লালন বা কুবির গৌরাঙ্গকে দেখেন সম্পূর্ণ অন্য চোখে। তাঁদের বিশ্বাস:

১ সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি হয়
গোরা তার মাঝে এক দিব্যযুগ দেখায়। (লালন)

২ এনেছে এক নবীন আইন নদীয়াতে
বেদ-পুরাণ সব দিচ্ছে দুষে
সেই আইনের বিচার মতে! (লালন)

৩ দয়াল গৌর হে তোমা বই কেহ নাই।
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি যীশু তুমি কৃষ্ণ
আমার মরণকালে চরণ দিও
আর কিছু না চাই॥ (কুবির)

লালনের প্রত্যয় এই যে, সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি এই চারযুগের মাঝখানে গৌরাঙ্গ এক দিব্যযুগের প্রবর্তক। সেই দিব্যযুগের মূল সত্য যে সহজতত্ত্ব আর জাতিবর্ণহীন মানুষের উত্থান এ কথা বোঝা কঠিন নয়। সেই কারণেই গৌরাঙ্গ বাউলদেরও বরণীয়। নইলে সাধারণভাবে বাউল মতবাদের সঙ্গে বৈষ্ণবদের কোন বিশ্বাস ও আচরণগত মিল নেই। কেননা:

জীবনই তীর্থ ধর্ম পথ
এই কথা বাউলের মত।

আর বৈষ্ণবরা অন্যরকম। বাউলরা মনে করে:

বিশেষ সম্প্রদায় বৈষ্ণব
পঞ্চতত্ত্বে করে জপতপ
তুলসীমালা অনুষ্ঠানে সদাই।

এই পঞ্চতত্ত্ব, জপতপ বা তুলসীর মালা বাউলদের পক্ষে ঘৃণ্য। কিন্তু

বৈষ্ণবতার প্রবর্তক গৌরাঙ্গ তাদের শ্রদ্ধেয়, কেননা তিনিই প্রথম বেদ-পুরাণকে অগ্রাহ্য করেছিলেন আর সেই বিদ্রোহের কাটা-পথেই তো দ্রোহধর্মী লৌকিক মতগুলির এগিয়ে-আসা। কুবির গোঁসাই তাঁর সমন্বয়বাদী সাহেবধনী তত্ত্ব-দৃষ্টিতে গৌরাঙ্গকে আরও উদার চেতনায় যীশুখৃষ্টের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলেন। লালন ও কুবিরের এই স্বাধীন চিন্তাভাবনার কারণ এই যে, তাঁরা দুজনেই গৌরাঙ্গকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তাত্ত্বিকদের কাছ থেকে শোধিতরূপে পাননি, যেমন পেয়েছিলেন গোবিন্দদাস-জ্ঞানদাসরা। লালন-কুবিরকে পথ দেখিয়েছিল তাঁদের জীবনধর্মী সহজিয়া মত।

বাউল যে কখনই বৈষ্ণবভাবাপন্ন পদ লিখতে পারে না এই কথাটা তেমন ক'রে বোঝেননি শশিভূষণ দাশগুপ্ত। গৌরাঙ্গকে বাউলরা মনে করেন অর্জন ব'লে কিন্তু বৈষ্ণবমত তাদের পক্ষে বর্জনীয়। এ অনেকটা যেন খৃষ্টকে ভালবেসে খৃষ্টানদের ঘৃণা করার মত ব্যাপার। তাই দেখা যায় শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচায তাঁর সংকলিত 'বাংলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি' বইতে যে বিপুল পদ সংগ্রহ করেছেন তার সঙ্গে শশিভূষণ বাবুর মতের মিল আছে। মুসলমান কবিদের মধ্যে বৈষ্ণব মতাদর্শ ও চৈতন্যপ্রভাব এসে গেছে স্বতই, যুগধর্মরূপে। আর লালন বা কুবিরের কাছে গৌরাঙ্গ কোনো যুগধর্মের হাওয়ায়-ভেসে-আসা সংক্রাম নয়। তাঁরা তাঁদের ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে সংলগ্ন তত্ত্বরূপে সনাক্ত ক'রে তবে গৌরাঙ্গকে গ্রহণ করেছিলেন। গৌরাঙ্গকে তাঁরা মানতেন বেদবিরোধী, পতিতপাবন এবং রাগানুগা সাধক এই ত্রিধাবিভক্ত রূপে। 'তিনেই এক একেই তিন' তাঁদের বিশ্বাসের সার কথা এই।

সম্ভবত সেইজন্য গৌরাঙ্গ-সাধনাকে আর একটু এগিয়ে লালন আর কুবির দুজনেই সংলগ্ন করেছেন তাঁদের সুফি-সংসর্গজাত 'জ্যান্তে-মরা' তত্ত্বের সঙ্গে। লালন লিখেছেন :

> ও গৌরের প্রেম রাখিতে সামান্যে কি পারবি তোরা ?
> কুলশীল ত্যাগ করিয়ে হ'তে হবে জ্যান্তে-মরা ॥

আর কুবির লিখেছেন :

> গৌরসন্ধান পেয়েছে যারা জেয়ান্তে হয়েছে মরা।

কুবির অবশ্য এরপর গৌরাঙ্গকে প্রসারিত ক'রে নিয়েছেন সহজিয়া দেহবাদী রাগমার্গে এবং লিখেছেন :

সখীঅনুগা রাগঅনুগা হয়েছে যারা।
গৌরের সন্ধান পেয়েছে তারা॥

সন্ধানের এই নিগূঢ়তা তো আমাদেরও অন্বিষ্ট।

সেই অনুসন্ধানে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয় এই সত্য যে, সাহেবধনীদের মতবাদে কর্তাভজাদের গুরুসত্য মত, সুফিদের শিক্ষা, ইসলামি বিশ্বাস ও বাউলদের দ্রোহ যেমন স্থান পেয়েছে তেমনই গৃহীত হয়েছে সহজিয়া বৈষ্ণবদের 'রাগানুগা' সাধনা। শ্রীচৈতন্যের দেহত্যাগের পর বৈষ্ণবধর্মে প্রেমসাধনার সঠিক পথ সম্পর্কে দ্বিধা আসে। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা রায় দেন 'বৈধী'-মার্গের দিকে আর সহজিয়ারা নেন রায় রামানন্দের 'রাগানুগা'-মার্গ। স্বকীয়া পরকীয়া প্রেম-তত্ত্ব এই মতদ্বৈধের ভিত্তিতে গ'ড়ে ওঠে। সাহেবধনীরাও পরকীয়া রাগানুগা পথের পথিক। কুবিরের সাধনসঙ্গিনী ছিলেন, তাঁর নাম কৃষ্ণমোহিনী। যাদুর সাধনসঙ্গিনী ছিলেন বিন্দু। এই পরকীয়া রাগানুগা পথ কাম থেকে প্রেমের পথে উত্তরণের সাধনা। তাঁদের ভাষায় কাম হ'ল প্রেমের লতা। কুবির বলেন :

শুদ্ধ নির্বিকারী হয়ে
কামের ঘরে প্রবেশিয়ে
কামে কাম নিবারিয়ে
কর কামের কারণ॥

সহজিয়া রাগানুগা পথ তাই এড়িয়ে নয়, কামকে পেরিয়ে যাবার পথ। এ সাধনা সুকঠিন। কেননা :

> The worshipper is to think of himself as Krishna and is to realise within himself the passion of Krishna for Radha, who is represented by female companion of his worship. Through sexual passion Salvation is to be found. The Radha-Krishna stories are held as the justification of their practice, which are secret and held at night.

এই কাম থেকে প্রেমে যাবার যে-ক্রমিক উত্তরণ তারই সাহেবধনী ভাষা হ'ল মানুষের করণ। এই করণসিদ্ধির পথ গুরুনির্দেশিত। সেইজন্য সাহেবধনীদের গুরুমন্ত্রে বলা হয়েছে :

শুক্র সত্য। কাম সত্য। করণ সত্য।

করণসিদ্ধির পথ তিনটি পর্যায়ের : প্রবর্ত, সাধক ও সিদ্ধ। এই তিন পর্যায়ে গ্রহণীয় যথাক্রমে নাম, মন্ত্র ও রূপ। রূপ বলতে বোঝায় দেহ। কুবির এই প্রবর্ত ও সাধক স্তর পেরিয়ে সিদ্ধ অবস্থায় পৌঁছেছিলেন। তাই উদ্বেলিত আনন্দে শেষ গানে লিখেছিলেন :

সাধনেতে সিদ্ধ হয়েছি
ভক্তিভাবেতে কেঁদে প্রেমের ফাঁদে
অধরচাঁদকে ধরেছি ॥
ঘুচাইয়ে মলামাটি হয়েছি পরিপাটি
করিনে খুঁটিনাটি খাঁটি পথে দাঁড়িয়েছি।
ছিলাম অচৈতন্য পেয়েছি চৈতন্য
প্রেম পরিপূর্ণ হয়ে ধন্য বুঝেছি ॥

এই প্রেম পরিপূর্ণ হয়ে সবকিছু বুঝতে পারা মানে অভেদতত্ত্ব। অভেদতত্ত্ব থেকে বোঝা যায় সব সমান : নরনারী, জাতিবর্ণ, কামপ্রেম, অমৃত গরল, শোণিত শুক্র।

এডওয়ার্ড সি. ডিমক তাঁর 'The place of the hidden moon' বইতে সহজিয়া অভেদতত্ত্ব বড় প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়েছেন। তাঁর ভাষায় :

> The crucial point in considering the social attitude of the Sahajiyas is the doctrine of 'equality' or 'sameness'. To the boy Chaitanya, sweets and dirt were the same. So to a Sahajiya, a Brahman and an untouchable are the same. So are men and women. So are 'pure' and 'impure' things to eat and drink.······The state of unity is emulated in the union of male and female, of Brahmin and Dom, of high and low······in recognition of the fact that there is neither pure non impure, that mud and sweets are the same—as indeed are the blessings and curses of mankind.

এখন বুঝতে অসুবিধে নেই কোনখানে সাহেবধনী মতবাদ ও কুবিরের

গানের উদার নীতির উৎস। এমন অভেদচেতনা থেকেই কুবির গৌরাঙ্গকে মিশিয়ে নেন এমনকি যীশুরও সঙ্গে।

সাহেবধনী মতবাদে যে পরকীয়া রসরতির ভূমিকা ছিল তার প্রমাণ কুবির আর যাদুবিন্দুর গানে ধরা আছে। এই মতে নারীকে বলা হয়েছে শক্তি। কুবির বলেছেন: 'শক্তি-তরী ত্বরা তরি কামসাগরে দাও পাড়ি'। আরও বলেছেন:

হও রে মন দরবেশ গোঁসাই
সেবার্থে পরমতত্ত্বে সেবাদাসী চাই।
থাক মুখে মুখে বুকে বুকে
প্রেম সেবা ঘুরি ঘুরি ॥

এইখানে পৌঁছে আমাদের বুঝে নিতে হবে সহজিয়া আর সাহেবধনীদের নারী সম্পর্কে ধারণার বৈশিষ্ট্য। তার আগে বৈরাগ্যবিরোধী বাউলদের নারী সম্পর্কিত মতটিও দেখে নেওয়া যায়। তারা বলে:

সাক্ষাৎ ভগবতী যারে বলে
কেউ তো তার শ্রীচরণ না চিনিলে।
আত্মগুরু আত্মমাতা সে
এ পারেতে আনিয়াছে যে ॥
পীরের পীর তস্ত পীর সে হয়
যারে ধরে জগৎ সৃষ্টি পায় ॥

বাউলরা সৃষ্টির ধারাবাহিকতা মানে এবং বিশ্বাস করে সেই ধারাবাহিকতার মূলে নারীশক্তি। এমনকি দুদ্দু শাহ্-র বিচিত্র কল্পনা এতদূর ভাবতে পারে যে,

সেই সৃষ্টির আদিকালে
জগৎপতি কৃষ্ণ ডাকে রাধায় 'মা' 'মা' বলে ॥
রাইসাগরে ভাসলেন শ্যাম রায়
শ্রীরাধিকা দিলেন তারে ঠাঁই
তাইতে শ্রীকৃষ্ণ জীবন পায়, ভূমণ্ডলে ॥

সহজিয়া ও সাহেবধনীমতে দীক্ষা আর শিক্ষা এই দুরকম গুরু। শিক্ষাগুরুর ভূমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ তার কাছেই থাকে দেহযোগের নিশানা। সাধনসঙ্গিনীরা অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষাগুরুর স্থান নেন। ডিমক এই কথাটি বোঝাতে লেখেন:

The Diksaguru, the guru who gives the initiatory mantra, is Krishna, and the Siksaguru, the guru who conducts the worshipper in his search for realization, is Radha. All women participate in the qualities of Radha, therefore all women are in some sense gurus.

এই কথাগুলিই ক্রমান্বয়ে গানে গানে গেঁথে দেখানো যায় :

১ সাধন করো রে মন ধরে মেয়ের চরণ।
আগে মেয়ে রাজি হবে
ভজনের রাহা পাবে ॥

২ জেনে শুনে ভজো নারী
হয়ে যাবে নির্বিকারী ॥

৩ এ বড় কঠিন ধর্ম ভজিতে নারী।

কামোত্তীর্ণ হয়ে, নির্বিকারী করণধারী সাধক হওয়া সোজা নয়। কেননা নারী দেহের যৌনতার ফাঁদে অনেকের পতন হয়। তাই সাবধান থাকতে হয়। প্রেমের সাগরে মাঝে মাঝেই আসে কামরূপ কুমীর। তাই যাদুবিন্দুর সাবধান বাণী:

মন যাসনে আমার বাঁকা নদীর বাঁকে
সাঁতার দিতে প্রাণ হারাবি ঘূর্ণ পাকে ॥
নাইতে গেলে বাঁকার ঘাটে
বিভ্রেবুদ্ধি রয়না ঘটে
কাম নামে এক কুমির জুটে
চিবিয়ে চুষে খায় তাকে ॥

অথচ যদি গুরুর কাছে করণসিদ্ধ হয় তবে ভয় থাকে না। তখন :

মহারসের রসিক হলে বাঁকা নদীর বন্যে এলে
আনন্দে সাঁতার খেলে চলে যায় উজানস্রোতে।
ও সে গভীর জলে ডুব মেরে বসে থাকে দম ধরে।
তারে সেই কাম-কুমিরে রে মন, নারে ছুঁতে ॥

সাহেবধনী মতবাদে সহজিয়া বৈষ্ণবদের কায়াসাধনা এমনকি নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবদের কিছু কিছু আচার আচরণ কেমন ক'রে প্রবেশ করল তার অনুসন্ধানে

একটা ভৌগোলিক সূত্র কাজে লাগে। সাহেবধনীদের আবির্ভাবস্থল দোগাছিয়া শালিগ্রাম ষোড়শ শতক থেকেই এক বৈষ্ণবসম্পৃক্ত গ্রাম। এই গ্রামের উল্লেখ শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আছে। শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পরে নিত্যানন্দ স্বয়ং আচণ্ডালে যে সব গ্রামে বৈষ্ণব প্রেমধর্মের প্রচার করেন তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি গ্রাম দোগাছিয়া ও বড়গাছি। গ্রাম দুটি পাশাপাশি অবস্থিত (মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। শালিগ্রাম-দোগাছিয়ায় থাকতেন সূর্যকান্ত সরখেল, বড়গাছিতে থাকতেন 'অন্নদামঙ্গল'খ্যাত হরি হোড়ের সন্তান পরমবৈষ্ণব কৃষ্ণদাস হোড়। এঁদের উচ্চমার্গের ভক্তিবাদ ও নিষ্ঠাবান জীবনযাপন ঐ অঞ্চলে স্বভাবতই একটি শান্ত ও নম্র পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছিল। পরবর্তীকালে সূর্যকান্ত সরখেলের দুই মেয়ে বসুধা ও জাহ্নবার সঙ্গে নিত্যানন্দের বিবাহ হয়। সেই উপলক্ষে নিত্যানন্দ আসেন বড়গাছিতে কৃষ্ণদাস হোড়ের বাড়ি। সেইখান থেকে তিনি বরযাত্রীসহ বিবাহ করতে যান দোগাছিয়ায়। আরও পরে নিত্যানন্দ জাহ্নবার সন্তানরূপে জন্ম নেন লোকধর্মের প্রখ্যাত প্রবর্তক বীরচন্দ্র বা বীরভদ্র। নিত্যানন্দের ঘোষণা ছিল :

> নিত্যানন্দ স্বরূপ সে যদি নাম ধরো।
> আচণ্ডাল আদি যদি বৈষ্ণব না করো॥
> জাতিভেদ না করিমু চণ্ডাল যবনে।
> প্রেমভক্তি দিয়া সভে নাচামু কীর্ত্তনে॥

প্রকৃতপক্ষে এই উচ্চারণ সত্যিকারের মর্যাদা পায় বীরভদ্রের সাধনায়।

এইসব তথ্য সাজালে একটি মূলকথা উঠে আসে। নিত্যানন্দ ও বীরভদ্রের মুখ্য সাধনা ছিল জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে বৈষ্ণবমতের প্রচার। সেই বৈষ্ণবমত অনেকটাই গুহ্য ও লোকায়ত। সাহেবধনীদের উৎপত্তিস্থল দোগাছিয়ায় বরাবর একটি সমন্বয়বাদী ভক্তিধর্মের বাতাবরণ ছিল, বিশেষ ক'রে নিত্যানন্দের প্রচারভূমি ব'লে। কাজেই আঠারো শতকে দোগাছিয়ার দুলীচাঁদ পাল ও তাঁর সন্তান চরণ পাল যে একটি সমন্বয়বাদী ও বেদব্রাহ্মণবিরোধী লোকধর্ম গড়ে তুলেছিলেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। সেইজন্য নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব আচারের চেয়ে সাহেবধনীরা সহজিয়া বৈষ্ণবদের রাগানুগা পথের অধিকতর সন্নিহিত এবং সেটিই স্বাভাবিক। কেননা শাস্ত্রবাদী উচ্চবর্ণ পরিচালিত বৈধী বৈষ্ণবতার বিরুদ্ধেই বীরভদ্র তথা সকল লোকধর্মের উত্থান। বোঝা যায়, সাহেবধনী

কোন বিচ্ছিন্ন মতাদর্শ নয়; এর মধ্যে রয়েছে বৈষ্ণবধর্ম তথা চৈতন্যবাদের এক রোমাঞ্চকর পরম্পরা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের লোকায়নের দ্যোতনা।

সহজিয়াদের পারম্পর্য সাহেবধনীদের ঘরে মেলে তবে পুরোপুরিভাবে নয়। কেননা ঐ-মতে আরও অনেক মতবাদ মিশে গেছে। তবু মূল কতকগুলি সহজিয়া ভাবনা সাহেবধনী উপধর্মে পাওয়া যায়। যেমন ধরা যাক প্রেমধর্ম। সকলেই শুনেছেন, হিন্দুদের ধর্মসাধনার মূল লক্ষ্য চতুর্বর্গ ফল লাভ করা। এই চতুর্বর্গ বলতে বোঝায় ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ। এর মধ্যে ধর্ম অর্থ ও কাম ঐহিক, আর মোক্ষ হ'ল পারত্রিক। বৈষ্ণবরা এই চতুর্বর্গের সঙ্গে যোগ করেন প্রেমতত্ত্ব। তাঁদের মতে প্রেমই পঞ্চম তথা পরম পুরুষার্থ।

বৈষ্ণব প্রেমভাবনায় কিন্তু সীমাবদ্ধতা আছে। সেই মতে শুধু কৃষ্ণ বা গৌরপ্রেম এবং রাধার প্রতি প্রেম বা যুগলপ্রেম পর্যন্ত স্বীকৃত। সেখানে মানবিক প্রেমের কোন ভূমিকা নেই। সুফিবাদে এই মানবিক প্রেমের স্বীকৃতি আমরা দেখি। সেখানে ভগবৎ প্রেম তৈরি হয়েছে পার্থিব প্রেমের আদলে। কর্তাভজা বা সাহেবধনীদের মতবাদে সুফিবাদের এই দিকটি খুব চোখে পড়ে। সেইজন্যই কৃষ্ণ বা গৌর সম্পর্কে তাদের উচ্চারণ তত সসম্ভ্রম নয়, বরং অনেক ঘরোয়া। দ্বৈতবাদে ঈশ্বর সম্পর্কে ভক্তের যে দীনাতিদীনভাব থাকে সাহেবধনীরা তেমন ভাবেন না। তাদের এতদূর মনে হয় যে,

> গৌর গৌর করছ যারে
> সে গৌর তোমার সঙ্গে ফেরে॥

এমনকি গৌরতত্ত্ব ও নবদ্বীপ ধামকে তাঁরা কায়াসাধনার প্রতীকে টেনে আনেন অনায়াসে। উদাহরণরূপে দেখানো যায় খণ্ড খণ্ড ক'রে যাদুবিন্দুর পদ। প্রথমে বলা হ'ল:

> নবদ্বীপে নিত্যধন আছে কোন্‌খানে
> জীবে তার কি জানে।
> ওরে এই দেহ-নদীয়ায় উদয় গৌর রায়
> নিতাইচাঁদ হাসে কাঁদে নাচে গায়
> সাধকে সন্ধি পায় সাধন গুণে॥

সাহেবধনী মতে সাধন-প্রকরণে উপলব্ধির দিকটি খুব ব্যাপক। সাধক সাধিকাকে প্রথমে বুঝে নিতে হয় দেহ-নদীয়ার নবদ্বীপ তত্ত্ব এবং সেই নবদ্বীপের বিভিন্ন গলি ও পাড়া, গঙ্গার (অর্থাৎ নাড়ি) ব্যঞ্জনা। তার প্রলোভন, তার

পিছল ঘাট বুঝে নিতে হয়। এ ব্যাপারে সহায়ক হয় সুসঙ্গ আর গুরুর নির্দেশ। এই কথাটা সম্প্রসারিত করেন যাদুবিন্দু :

যাদের আছে সুসঙ্গ দেখে গঙ্গা গৌরাঙ্গ
সময় সময় সুরধনীর বাড়ে তরঙ্গ।
যখন যোগ লাগে সেই যোগে শরীর
মিলন হয় শিবের সনে॥

এখানে সুরধনীর তরঙ্গ বৃদ্ধির সাধনতাত্ত্বিক অর্থ হ'ল নারীর রজঃপ্রবৃত্তি ; ঐখানেই বাঁকা নদীর বাঁক। ঐখানেই কাম-কুমির এসে যোগসাধনা নষ্ট করে। কিন্তু সত্যিকারের কায়াসাধনার যোগ জাগিয়ে তোলে শিবশক্তির মিলনপ্রতীক। এর জন্য দরকার নারীর প্রতি কামবিহীনতা। যাদুবিন্দু দেহ-নদীয়ায় প্রকৃত ভ্রমণার্থীদের (অর্থাৎ যাঁরা ফুর্তি করতে আসেননি) সম্পর্কে বলেন :

আসল অভ্যাগত যত তাদের প্রাণ হরিগত
রমণী দেখিয়ে ভাবে জননীর মত।
তারা সিদ্ধপুরুষ হয় না বেহুঁস
আছে গুরুর করণে॥

এখানে সর্বভারতীয় হিন্দু ধর্মচেতনার সঙ্গে আবহমান কালের বাঙালী ধর্মচেতনার একটা মূল তফাৎ বলে নেওয়া উচিত। সর্বভারতীয় সাধনার মূল ঝোঁক মননশীলতা আর চিত্তের দিকে। আর বাঙালার ঝোঁক বরাবরই প্রাণময়তা আর হৃদয়বৃত্তির দিকে। সেইজন্য সর্বভারতীয় সাধনার ভিত্তি পুরুষ, আর বাঙালীর সাধনার ভিত্তি জায়া ও জননী : বাংলায় দুর্গা কালী আর রাধা খুব প্রাধান্য পেয়েছে। বাঙালী সাধনায় এই নারীকেন্দ্রিকতার একটি কারণ অনুমান করা সম্ভব। ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে বাঙালী কোনদিনই বৈদিক সাধনাকে পুরোপুরি গ্রহণ করেনি। তাদের ধর্মের ভিত্তি বেদ নয়, তন্ত্র। অভিজাত ধর্ম নয়, লোকায়তিক ধর্ম। তাই বাংলায় মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি বা কামকে ধর্মাচারে খুব বড় স্থান দেওয়া হয়েছে। প্রবৃত্তি বা কামকে মেনে নিয়ে তার থেকে উত্তরণই বাঙালী লোকধর্মের মূলতত্ত্ব।) সেইজন্যই লৌকিক ধর্মসাধনায় প্রকৃতির ও প্রবৃত্তির ভূমিকা খুব বড়। বৈদিক সাধনায় প্রবৃত্তিকে উচ্ছেদ করাই প্রধান কথা। প্রবৃত্তি ও প্রকৃতিনির্ভরতার কথা ভেবেই দুদ্দু শাহ্ বলেন :

আগে মেয়ে রাজি হবে।

ভজনের রাহা পাবে ॥

সাহেবধনী গীতিকার কুবির গোঁসাই গৌরাঙ্গতত্ত্বের সঙ্গে তাঁদের কূট চন্দ্রতত্ত্ব মিশিয়েছেন এবং স্পষ্টই লিখেছেন :

চাঁদে চাঁদ মিশাবার তরে

উদয় হলেন প্রভু নদেপুরে।

চাঁদের সঙ্গে চাঁদ মিশায় ॥

আমার নদের চাঁদ সেই নদেয় আছে

কত চাঁদ ধরেছে চাঁদের গাছে

রাইচাঁদে শ্যামচাঁদ মিশেছে কোটি চন্দ্র চরণময় ॥

দেখ নবরসে নবচন্দ্র হয়েছে

শ্যাম আর রাইয়ে চাঁদ হয়েছে নবচন্দ্রে ঘিরে আছে

তার নাকি ত্রিপিনির ফাঁস ছুটে গেছে ॥

এখানে গৌরাঙ্গতত্ত্বের ভিত্তিতে রাইচাঁদ ও শ্যামচাঁদের মিলন প্রসঙ্গে ত্রিপিনি (ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না) ও নবচন্দ্রের উল্লেখ খুব তাৎপর্যপূর্ণ। বৈষ্ণব সহজিয়া মতে নবতত্ত্ব মানেই পুরুষ প্রকৃতির মৈথুনতত্ত্ব। এর পরের অংশে কুবির বলেন :

দেখ চব্বিশচন্দ্র একত্র করে

সাধন করে প্রভু নদেপুরে।

এই চব্বিশচন্দ্রের তত্ত্ব লৌকিক গানে ও সাহেবধনীদের গানে বারবার আসে। চব্বিশচন্দ্র বলতে বোঝায় ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চোখ, নাক, কান, জিভ, ত্বক) ও তার পাঁচরকম কাজ। ৪ অন্তরেন্দ্রিয় (মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার) এবং ৫ কর্মেন্দ্রিয় (বাক, হাত, পা, পায়ু ও লিঙ্গ) ও তার পাঁচরকম কাজের সমন্বয়। চব্বিশচন্দ্র এখানে বিশেষ ধর্মীয় অর্থেই গৌরাঙ্গের সাধনায় আরোপ করা হয়েছে। এরপরে কুবির এতদূর পর্যন্ত বলেন যে,

চারচাঁদে ধাম পঠ... সারে

অর্ধচন্দ্র খোঁজেন নিত্যানন্দ রায় রামানন্দ।

এখানে চারচন্দ্র মানে নিশ্চয়ই আব আতস খাক বাদ (বৈষ্ণব সহজিয়া মতে তেজ, অপ, পৃথিবী, আত্মা)। নিত্যানন্দ ও রায় রামানন্দের নাম যুক্ত থাকায় স্পষ্ট বোঝা যায় কুবিরের ইঙ্গিত রাগানুগা সহজিয়া কায়াসাধনার দিকে।

গৌরাঙ্গ এইজন্যই সাহেবধনীদের এত কাছের মানুষ। তিনি তাঁদের গুরুর গুরু। সেইজন্যই গানে বলা যায়. 'চেয়ে দেখতে পাই গৌরময় সকলি'। এখানে বিশেষভাবে উচ্চারিত গৌরময়তায় একটি আলাদা দ্যোতনা রয়ে যায়। সে গৌরময়তা গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের বিশুদ্ধ ঐশ্বর্যবান রূপ নয়। এই গৌর সম্পর্কে সহজেই বলা যায় :

গৌর কি জাত বটে।
চাঁড়াল মালো বাগদী দুলে পাটুনী আর তেওর জেলে
কাদের ছেলে গৌর লম্পুটে।

কোন্ পরিবার বুঝতে নারি
কোন্ গোত্র ধরে মন্ত্র পঠে।
হিন্দু মুসলমানের গুরু তিনি বাঞ্ছা কল্পতরু
নামেতে বিপত্তি যায় ছুটে॥

যাদুবিন্দুর নবদ্বীপ ভক্তি (কেননা নবদ্বীপেই গৌরাঙ্গের জন্ম ও লীলা) এতদূর যে সরল বিশ্বাসে তিনি বলে দেন :

নারীপুরুষ নদীয়ার করে বাহুতে বাহার
গোপনে পরেছে গলে গৌরনামের হার।
নদের পশুপক্ষ পাবে মোক্ষ শুদ্ধ হরিনাম শুনে॥

এবং আরেকটি গানে বলেন :

নদের হাড়ি আর মুচি আমার নাই বাছাবাছি
দাস বলে দয়া করিলে হাত তুলে নাচি।
আমি নবদ্বীপে জীবন সঁপে চরণধূলি তুলে খাই।

এখন তর্ক উঠতে পারে যে সাহেবধনীরা গৌরাঙ্গকে এতটাই যদি মানবিক বা নিম্নবর্ণের নেতা বলে মেনে নেয় তবে রাধাকৃষ্ণ বা গৌরাঙ্গের রূপকটুকু না নিলেও তো পারত। এ তর্কের জবাবে আমাদের উদ্ধৃত করতে হয় বোরহান-উদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের চমৎকার এক বিশ্লেষণ যেখানে তার মত হল :

ঐ সময়কার যে-কোন দর্শন কি মতবাদ বলীয়ান ধর্ম কি দর্শনের প্রতিবাদে অথবা সমান্তরালে উৎসারিত হলেও, সে-উৎসারণের ক্রেম নির্ভর করছে ধর্মবোধের উপর। প্রত্যয়ের মাধ্যমে জগৎসংসার বোঝা ও ব্যাখ্যা মানুষ করে থাকে। "এক যুগের প্রত্যয় দিয়ে অন্য যুগের পারম্পর্য ও সূত্র

ধরা যায় না। তার কারণ সমাজ-কাঠামোর পরিবর্তন। মধ্যযুগে জগৎ বোঝা ও ব্যাখ্যা করার মাধ্যম ছিল ধর্ম। ধর্ম মধ্যযুগের প্রত্যয়।

ধর্ম যেহেতু ছিল মধ্যযুগের প্রত্যয় সেইজন্য সাহেবধনীরা সে সময়কার সবচেয়ে বলীয়ান ধর্ম বৈষ্ণবতাকে উপেক্ষা করতে পারেনি, তবে খানিকটা পালটে নিয়েছে। বৃন্দাবননিয়ন্ত্রিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মাদর্শে গৌরাঙ্গের আবির্ভাবতত্ত্ব সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয় সহজিয়ারা বা সাহেবধনীরা তা মানেন না। তাঁরা গৌরাঙ্গকে মানেন সহজতত্ত্বের প্রবর্তকরূপে আর সেই সহজতত্ত্বের মূলে মানবতত্ত্ব।) অনৈক মুকুন্দদাসের লেখা অমুদ্রিত 'আত্মকৌমুদী' সহজিয়া পুঁথিতে এই সহজ ও মানবতত্ত্বের কিছু নিশানা আমার কাছে স্পষ্ট হয়। এখানে তা উদ্ধার করা যায়। বলা হয়েছে :

তিনমত বাহ্যসামা মানুষ কথিতা।
যোনিসম্ভবা অযোনিসম্ভবা আর স্বতঃ সিদ্ধা॥
যোনিসম্ভবা মানুষ দেহী বর্তমান।
অযোনিসম্ভব সেই গোলকে অবস্থান॥
স্বতঃ সিদ্ধা মানুষ গতি নিত্যবৃন্দাবন।
এই মত তিনমানুষ ত্রিবিধ গঠন॥

এখানে উল্লেখযোগ্য যে লোকায়ত মতে যোনিসম্ভব দেহধারী মানুষ নিয়েই সত্যিকারের সাধনা। কেননা তার মধ্যে আছে জন্মগত কামনার সংস্কার। সেই কামনার পথে কামোত্তীর্ণ হয়ে সহজ ও অটল প্রেমে স্থিত হওয়াই তাঁদের লক্ষ্য।

এই প্রেমের সাধনায় তাঁদের অবলম্বন করতে হয় পাঁচরকমের আশ্রয়। সেগুলি যথাক্রমে ভাবাশ্রয়, মন্ত্রাশ্রয়, নামাশ্রয়, প্রেমাশ্রয় ও রসাশ্রয়। এরমধ্যে শেষ অবলম্বন হ'ল পরকীয়া মিথুনাত্মক রসাশ্রয়, যার প্রতীকীমন্ত্রের নাম কামবীজ ও কামগায়ত্রী। কামগায়ত্রী মন্ত্র :

ক্লীং কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গপ্রচোদয়াৎ॥

আর

ক্লীং রাধিকায়ৈ বিদ্মহে গান্ধর্বিকায়ৈ ধীমহি তন্নোরাধা প্রচোদয়াৎ॥

সংক্ষেপে এই মন্ত্রদুটিকে বলে ক্লীং ও শ্লীং মন্ত্র। সহজিয়াদের বিশ্বাস যে,

এই বীজ গায়ত্রী দুই স্বরূপ বর্তমান।
রাধাকৃষ্ণ দুইদেহ এ মূল কারণ॥

রাধাসহ কৃষ্ণ যবে করিলা বিলাস।
সেই তো বিলাস বীজ গায়ত্রী প্রকাশ ।।

কামবীজ আর কামগায়ত্রী অবলম্বন করে যে পরকীয়া মিথুনাত্মক সাধনা তা সকলের জন্য নয়। সহজিয়া রাগানুগা পথে সাধকের প্রথমে থাকে প্রবর্ত-দশা, তখন শুধু নামাশ্রয়। তারপরে আসে সাধক-অবস্থা, তখন মন্ত্র ও ভাবাশ্রয়। সবশেষে সিদ্ধ অবস্থা, তখন প্রেম ও রসাশ্রয়। বলা হয়েছে :

নাম হয় তামা মন্ত্র হয় কাঁসা
রূপা হয় ভাব প্রেম হয় সোনা
রস হয় রত্ন চিন্তামণি স্বয়ং ।।

তামা কাঁসা রূপা সোনা পার হয়ে তবে রত্ন। তলাতল পাতাল খুঁজলে তবে সেই রত্নধন মেলে, কুবির তাঁর অতিপ্রসিদ্ধ গানে এই কথাটাই বলেছেন। কিন্তু তার মূলে কামবীজ ও কামগায়ত্রী। তাই বলা হয়েছে :

কামগায়ত্রী কামবীজ শিক্ষা করিবে।
এই বীজ লইয়া তবে দেহ সমর্পিবে ।।

এই বীজমন্ত্রের প্রতীকী ধ্বনি 'ক্লীং'-য়ের অর্থ 'সম্মোহনতত্ত্ব' বইতে এইভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে যে,

ক কারঃ পুরুষং বিদ্যাৎ
ল কার প্রকৃতিং গত।
প্রকৃত্যা সহ সংযোগাৎ
ক্লীং নিত্যাভির্ধীয়তে ।।

ক-কারের অর্থ পরমপুরুষ সর্বশক্তিমান, ল-কারের অর্থ পরমাপ্রকৃতি। এই ভাষ্য মন্তব্যায়ী সুতরাং প্রকৃতিপুরুষের নিরবচ্ছিন্ন মিলনই রসাশ্রয়ের চরম। সহজিয়াদের এই রসতত্ত্ব কুবিরের গানে আমরা প্রতিফলিত দেখতে পাই। তাঁর গান 'সাধনেতে সিদ্ধ হয়েছি' ভাল করে পড়লে (দ্রষ্টব্য : ৩২ সংখ্যক গান) বোঝা যায় কুবির সাহেবধনী সহজিয়া পথে প্রবর্ত ও সাধক স্তর পেরিয়ে সিদ্ধের স্তরে উঠেছিলেন। তাঁর আরেকটি গান এখানে উদ্ধৃতি দিলে কুবিরের রসসাধনার নিগূঢ় চিত্র আরো স্পষ্ট হয় :

নীরে ক্ষীরে চলে তীক্ষ্ণ ধারে
পড়ে বিন্দু খসে মেঘসঞ্চারে।

সাধকের মধুর শৃঙ্গার কামধনুকে টংকার
আসকে ব্রহ্মকোটি ভেদ করে ॥
ক্লীং মন্ত্র প্রকাশিয়ে যন্ত্রে যন্ত্র মিশাইয়ে
হৃদে কুচগিরি লয়ে আলিঙ্গন প্রহারে।
শেষে ভুজলতায় লতায় কষে
ভেদাভেদ করে অন্তরে অন্তরে।
ভেদাভেদ বেদ আদি মন্ত্র কামগায়ত্রী কামবীজ মন্ত্র
সাধন করে যন্ত্রে যন্ত্র একচিত্ত অন্তরে।
কুবির বলে হ'লে নির্বিকারী
চরণ পাবিরে সাধনজোরে ॥

নির্বিকারী করণধারী এই সাহেবধনী-সাধনা বুঝতে আমাদের কামগায়ত্রীর মূল তত্ত্ব বুঝতে হবে। কামগায়ত্রী একটি সাংকেতিক শ্লোক যার প্রত্যেকটি ধ্বনির দেহগত ও শৃঙ্গারধর্মী অর্থ আছে। মূল সাংকেতিক শ্লোকটি: 'কাম-দেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোহনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ'। এর আভিধানিক অর্থ হল: কামদেবকে অবগত হই, পুষ্পবাণকে ধ্যান করি, অনঙ্গ আমাদের অন্তঃকরণে সেই পরমাত্ম জ্যোতিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রকাশিত করুন।

কিন্তু লোকায়ত ধর্মের ধারা এই সাংকেতিক মন্ত্রের ধ্বনি ও বর্ণের অন্য অর্থ করে। সেই মতে:

কা শব্দে কহি এই নাসিকা প্রমাণ।
ম শব্দে অর্থ কহি চক্ষুতে সমান ॥
দে শব্দে কহি দুই দেহ বর্তমান।
বা শব্দে যুগল বাহু দোঁহাবিষ্ট গুণ ॥
য় শব্দে দুই অঙ্গ সঘনে কম্পন।
বি শব্দে বক্ষ কহি সুখেতে মিলন ॥
দ্ম শব্দে হস্ত পুন কুচের মর্দন।
হে শব্দে করতল তাহাতে অর্পণ ॥
পু শব্দে উদরেতে রসের কমল।
ষ্প শব্দে কঞ্চালি কহি তাহার পরিমল ॥
বা শব্দে বিকশিত ভগেন্দ্র বিন্দু দ্বার।
না শব্দে লিঙ্গ নানা বিলাস রসাল ॥

ম্ন শব্দে উলস কহি ভাবের বিথার।
ধী শব্দে কহি ধীর সুখের শৃঙ্গার ॥
ম শব্দে মুখে মুখে একত্র মিলন।
হি শব্দে হরষিত সমান আচরণ ॥
ত শব্দে তরল রস চুম্বনমাধুরী।
ম্ন শব্দে মধুর রস দোঁহাতে আচরি ॥
ন্ন শব্দে গরীয়ান রতির পণ্ডিত।
প্রচো শব্দে সুধারস অন্তরে স্খলিত ॥
দয়াৎ শব্দেতে কহি সুধাদান মাগি।
দোঁহ রস দোঁহ স্বাদ সদাক্ষণ ভেগী ॥

বীজ ও গায়ত্রীর এই তাৎপর্যের সঙ্গে কুবিরের পূর্বোদ্ধৃত পদের মিল বিস্ময়কর। বীজ ও গায়ত্রী সহজিয়ামতে আসলে কৃষ্ণ ও রাধা। তাই বলা হয়:

সেই বীজ গায়ত্রী রাধাকৃষ্ণ দুইজন।
পরকীয়া রূপে তাহা করে আচরণ ॥

এখন বোঝা সহজ হবে সাহেবধনীদের রসতত্ত্বের মূলে মানুষতত্ত্ব, সাধকের সংকেত ক্লীং মন্ত্র এবং সাধিকার শ্লীং। এইবারে সাহেবধনীদের ঘরের গোপন-মন্ত্রের একটি পংক্তি এখানে উল্লেখ করা যায় যাতে বলা হয়েছে:

ক্লীং শ্লীং দীনদয়াল সাহেবধনী সহায়।
গুরুসত্য। চারিযুগ সত্য। চন্দ্র সূর্য সত্য।

স্পষ্টতই ব্যক্ত হয় যে সাহেবধনী মতবাদে সহজিয়া স্রোত এসে মিশেছে। 'চন্দ্র সূর্য সত্য' কথাটায় রজবীর্যের মিশ্রিত সাধনার ইঙ্গিতও অস্ফুট নয়। কুবিরের গানে নীর ও ক্ষীরের উল্লেখ রজবীর্যকেই বোঝায়। আরেকটি গানে বলা হয়েছে, 'শনি শুকুল বীজরূপে এক'। এখানে শনি বলতে বোঝানো হয় শোণিত (রক্ত) আর শুকুল বলতে শুক্র (বীর্য)। এ ব্যাপারে সাহেবধনীদের বীজতত্ত্বের ব্যাখ্যাটুকু চমৎকার সৃষ্টিশীলতার উদাহরণ। তাঁদের বিশ্বাস যে, মানুষের শরীরে সাতটি ধাতু আছে। রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র। শুক্রই তাঁদের মতবাদে সার পদার্থ। তাঁদের ধারণা, মানুষ যা আহার করে তা পাঁচদিনে পরিপাক হয়ে রসে পরিণত হয়। ঐ রস পাঁচদিনে পরিপাক হয়ে রক্তে, রক্ত পাঁচদিনে মাংসে, মাংস পাঁচদিনে মেদে, মেদ পাঁচদিনে

অস্থিতে, অস্থি পাঁচদিনে মজ্জায় এবং শেষপর্যন্ত মজ্জা পাঁচদিনে পরিপাক হয়ে শুক্ররূপ পায়। দুর্লভ রসরত্নরূপ শুক্ররক্ষাই সহজিয়া দেহসাধনার মূল কথা। তারজন্য দরকার শিক্ষাগুরু। এই কারণেই সাহেবধনীদের গুহ্যমন্ত্রে 'গুরু সত্য' কথাটি আছে। এই মতবাদে গুরুর ভূমিকা এমনকি গোবিন্দের চেয়ে উঁচুতে। তাই গুরু ছেড়ে যারা গোবিন্দ ভজে যাদুবিন্দু তাদের ধিক্কার দিয়েছেন :

গুরু ছেড়ে গোবিন্দ ভজে
সে পাপীর জায়গা হয় নরকমাঝে।

আসলে সাহেবধনী তথা সহজিয়াদের ব্যাপক লোকায়ত মতবাদে গুরুর ভূমিকা খুব বিস্তৃত এবং সব-দিক-মেলা একটি তত্ত্ব। তাই বলা হয় :

গুরু জন্মদাতা পিতা গুরু মাতা রূপেতে।
দশমাস দশদিন রক্ষা করেন গর্ভেতে ॥
প্রসবকালে মুগ্ধ প্রসূতিরূপে দুগ্ধ দিলে।
দোলালে কোলে বলালে ব'লে মা শিখালে ॥
দীক্ষা দেন আচার্যরূপে শিক্ষা সাধুরূপেতে।
পরীক্ষা করেন ধরি মোহিনী রূপমাধুরীতে ॥

শেষ পংক্তির ইঙ্গিতটুকু খুব তাৎপর্যপূর্ণ। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে লোকায়ত সাধনায় সাধন-সঙ্গিনীর ভূমিকা বোঝা যায়।

এবারে লক্ষ করা দরকার সাহেবধনীদের 'চারিযুগ সত্য' এই গুহ্যমন্ত্রটি। নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবরা চৈতন্যের আবির্ভাবতত্ত্বের পিছনে তিনবাঞ্ছার কথা বলেন। লোকায়ত মতে চৈতন্যলীলার মূলে এক দিব্যযুগতত্ত্ব আছে। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি ছাড়া এক দিব্যযুগের কথা এ-মতে খুব শোনা যায়। একটি পদে বলা হয়েছে :

শাটিতে পেয়ে সুধা
সারে চারিযুগের ক্ষুধা।

এখানে প্রশ্ন ওঠে চারিযুগের ক্ষুধা বলতে কি বোঝায়? শাটিই বা কে?

লৌকিক বিশ্বাসমতে শাটি এক নারীর নাম, যিনি সার্বভৌমের কন্যা এবং চৈতন্যের পরকীয়া সাধনসঙ্গিনী। কিন্তু কেন চৈতন্য মানুষরূপে জন্মে শাটির সঙ্গে পরকীয়া রসতত্ত্বের সাধনা করলেন তার লৌকিক ভাষ্য চমৎকার কল্পনাশক্তি ও যুক্তি বুদ্ধির উদাহরণ। আমরা ক্রমান্বয়ে সেই দিকটি উন্মোচন করব সহজিয়া

গোপন পুঁথি 'আত্মকৌমুদী' অবলম্বনে। প্রথমেই বুঝতে হবে সম্পূর্ণ বাধাবন্ধ-বিহীন ব'লে স্বকীয়া প্রেমধর্ম অগ্রহণীয়। তাই বলা হয় :

স্বকীয়াতে বেগ নাই সদাই মিলন।
পরকীয়া দুঃখসুখ করিল ঘটন॥

পরকীয়াতে রয়েছে দুঃখসুখের রোমাঞ্চ, নিন্দা, অপবাদ, কুলশীল-মর্যাদার দোলাচল। তাই প্রেম সেখানে উপলবন্ধুর। নবদ্বীপলীলার প্রাক্ পরিকল্পনায় কৃষ্ণ রাধাকে বললেন :

পূর্বে ছিলে রাধা তুমি আমার অন্তরে।
এবে রাধে আমি রহি তোমার অন্তরে॥
এইমত দুয়ে এক হইব এক্ষণে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম গৌরবরণে।

এর আগে কৃষ্ণলীলা ঘটে গেছে গোলক ও বৃন্দাবনে। সেখানে ছিল তাঁর ঐশ্বর্যরূপ। এবারে নবদ্বীপে উদ্‌ঘাটিত হবে তাঁর মানুষী আচরণ, সাধারণ মানবীর সঙ্গে পরকীয়া দেহসাধনে। তাই

সন্ন্যাস করিয়া প্রভু সাধে পরকীয়া।
সার্বভৌমনন্দিনী শাটি কন্যাকে লইয়া॥
মহাপ্রভুর পরকীয়া শাটি কন্যা লইয়া।
অটল রতিতে সাধে সামান্য মানুষ হইয়া॥

কিন্তু ঈশ্বর কেন মানুষের সহজ স্বভাব গ্রহণ করলেন? ঈশ্বর কি মানুষের মত? মানুষতত্ত্বের মূলে রজবীজ অথচ ঈশ্বর স্বয়ম্ভু। তাই বলা হয়েছে :

রজে বীজে জন্ম নহে রতিশূন্য কায়া।
সহজ অংশ ছাড়া মাত্র ঈশ্বরের দেহা॥
এই মত অংশশূন্য ঈশ্বর নিশ্চয়।
এই লাগি সহজস্বভাব ঈশ্বরে না হয়॥

রজবীজে জন্ম নয় ব'লে ঈশ্বর সহজস্বভাব অর্থাৎ কামবোধহীন।

বাঙালির লৌকিক চিন্তার অভিনবত্ব এই যে, ঈশ্বরকে এখানে নিচে নামানো হয়েছে মানুষের আদলে। শ্রীকৃষ্ণ গোলক বৃন্দাবন ছেড়ে নেমে এসেছিলেন নবদ্বীপে, মানুষের মত কাম থেকে প্রেমে উত্তরণের সাধনা করতে, শাটির সংসর্গে। তিনি স্বতই কামনাশূন্য, তাঁর মধ্যে নেই জন্মগত রজবীজের সংস্কার। তাই পরকীয়া মিথুনাত্মক রসরতির তত্ত্ব ভাল ক'রে বোঝবার জন্যই যেন তাঁর

শ্রীগৌরাঙ্গের দেহধারণ ও প্রেমসাধনা। এর আগে রাধার মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়ার মধ্যে পরকীয়া সাধনার সার্থকতা ঘটেনা তাই আশ্রয় করতে হয় শাটির সংসর্গ। এ হ'ল আধারগত বিশিষ্টতা। তাই বলা হয়েছে :

সকলি পাত্রের গুণে হয়
তাম্র পাত্রে রাখলে দধি যেমন বিষ কয়॥
চারিজাত নারীর মাঝে
রসিক বড়় লক্ষণ খোঁজে
যাহাতে অমৃত বোঝে, ধরে তার পায়।

শ্রীচৈতন্য শাটির আধারে খুঁজে পান অমৃত, তাই সে-আধার আশ্রয় করে ঘোচে তাঁর চারযুগের ক্ষুধা।

ধ'রে শাটির রাঙা চরণ
সেধে নেয় সহজসাধন॥

সাধারণ ভাবে ভক্তিসাধনার মূল সূত্র ভক্ত-ভগবান তত্ত্ব। ভগবান পরম শক্তিমান ঐশ্বর্য্যময় আর ভক্ত নিষ্কিঞ্চন দীনাতিদীন ; এই হ'ল ভক্তিবাদের মূল কথা। তাই ভক্তের প্রয়াস হ'ল স্মরণ কীর্তন অর্চন বন্দন আত্মসমর্পণ ইত্যাদি দাস্যভাবের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের চরণাশ্রয় ও তাঁর ঐশ্বর্যে বলীয়ান হবার সাধনা। কিন্তু সহজিয়া সাধনায় বলা হয়েছে ঈশ্বরই যেন মানুষরূপ নিতে আগ্রহী।

মানুষে ঈশ্বরাশ্রয় এই মত নয়।
মানুষে মানুষধর্ম করিবে আশ্রয়॥
মানুষ দেহাশ্রিত বাঞ্ছে গোলক ঈশ্বর।
মানুষ রতিগতি লোভে সদা সে তৎপর॥

গৌরাঙ্গের আবির্ভাবতত্ত্বকে এই নতুন দার্শনিক তত্ত্বে মণ্ডিত ক'রে দেখাই সহজিয়া বৈষ্ণব সাধনার সবচেয়ে মৌলিকতা। সাহেবধনীদের সঙ্গে এইখানে তাদের মিল।

এই মতবাদে মানুষকে ঈশ্বরের পিতা ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা ঈশ্বর যখন মানবপুত্র কামনা নিয়ে মানবধর্ম (অর্থাৎ দেহসংস্কারময় প্রেমধর্ম) পালন করতে মর্তাবতরণ করেন তখন মানুষকে ঈশ্বরের পিতা বলতে আপত্তি কোথায়? তাই বলা হয়েছে :

মানুষে ঈশ্বর উদ্ভব জগতে না জানে।
মানুষ ঈশ্বরের পিতা অসম্ভব মানে॥

অসম্ভব নহে ইহা এই সে সম্ভব।
মায়াভ্রমে সম্ভবে না দেখে অসম্ভব ॥
ঈশ্বরের পিতা মানুষ অসম্ভব নয়।
দেখ গোলকপতি ঈশ্বর মানুষ আশ্রয় ॥

সাহেবধনী ও সহজিয়ারা যখন মানুষের জয়ঘোষণা করেন তখন এই রক্তবীজের সংস্কার আবদ্ধ উন্নত মানুষের কথাই মনে রাখেন। যার উত্তরণ কাম থেকে প্রেমে। দেবতা, মন্ত্র, শাস্ত্র, আচার, মন্দির ও আপ্তবাক্যের অনেক ওপরে এই মানুষের বাস। চণ্ডীদাসের প্রসিদ্ধ উচ্চারণ, সবার উপরে মানুষ সত্য কথাটির আলাদা তাত্ত্বিক অর্থ এই স্বাতন্ত্র্যে। সাহেবধনীদের গুহ্য মন্ত্র 'চারযুগ সত্য' কথাটির ব্যাপ্তি ও দ্যোতনা অত্যন্ত গভীর। লালন ফকিরের একটি গানে বলা হয়েছে :

ওগো চারযুগে ঐ কেলেসোনা
তবু শ্রীরাধার দাস হইতে পারলে না।
যদি হইত দাস যেত অভিলাষ
তবে আসবে কেন নদীয়ায় ?

এই যে নারীর দাস না-হতে-পারার বেদনা, এই যে অভিলাষের অপরিপূর্তি তারজন্যই গৌরাঙ্গজন্ম। এই কারণেই চারযুগ সত্য। অর্থাৎ চতুর্থযুগেই সাধনলীলার সার্থকতা এবং মানবলীলার জয়। প্রথম তিনযুগে দেবতারূপে যে সাধনে তিনি ব্যর্থ, চতুর্থযুগে মানবরূপে সেখানেই তিনি সফল। সেইজন্যই কুবিরের ঘোষণা :

মানুষের করণ কর।
এবার সাধনবলে ভক্তির জোরে মানুষ ধর ॥

মানুষে কোরো না ভেদাভেদ
মানুষ সত্যতত্ত্ব জেনে মানুষের উদ্দেশ্যে ফের ॥

সাহেবধনীদের দৃষ্টিতে শ্রীগৌরাঙ্গ ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন মানুষ নন, মানবিক কামনাউত্তীর্ণ ঈশ্বর। এইবারে বোধহয় একথা খুব নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলা যাবে যে, লালন বা কুবির কোনদিন বা কখনও বৈষ্ণবভাবাপন্ন গান লেখেননি, লিখতে পারেন না। তাঁদের কাছে গৌরাঙ্গ একটি বিশেষ তত্ত্ব ও সত্য। তাঁদের নিজেদের ধর্মমত ও নিজস্ব বিশ্বাসের সঙ্গে মিলিয়ে গৌরাঙ্গ তাঁদের কাছে হয়ে

উঠেছেন একটি প্রতীক। শুধু পরিত্রাতা বা জাতিভেদবিনাশক নন, গৌরাঙ্গ তাঁদের দৃষ্টিতে সহজসাধন ও মানুষভজনের প্রবক্তা।) এইজন্য কৃষ্ণ-রাধা একটি প্রতীক, গৌরাঙ্গ-শাটি একটি প্রতীক এবং দুই প্রতীক একই পরম্পরায় বাঁধা। এইকথা বুঝে নিয়ে কুবিরের নিচের পদাংশ পড়লে খুব স্পষ্ট হবে এই তত্ত্ব যে,

রাধাকৃষ্ণ ভিন্নদেহ বলিতে পারে না কেহ
একই আত্মা কিশোর কিশোরী।
হংসে হংসিনী সুখবিলাসিনী তেমনই চাঁদচকোর
পদ্মে ভ্রমর মৌব মৌরী॥

প্রথম পংক্তির তত্ত্বটুকু যদিও বা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের সমগোত্রীয় কিন্তু দ্বিতীয় পংক্তির কিশোর-কিশোরী প্রসঙ্গ একেবারে সরাসরি সহজিয়া অনুষঙ্গে উঠে এসেছে। তৃতীয় আর চতুর্থ পংক্তিতে রাধাকৃষ্ণের অভেদতত্ত্ব বোঝাতে কুবির নিতান্ত জৈবিক ও প্রাকৃতিক উপমা টেনে এনেছেন। একেই বলে শাস্ত্র-নির্দেশহীন ধর্মের মাটি-মাখা রূপ। দৈবী মহিমার বিশুদ্ধ চন্দনগন্ধ এখানে অনেক ম্লান, বরং দৈনন্দিন প্রাকৃতজীবনের দেহগন্ধী স্পন্দন এসব গানে তীব্র। সেইসঙ্গে অনলংকৃত বাগ্‌ভঙ্গীর গ্রাম্য সারল্য গানকে এনে দেয় শ্রোতা ও ভক্তের কাঙ্ক্ষিত নৈকট্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় কুবিরের আরেকটি গান যেখানে বৈষ্ণব শাস্ত্রানুমোদিত 'প্রীতি' শব্দটি লোকনিরুক্তিতে দাঁড়িয়েছে এক করুণ অর্থান্তরে :

পিরিতি করবিনি কি জন্যে মন আমার বল দেখি।
সংসারে আবালবৃদ্ধযুবা আদি পিরিতি ক'রে সবাই সুখী॥
আরও ভ্রমর ভ্রমরী মৌরা মৌরী শুকসারী পাখি চকাচকী।
পিরিত করেছিলেন সত্য রঘুনাথ আর জানকী॥

রাধাকৃষ্ণ লীলার শ্রেষ্ঠ প্রেমের গুরু চন্দ্রামুখী।
তারা প্রেমেতে জগৎ মাতালে উদ্ধারিলে সব পাতকী॥
জলচর বনচর আদি পিরিত করে পশুপাখি।
পিরিত করতে স্বর্গমর্ত্য ব্রহ্মাণ্ডে কেউ নেইকো বাকি॥
পিরিত দেবতা গন্ধর্বে করে পাতালেতে সেই বাসুকী।
পিরিত করে শকুন চিলে হাড়গিলে আর কুকাকুকী॥
করে শৃগালে কুকুরে পিরিত চালের বাতায় টিকটিকি।
আনন্দে প্রেমসুধা গান পান করে সদা বিধুমুখী॥

গানটি যে উচ্চস্তরের নয় সেতো বোঝাই যায় কিন্তু এর গুরুত্ব হ'ল লৌকিক গানের সর্বগ্রাসিতার দিক থেকে। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল থেকে চালের বাতার টিকটিকি পর্যন্ত বাদ যায় না এই গ্রাসিতায়। প্রীতি শব্দের অপভ্রংশে পিরিত শব্দটি চণ্ডীদাস ব্যবহার করেছিলেন সদর্থে। 'কানুর পিরিতি চন্দনের রীতি ঘষিতে সৌরভময়' এমন চমৎকার বিন্যাস তাঁরই। পিরিতি শব্দটি তাঁর পদে ঊর্ধ্বায়িত মহিমাও পেয়েছে অনেকক্ষেত্রে। যেমন :

এমন পিরিতি কভু দেখি নাহি শুনি।
পরানে পরান বান্ধা আপনা আপনি॥
দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥

এখানে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের ঐশী মহিমার স্তব গান শুধু নয়, 'দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে'-র মত সূক্ষ্ম ভাবাত্মক প্রেমদর্শনেরও ছোঁয়া আছে। প্রেমের এই ঊর্ধ্বায়ন তথা Sublimation কুবিরের গানে নেই। তার একটা কারণ, কুবিরের সৃজন-দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে তাঁর লৌকিক ধর্মমত। সেই মত অতিমর্ত্যতায় আচ্ছন্ন, কায়াবাদী ও প্রত্যক্ষ। তাঁর গানের শ্রোতাও আঠারো-উনিশশতকের অশিক্ষিত গ্রামীণ মানুষ। অবক্ষয়িত সেই সমাজে সুস্থ ও বিশুদ্ধ প্রেমধারণার চেয়ে জৈবিক পিরিতি তাদের কাছে অনেক রোচক ছিল। তারা রাধাকৃষ্ণের পরকীয়া প্রণয়ঘটনা, গৌরাঙ্গ-শাটির উপাখ্যানকে স্বতঃসিদ্ধহীনার্থে কালিমাময় ক'রে দেখতে ভালবাসত। উনিশশতকের কলকাতায় কবিগানের আসরে এই একই কারণে জনপ্রিয় হয়েছিল কৃষ্ণ-কাহিনীর অন্তর্গত কলঙ্ক ও ছলনা অংশ। কুবিরের গানেও সেই অবক্ষয়ের অমার্জনীয় স্পর্শ আছে কিন্তু প্রধানত লৌকিক ধর্মীয় গীতিকার ব'লে এবং কলকাতার কবিদলের মত তাঁকে জনমনোরঞ্জন করতে হ'ত না ব'লে তাঁর গানে অনেক রকমের শক্তি ও মৌলিকতা আমরা খুঁজে পাই।

কুবিরের গানে বৈষ্ণব-ভাবনার যে অন্যতর শক্তির কথা উল্লিখিত হ'ল তার উদাহরণ দেবার আগে সেই মৌলিকতার সমাজ-উৎসটুকু জেনে নেওয়া দরকার। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ভাল ক'রে অনুধাবন করলে দেখা যাবে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের একশো বছরের মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর সৃজনধারায় নেমে আসে কৃত্রিমতা ও নিরাবেগ শুষ্কতা। আঠারো শতকে বৈষ্ণব পদাবলীর তীব্র অবক্ষয়ের টান তাকে ভরিয়ে তোলে তাত্ত্বিক শুষ্কতায় ও অকবিত্বে। অথচ এই সময়েই

লালন, লালশশী ও কুবির লেখেন তাঁদের চমৎকার জীবনস্পন্দী গানগুলি। সুতরাং এসব গানের উৎস সন্ধান করা দরকার অন্যত্র।

একথা সর্বমান্য যে, বৈষ্ণব পদাবলীর সবচেয়ে শক্তিশালী অংশ এবং মরমী জীবনস্পর্শী স্পন্দন ধরা পড়েছে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির রচনায়। কিন্তু এঁরা দুজনেই বৈষ্ণব ছিলেন না। চণ্ডীদাস ছিলেন সহজসাধক, বিদ্যাপতি ছিলেন পঞ্চোপাসক। সম্ভবত এঁদের ব্যক্তিগত জীবনের প্রণয়ের অভিজ্ঞতা এঁরা প্রকাশ করেছিলেন রাধাকৃষ্ণের নির্দোষ রূপকের মধ্য দিয়ে। মধ্যযুগের গোঁড়া সমাজে সরাসরি মানবিক প্রেমের কথা উচ্চারণ ছিল গর্হিত অপরাধ। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির (এবং জয়দেব) পদ শ্রীচৈতন্য আস্বাদন করতেন ব'লে নৈষ্ঠিক গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ তাঁদের স্বীকার ক'রে নেন মহাজন ব'লে এবং ঐ দুজনের পদাবলীর ঐহিক অংশকে শুদ্ধ ক'রে নেন নিজেদের তত্ত্ব শুদ্ধতার আধ্যাত্মিক প্রলেপে। লক্ষণীয় যে, চৈতন্যোত্তর কালের সবচেয়ে শক্তিমান দুই কবি জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস তাঁদের রচনার আদর্শ হিসাবে নিয়েছিলেন যথাক্রমে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি। ব্যক্তিগত জীবনে শুদ্ধ নিষ্কলুষ কৌমার্যধারী এই দুই কবি বিশ্বাসে খাটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব হয়েও কেমন ক'রে যে অমন হৃদয়স্পর্শী প্রেমের গান লিখলেন তা আজও এক বিস্ময়ের ব্যাপার। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির নিপুণ অনুকরণ এর একটি কারণ নিশ্চিত। কিন্তু সামগ্রিকভাবে চৈতন্যোত্তর পদাবলী সাহিত্য (নরোত্তমদাস, বলরামদাস, শশিশেখর ও কবিবল্লভের কিছু পদ বাদে) যে কৃত্রিমতায় ও আলংকারিতায় ভরে গেল তার কারণ বৈষ্ণব ধর্মদর্শনে বৃন্দাবনের পণ্ডিতদের হস্তাবলেপ এবং বাংলা বৈষ্ণবসমাজের বিকৃতি। এ সময়ের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত কবিরা কৃষ্ণরাধার প্রেমবিষয়ক গান রচনার চেয়ে অধিকতর উৎসাহী ছিলেন গৌরাঙ্গের অবতারবাদ প্রতিষ্ঠায়। জগদ্বন্ধু ভদ্রের 'গৌরপদ-তরঙ্গিনী' সংকলনে এমন 'শুধু রাশি রাশি শুষ্ক কুসুম' পুঞ্জিত দেখা যায়। আঠারো শতকের বৈষ্ণব কবিতা প্রথাবদ্ধতায় একঘেঁয়ে আলংকারিতায় কৃত্রিম। উপমার প্রচলবদ্ধতা, পদরচনার পৌনপুনিক রীতি এবং প্রকরণপ্রাধান্য বৈষ্ণব পদাবলীকে খুব সুনিশ্চিতভাবে ঠেলে দিল জীবনধর্মের উষ্ণ পরিমণ্ডলের বাইরে।

বৈষ্ণব পদাবলীর ঐ সামগ্রিক অবক্ষয় ও পুচ্ছানুগ্রাহিতার সমাজ পরিবেশেই কিন্তু গড়ে উঠল নানা লৌকিক গৌণধর্ম। তাদের বিশ্বাস, প্রাণাবেগ, জীবনধর্মী দর্শন ও মিথুনাত্মক সাধনা থেকে পাওয়া প্রত্যয় তৈরি করল এক প্রবল পদাবলীর ধারা। লালন-লালশশী-কুবিরের পদে তারই প্রতিফলন। বাতুবিন্দু ও দ্বন্দ্ব

শা'র রচনায় তারই অনুবর্তন। এই সব গৌণধর্মের প্রাণবীজ চৈতন্য আবির্ভাবের অনেক আগে থেকেই এ দেশের গোপন সহজ সাধনার মধ্যে অনুস্যূত ছিল। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব শুধু তাদের সাহসী ক'রে তুললো আত্মপ্রকাশের দ্বিধাহীন শক্তিতে। জাতিভেদহীন অবৈদিক জীবনসাধনা শ্রীচৈতন্যের সবচেয়ে বড় অর্জন। তার সঙ্গে সহজিয়ারা যোগ ক'রে দিলেন গৌরাঙ্গের গুহ্য পরকীয়া সাধনার মিথ। এবারে গৌণধর্মসম্প্রদায়ীরা তাদের প্রবর্তকের সঙ্গে জুড়ে দিল গৌরাঙ্গের ধারা। ফলে সুদীর্ঘকাল আমাদের দেশে বৌদ্ধ হীনযান ধর্মের পরিশিষ্টরূপে যারা বেঁচে ছিল এবং তন্ত্র ও সহজিয়া কায়াসাধনার যে-ধারা ছিল আত্মগোপন ক'রে, সব বার হয়ে এল সাবলীলভাবে। তাদের আচরণঘটিত বিকৃতি ও বীভৎসতা বরং অনেক শুদ্ধশীল ও শ্রীশীসংযোগে সংযত হ'ল। হিন্দু মুসলমানের মিলিত জীবনশক্তি এই গৌণধর্মগুলিকে বিচিত্র ও বিপরীত দোলাচলে আকর্ষণীয় ক'রে তুলল। এসে গেল গুরুবাদ এবং নতুন নতুন প্রতীক। প্রসঙ্গত আহমদ শরীফের মত এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য। তিনি বলেন :

> হিন্দুপ্রভাবে বাউলগানে রাধাকৃষ্ণ, শিবশিবাণী, মায়া ব্রহ্ম, বিষ্ণু লক্ষ্মী প্রভৃতি পুরুষপ্রকৃতির প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে, মুসলিম প্রভাবে তেমনি মোকাম, মঞ্জিল, লতিফা, সিরাজ, মনুরায়, আল্লাহ্, কাদের গণি, রসুল রুহ, আনাল হক, আদম হাওয়া, মুহম্মদ খাদিজা, আলি ফাতিমা প্রভৃতি প্রতীকী রূপক গৃহীত হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পৌরাণিক উপমা ও কোরআন হাদীসের বাণীর নানা ইংগিত। সবপ্রকার সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি পরিহার ক'রে যে মিলন ময়দান তারা তৈরি করল, তাকে সার্থক ও স্থায়ী করার জন্য পরমাত্মা বা উপাস্যের নামেরও এক সার্বজনীন পরিভাষা তারা সৃষ্টি করেছে। তাদের ভাষায় পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর বা সচ্চিদানন্দ হচ্ছেন মানুষ, অটল মানুষ, সহজ মানুষ, অধর মানুষ, রসের মানুষ আলেখ সাঁই, অচিন পাখি, মনুরা প্রভৃতি।

লালন নিঃসন্দেহে বাউল কিন্তু লালশশী বা কুবির অবশ্যই বাউলপন্থী নন। অথচ তিনজনের গানে উপরে উল্লিখিত শব্দ ও প্রতীকগুলি ব্যাপকভাবে রয়েছে। পরস্পর এই গ্রহণধর্মিতার জন্য লোকধর্মের গানগুলি কখনও কৃত্রিম বা একঘেঁয়ে হয়নি। গ্রহণ তো জীবনেরই ধর্ম।

বাংলায় সুদীর্ঘকাল প্রচলিত সহজসাধনা বা সহজভজনা সাহেবধনী সম্প্রদায়েরও অনুমোদন পেয়েছে। গৌরাঙ্গকে তারা উপাস্য বলে মানে তবে

সহজসাধকরূপেই তাঁর বিশেষ স্বীকৃতি। এই মতবাদের কেন্দ্রে যে অচিন, অটল বা, অলেক মানুষের, অনুসন্ধান, গোরাকে তাঁরা সেই অদেখা মানুষটির সদৃশ মনে করে। কুবিরের ভাষ্যে :

সহজ মানুষ গৌর গুণমণি সহজ সাধ্য রাধা ঠাকুরাণী।
সহজ ভাব প্রকাশিয়ে রূপ মিশাইয়ে
আছেন লুকাইয়ে চিন্তামণি।
মাধুর্যভাবেতে ভোরা সহজবস্তু নবগোরা॥

এখানে গৌরাঙ্গ রাধা সব একাকার হয়ে গেছে। আর সহজভাব প্রকাশ ক'রে যে চিন্তামণির গূঢ় অনতিব্যক্ত উল্লেখ তিনিই কি সাহেবধনী ?

যাইহোক, বিশেষ এক সহজচেতনা থেকে কুবির এমন সব গৌরপদ লিখেছেন যার ভাবগত মৌলিকতা ও প্রকাশভঙ্গীগত সারল্য এক বিশেষ আবহ তৈরী করে। লক্ষ করলে দেখা যায় বাংলার বৈষ্ণব কবিকুল যেসব গৌরপদ রচনা করেছেন তার একদিকে আছে গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসগ্রহণে শচীমা-র আর্তি ও নবদ্বীপবাসীর বেদনার বর্ণনা আরেকদিকে আছে তাঁর ভক্তিপ্রেমঅর্পিত চিত্তের রূপোজ্জ্বল সন্নিবেশ। 'আজ হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপচন্দ্র'—গোরা রূপ দর্শনের এই উচ্ছ্বসিত তন্ময়তা ও অভিভূত ভাব গৌরপদগুলির প্রধান উপাদান। সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গের বৈরাগ্যবিধুর অঙ্গকান্তির নান্দনিকতা অথবা ভক্তদের প্রতি তাঁর করুণাঘন প্রেমময় মূর্তি বাঙালী মহাজনদের উপজীব্য। যেমন দেখা যাক নয়নানন্দের একটি পদ :

গোরা মোর গুণের সাগর।
প্রেমের তরঙ্গ তার উঠে নিরন্তর॥
গোরা মোর অকলঙ্ক শশী।
হরিনাম সুধা তাহে ক্ষরে দিবানিশি॥
গোরা মোর হিমাদ্রি শিখর
তাহা হৈতে প্রেমগঙ্গা বহে নিরন্তর॥

এ-পদাংশ প্রকাশের চমৎকারিত্বে মনোহর, বিশ্বাসে সুনিবিড় কিন্তু গৌর সম্পর্কে কবির কেমন যেন এক সসম্ভ্রম দূরবর্তীভাব। তার কারণ, বৈষ্ণব কবির অন্তঃশীল দ্বৈতবাদের বোধ, যা মহাপ্রভুর ঐশ্বর্যভাবকেই বড় ক'রে দেখায় আর নিজেকে রাখে সম্বৃত গোপনতায়। গোবিন্দদাস সেই যে প্রসিদ্ধ আক্ষেপোক্তি করেছিলেন: 'তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত/গোবিন্দদাস রহু দূর'—কথাটি যেন

সামগ্রিক বৈষ্ণব গৌরপদগুলি সম্পর্কেই সত্য। কুবির গোঁসাই দীক্ষিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত নন বলেই গৌরাঙ্গকে তিনি অমন দূর থেকে দীননয়নে দেখেন না। বরং সমুজ্জ্বল আনন্দে দৃপ্ত স্বীকৃতিতে তাঁর ঘোষণা :

চেয়ে দেখতে পাই গৌরময় সকলি।
আমার চাঁদ গৌরবসন গৌরভূষণ
গৌর নয়নপুত্তলি॥
চাঁদ গৌব আমার দেহের জীবন
গৌর যৌবনের ডালি॥

এখানে কোনো আলংকারিতা নেই, নেই তাত্ত্বিক নিয়মসম্মত সম্ভ্রম। উলটে গৌরকে 'দেহের জীবন' বা 'যৌবনের ডালি' বলার মধ্যে যে-সাহস ও প্রেমের শক্তি তা লৌকিক জীবনের তারক রস থেকে সমাহৃত। গানের বাকি অংশে কবিব সঙ্গে গৌবাঙ্গের সংস্পর্শ (অবশ্যই নারীভাবে কবি নিজেকে দেখিয়েছেন) আরও সাধ্বস ও সমর্পণে ভরে ওঠে :

গৌর আমার নয়নতারা
গৌরচন্দ্র গগনচন্দ্র চাঁদে চাঁদ ভরা।
গৌর মনোহরা রূপ দেখে ভুলি—
চাঁদ গৌর আমার জপমালা গৌর গলার মাদুলী॥

জপমালা আর মাদুলীর গ্রামীণ উল্লেখ থেকে আরও উত্তরণ ঘটে এ গানের পরবর্তী অংশে

আমি গৌরগহনা গায়ে দিয়ে ধীরে ধীরে পা ফেলি।
গৌর চাবকী কোমরবেড়া হায় কী শোভা মনলোভা
গৌর চাঁদচুড়া আমার বুকজোড়া গৌর পাচনরী।

এত সব দামী অলংকারের সঙ্গে গৌরকে মিলিয়ে শেষপর্যন্ত কুবিরের শান্তি আসেনা যতক্ষণ না জাগে এই আন্তরিক উচ্চারণ যে,

গৌর আমার শঙ্খ শাড়ি।
গৌর মালা পুঁইচে গলা চুল বাঁধা দড়ি—
দুই হাতের চুড়ি গৌর কাঁচুলি॥

এর পাশাপাশি ঠিক একই গৌরনাগরীভাবে লেখা গোবিন্দদাসের একটি পদাংশ তুললে কুবিরের স্বচ্ছ দৃষ্টির আন্তরিকতা বোঝা যাবে। 'গোবিন্দদাসের' বর্ণনায় :

দেখ দেখ নাগর গৌর-সুধাকর-জগত-আস্বাদনকারী।
নদীয়া-গুরুবর-রমণী-মণ্ডল-মণ্ডন-গুণমণিধারী ॥

শব্দ ও অলংকারের দাপটে এখানে গৌরাঙ্গকে খুঁজে পাওয়াই কঠিন। এইপ্রসঙ্গে 'গৌরনাগর' ভাবের আরেক কবি বাসুদেব ঘোষের একটি সরল ভঙ্গীতে লেখা পদ দেখা যেতে পারে :

গোরা-রূপ লাগিল নয়নে।
কিবা নিশি কিবা দিশি শয়নে স্বপনে ॥
যে দিকে ফিরাই আঁখি সেই দিকে দেখি।
পিছলিতে করি সাধ না পিছলে আঁখি ॥
কি খেনে দেখিলাম গোরা কি না মোর হইল।
নিরবধি গোরা রূপ নয়নে লাগিল ॥
চিত নিবারিতে চাহি নহে নিবারণ।
বাসু ঘোষ কহে গোরা রমণীমোহন ॥

এখানে বর্ণনার নিরক্ত বিবর্ণতা ও প্রথাগত একঘেয়েমি আমাদের কোন নতুন উপলব্ধির জগতে পৌছে দেয় না। প্রথা ও প্রচলনের এই একঘেয়েমির কারণ কবির 'গৌরনাগর তত্ত্ব' সম্পর্কে অতিমনস্ক সংস্কার। কুবির গৌরনাগর তত্ত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে লেখেন নি বলেই গৌর সম্পর্কে নারীজনোচিত আবেগ আকুতি ও ভাষাভঙ্গী সহজে ফুটিয়েছেন। যেমন,

হায় গো আমার কি হ'ল।
গৌরকে ভুলতে নারি ও নাগরী
একবার হেরে পরাণ গেল ॥
গৌর আমার গৌরব ঘুচালি
কপালেতে এই ছিল ॥
কাউরে বলতে নারি মরি দম ফেটে
গৌর বলে প্রাণ কেঁদে উঠে—
আমায় দিয়েছে কি প্রেমের ছিটে
একবার হেরে কুল গেল ॥

যদিও নবদ্বীপ থেকে বৃত্তিহুদা খুব দূরে নয় কিন্তু তাই বলে কুবির গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম অনুমোদিত 'গৌরনাগর তত্ত্ব' জানতেন এ অনুমান হয়ত অতিকল্পনার পর্যায়ে পড়ে। তবে গানের পরিবহণ যেহেতু মানুষের কণ্ঠে তাই কুবিরের

কোনো গানে যদি নবদ্বীপের গৌরনাগর গানের আদল এসে যায় তবে তা আকস্মিক সন্নিপাত বলেই মেনে নিতে হবে। এখানে সেরকম একটি গানের নমুনা দেখানো যেতে পারে। প্রথমে দেখা যাক বিশুদ্ধ গৌরনাগর ভাবের একটি পদ, যার বিষয়বস্তু হল নিদ্রাবেশে কুলবতী বধুর স্বপ্নে গৌরাঙ্গের আবির্ভাব ও তজ্জনিত মানসিক বৈক্লব্য।

করিব মুই কি করিব কি
গোপ্ত গৌরাঙ্গের প্রেমে ঠেকিয়াছি ॥
দীঘল দীঘল চাঁচর কেশ রসাল দুটি আঁখি।
রূপে গুণে প্রেমে তনু মাখা তনু দেখি ॥
আচম্বিতে আসিয়া ধরিল মোর বুক।
স্বপনে দেখিনু আমি গোরাচাঁদের মুখ ॥
বাপের কুলের মুই ঝিয়ারি।
শ্বশুরকুলের মুই কুলের বৌহারি ॥
পতিব্রতা মুই সে আছিনু পতির কোলে।
সকল ভাসিয়া গেল গোরাপ্রেমের জলে ॥

এই গানের অসম্বৃত উচ্ছ্বাস আগাগোড়া তত্ত্বে ঢাকা। গোরাচাঁদের প্রতি কুলকামিনীর স্বপ্নে যে-আসঙ্গলিপ্সা তা অপ্রাকৃত লোকের। বাপের কুল, শ্বশুর কুল ও পতিব্রতা শব্দ তিনটি বৈষ্ণব পদাবলীর চিরকালীন সংস্কার ভাণ্ডার অনুষঙ্গে ব্যবহৃত। এ গানের তত্ত্ব হ'ল পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার অদম্য অপ্রতিরোধ্য টান। তাতে রয়ে গেছে এক ঐশী ব্যঞ্জনার ঊর্ধ্বচারিতা। এর পাশে দেখা যাক ঐ একই প্রসঙ্গে কুবিরের লেখা গান, যাতে তত্ত্বের কাঠিন্যের বদলে পাওয়া যায় জীবনধর্মের সরস আস্বাদরূপ :

গৌর কল্যে কি গুন গো নাগরী
ঘরেতে মন থাকেনা প্রাণ থাকে না
মান থাকেনা কি করি।
করি ঘরে বসে গুমুর গুমুর
মনাগুণে গুমরে মরি ॥

মনে হয় হেরবো না তাই ঘুমিয়ে থাকি
মুদে আঁখি দেখি গৌরময়।
আমায় জাগায় তোলায় হাত ধ'রে

বলে 'উঠ ধনি ও রঙ্গিনী অঙ্গে অঙ্গ শর্বরী' ॥

গৌর আমার ঘুরছে মনে নয়নকোণে
গৌর গোপনে এ তিনভুবনে গৌর রূপ হেরি।
হেলে তুলে হৃদ্‌কমলে ব'সে করে মন চুরি।
গৃহকর্মে থাকি ভুলে গৌর এসে কথা বলে
চলো বিরলে আনন্দ করি ॥

এই পদের বাচনে অনুভবের সততা মনকে নাড়া দেয়। তত্ত্ব সচেতনতা নেই বলে এখানে কুলশীলের প্রসঙ্গ অনুচ্চারিত। হঠ পরিবর্তনের বদলে এখানে স্নিগ্ধ প্রেমোচ্চারণ, 'উঠ ধনি ও রঙ্গিনী অঙ্গে অঙ্গ শর্বরী' এক মধুর স্বপ্নাবেশ রচনা করে। 'চলো বিরলে আনন্দ করি' চমৎকার অনুভবের গীতবাণী। এখানে উল্লেখ কথা প্রয়োজন, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি কোন তত্ত্বদর্শন শিরোধার্য করে তাঁদের গান লেখেন নি ব'লে কাব্য হিসাবে সেগুলি আন্তরিক ও গভীর। গৌরনাগর পদে এর বিপরীত ব্যাপার। সেগুলির পূর্বারোপিত তত্ত্ব সচেতনতা কবিসত্তাকে উন্মোচিত হতে দেয়নি। তাই 'নাগরী চকোরী-গৌরচন্দ্র সুধাপানে গৌরগতপ্রাণা' এমন কষ্টকল্পিত বিশ্বাস থেকে উৎসারিত যে-আর্তি তাতে আন্তরিক আবেগের সৎ উচ্চারণ কই? সে সব কৃত্রিম পদে কবিব্যক্তিত্ব বৈষ্ণব ভক্তের তত্ত্বাশ্রয়ের বেড়া ভাঙতে পারেনি। অথচ সমান্তরালে কুবিরের গানে পাই উদ্দাম দেহসমপর্ণের লৌকিক আবেগ :

গৌর ধরবো গো পেতে প্রেমসন্ধি কল।
হৃদয়ে রাখবো বেঁধে প্রেমফাঁদে ক'রে দার্ঢ্য ভক্তিবল ॥
কুচগিরি চাপিয়ে বুকে
বাঁধবো গো তায় ভুজলতায় মনের কৌতুকে।
আনন্দসুখে প্রেমেতে বিভোর
মনের সাধ মিটাবো আলিঙ্গনে
প্রেমে করবো ঢলাঢল ॥

মন হয়েছে গৌরগত
ভুলতে নারি রূপমাধুরী জনমের মত
লয়ে আশ্রিত সতত চঞ্চল ॥
যত্ন করে গৌরচাঁদে

মন দিব তায় প্রাণ দিব তায় ভুলাবো কেঁদে।
চাঁদে চাঁদ বেঁধে রাখবো অনর্গল ॥

এখানে একজন লৌকিক সামান্য নারীর বাসনার চোখে গৌরাঙ্গকে আঁকা হয়েছে। তার দেহগত কামনা, আলিঙ্গনের সুতীব্র ফাঁস, আবার সেই সঙ্গে মনপ্রাণ সমর্পণের আন্তরিক ইচ্ছাটুকুও সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়ে ওঠে। এ তো ভক্ত বৈষ্ণব কবির তত্ত্ব অনুমোদিত বিনত গৌরাঙ্গভজন নয়, এ গানে উত্তাল হয়ে আছে গৌরগতপ্রাণা মানুষীর সমর্পণের আনন্দ। আসলে কুবির গোঁসাইয়ের কবিমানসের অন্তস্তলে ছিল সরল ভক্তি-বিশ্বাসের ছাঁদে-গড়া সেকালের এক ধার্মিক বাঙালী। শাস্ত্রছুট, কোরান পুরাণ অস্বীকার-করা এক লৌকিক গৌণধর্মের শরিক সাধক তিনি। গুরুবাদে তাঁর প্রবল মতি। মানুষের প্রতি অগম্য বিশ্বাস। রাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গসেবিত পল্লী বাংলার সরল দেশজ গ্রাম্যরূপ পাওয়া যায় তাঁর গানে। সেইজন্য তাঁর গানের স্বভাব ও আঙ্গিকে তাত্ত্বিক বৈষ্ণব ধারার প্রভাব না খুঁজে, দেখতে হবে দেশজ কৃষ্ণ-কথার অনাহত ঐতিহ্যের ধারা। এ ব্যাপারে তাঁর পূর্বসূত্র বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', কবিশেখর রায়ের 'গোপালবিজয়' ও ভবানন্দের 'হরিবংশ'।

'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' বইতে অধ্যাপক সুকুমার সেন সিদ্ধান্ত করেছেন বাংলার বৈষ্ণব সৃজন-সাহিত্য সম্পর্কে এই রকম যে,

> রাধাকৃষ্ণের প্রেমসম্পর্ক সমাজবিধি বিগর্হিত। এইজন্য জনসমাজে রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর সমাদরে খানিকটা বিপদের সম্ভাবনা অবশ্যই ছিল। এই বিপদ এড়াবার জন্যে এবং কথ্যভাবাশ্রিত লৌকিক কাহিনীকে সর্বভারতীয় জনসমাজের অধ্যাত্মসাধনায় গ্রহণীয় করবার জন্য অগ্রণী হয়ে রূপ গোস্বামী সংস্কৃত শাস্ত্রের মঞ্জুষার মধ্যে রাধাকৃষ্ণ কাহিনীকে তত্ত্ববস্তুরূপে ভরে দিলেন। এ গোস্বামী শাস্ত্রে হ'ল একাধারে আলংকারিকের রসব্যাকরণ এবং ভক্তি-পথিকের হরিলীলাস্মৃতি। রূপ গোস্বামী ও তাঁর ব্রজবাসী সহযোগীদের দ্বারা গৌড়ীয় ধর্ম ভারতের সর্বজনগ্রাহ্য রূপ নিলে বটে কিন্তু বাংলা সাহিত্যের পক্ষে তার ফল খুব ভাল হ'ল না। বৈষ্ণব কবিরা প্রায় সকলেই রূপ গোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' অনুসারে লীলা বর্ণনা করতে লাগলেন। যাঁরা করলেন না তাঁদের রচনা উপরের সমাজের গ্রাহ্য হ'ল না। তাই তাঁদের রচনা ক্রমশ গ্রাম্যত্বের গর্তে নেমে গেল। তাতে পদাবলীতে আগে যেটুকু স্বাধীন স্ফূর্তির অবকাশ ছিল তা নষ্ট হ'ল।

গতানুগতিকতার প্রশ্রয় চলল। এইভাবে সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে পদাবলীর দ্রুত অবক্রমণ শুরু হ'ল।

সাহিত্যতাত্ত্বিকের দ্যোতনাময় মন্তব্যে এই কথা স্পষ্ট হয় যে, রাধাকৃষ্ণকে ঘিরে কথ্যভাবাশ্রিত একটি কাহিনী আগেই ছিল। গোস্বামীরা তাতে তত্ত্বাদর্শ সংক্রমিত করে উচ্চমার্গে তুলে দেন। যে-লৌকিক অংশটুকু রয়ে যায় তা ক্রমশ গ্রামান্তে বলয়িত হতে থাকে। বাংলার লোক-ধর্ম এই বর্জিত কৃষ্ণকথার লোকনিরুক্তি থেকে গড়ে তোলে এক নতুন গল্প। এ কাহিনীর একটা অংশ কলকাতাকেন্দ্রিক কবিগানে রূপ পেল, আরেক অংশ দাশুরায়ের পাঁচালিতে নানা কথা ও কাহিনীতে পল্লবিত হয়ে উঠল। (আঠারো উনিশ শতকের সাহেব-ধনীদের গানে আমরা যে কৃষ্ণ-কথা পাই তা যেমন লোককল্পনায় ঝলমলে তেমনই প্রকাশের নাট্যধর্মিতায় আকর্ষণীয়।) যাদুবিন্দুর বেশিরভাগ পদ দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড ও মানবিষয়ক কিন্তু তার উপমা সংলাপ ও রচনারীতি অন্যরকম। এখানে স্বতন্ত্রভাবে দেখানোর মত একটা গানের উদাহরণ রয়েছে। নিচে উদ্ধৃত সাহেবধনীদের গানটি ভাষা রূপবন্ধ ও শব্দবিন্যাসে অভিনব :

ছিলে ধেনুর রাখাল চরাতে ধেনুর পাল
ফেরা ধেনু বাজিয়ে বেণু হয়েছ নবীন ঘাটোয়াল ॥
এবে যমুনাতে দান সাধোয়াল
বেণুবনে রাইরাজা যখন হয়েছিল তার কোতুয়াল ॥

আমরা ব্রজের ব্রজাঙ্গনা লয়ে দুগ্ধ মাখনছানা
মথুরাতে যাই দুলুয়াল ॥

এখন যাও বটে যমুনার ঘাটে
নটের গুরু প্রেম মাতোয়াল ॥
কালা ত্যেজিয়ে বাঁশরী খেতে মাখন চুরি করি
রাখালী করতে করতে গাভী দোহয়াল ॥
এখন কাণ্ডারী হয়েছ হরি বাঁশরী করে ধরি কেরয়াল ॥

কত রঙ্গ জানো কালা ছেড়েছ কদমতলা
দান সাধ দুবেলা ব্রজ গোপয়াল।
কুবির বলে শীঘ্র পার করে দাও
রাধা নাম করি জপয়াল।

এ গানে শুধুই কি অন্তমিল নিয়ে শব্দের খেলা? সেই সঙ্গে লৌকিক কৃষ্ণকথার টুকরো টুকরো গল্প কেমন চমৎকার বিন্যাসে গাঁথা সেটাও তো দেখবার।

শেষ সিদ্ধান্তে একথা স্পষ্ট যে, সাহেবধনীদের গানে কৃষ্ণকথা বা গৌরাঙ্গ-বিষয়ক প্রসঙ্গ যেভাবে উঠে এসেছে তা খাঁটি দেশজ ধারা থেকে সমাহৃত। তবে বড়ু চণ্ডীদাস এ কাহিনী যেমন অনাহত মাটি-মাখা রূপে পেয়েছিলেন তাঁর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে, কুবির-যাদুবিন্দু তা পাননি, কেননা ইতিমধ্যে চৈতন্যচন্দ্রোদয় ঘটে গেছে। তবু স্মরণীয় যে উনিশ শতক থেকে বাংলার নাগরিক সংস্কৃতির যতই উন্নয়ন ঘটুক, মানুষ যতই পাক উন্নত সভ্যতা ও শিক্ষার স্পর্শ তবু তখনও গ্রামে-গাঁথা বাংলার নিভৃতে সরল পল্লীবাসীরা বুকে ক'রে রেখেছিল আরেক ধরণের বিশ্বাস আর কল্পকথার আশ্চর্যজগৎ। সম্পূর্ণ Folk motif-দিয়ে-গড়া সেই কল্পকথার নায়ক শ্রীকৃষ্ণ। এ কাহিনীতে বাৎসল্য মান নৌকাবিলাস বস্ত্রহরণ কংসবধ কুবজাপ্রেম কৃষ্ণকালীতত্ত্ব এসবই প্রাধান্য পেয়েছে। পূর্বরাগ অভিসার প্রেমবৈচিত্ত্যজাতীয় সূক্ষ্ম শাস্ত্রনির্দেশিত প্রতীকী পর্যায়গুলি নেই। লালন, কুবির বা যাদুবিন্দুর একটি পদেও সূক্ষ্ম শাস্ত্রনির্দেশ নেই। বরং প্রথম ধারাটিই উচ্ছলিত। এখানে এমন একটি গান বিশ্লেষণ ক'রে তার Folk motif-টুকু দেখানো যায়। যেমন বংশীতত্ত্ব। প্রথমেই বলা ব'ল :

> বাঁশির জন্ম সুধা সমুদ্দুরে।
> সেই বাঁশি ব্রহ্মা এনে ব্রহ্মজ্ঞানে।
> দিলেন কৃষ্টের করে ॥

বাঁশির এই অভিনব জন্মবৃত্তান্ত নিতান্তই লোকনিরুক্তিজাত তাই গ্রাম্য শ্রোতার পক্ষে বিশ্বাসজনক। লৌকিক গানে 'ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর', 'যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ফণীন্দ্র', এমন সব নাম গীতিকার অনায়াসে গানে গেঁথে দেন কোন গাম্ভীর্য না রেখেই। এমন অনায়াসে এবারে তাই বলা হয় এই বাঁশি নিয়ে 'কৃষ্ট' কি করলেন। তিনি ঐ বাঁশি,

> বাজিয়ে কুলবতীর কুল মজালে
> আকর্ষণ মন্ত্ররে ॥

কিন্তু এই কৃষ্ণ তো নিছক বংশীবাদক নন, তাই ক্রমে তাঁর মধ্যে ফুটে ওঠে ভাব-সাধকের বিগ্রহ।

> রাধামন্ত্র উপাসনা হয়ে
> জপে তাই ঘাটে মাঠে গোঠে গিয়ে

বাঁশরী বাজাইয়ে

কালা ভাল তন্ত্র শিখেছে এক ফুটো যন্ত্র লয়ে ॥

কুলবতীর কুলমজানো যন্ত্র সেই বাঁশিটি কখন যে রাধামন্ত্র উপাসনার উপাদান হয়ে যায় তা অবশ্য খেয়াল থাকে না। কেননা ইতিমধ্যে কবির মনে জেগেছে অন্য এক গুরুতর প্রশ্ন :

বাঁশির সপ্তছিদ্র কে করেছে

সা রে গা মা সাধিতে ?

কোন্ খানেতে পেলে বাঁশ

তার কত পাব ছিল বাঁশি কোন্ পাবে হ'ল ?

গানটি শুনতে শুনতে মনে না হয়েই পারে না যে, এই প্রশ্ন কবির না রাধার ? অবশ্য এর পরেই বলা হয়েছে :

অবলা জানিনে আমরা রাগরাগিণীর নাম

বাঁশির জ্বালায় মলাম।

রাগে রাগে রাগ হারালাম

বৈদিক রাগে বয়ে গেলাম ॥

'রাগে রাগে রাগ হারালাম' উল্লেখের কূটাভাসে ব্যক্ত হয়েছে রাগানুগা সাধনার কথা। সে কথা আরও স্পষ্ট হয় 'বৈদিক রাগ' কথার উল্লেখে। এখানে বৈদিক বলতে বোঝানো হয়েছে শাস্ত্রানুমোদিত 'বৈধী' মার্গের কথা। কাজেই খুব সুনিশ্চিতভাবে অথচ নিগূঢ় উচ্চারণে বাঁশির জন্ম থেকে বাঁশির আহ্বান পর্যন্ত ফুটে ওঠে এই চমৎকার গানটিতে। নির্মাণের কৌশলে সাহেবধনীদের নিজস্ব রাগসাধনার অনুষঙ্গ এসে যায়। এইভাবেই কৃষ্ণরাধার রূপক কখন অলক্ষে লৌকিক ধর্মদর্শনের অন্তরঙ্গে ডুবে যায়, বাঁশির সুরে আভাস জাগে অসীমের। কুবিরের দ্বিচারী ভাবনার যুগ্মতা আমাদের সামনে মেলে ধরে বৈষ্ণবতার দুটি আলাদা পরিপ্রেক্ষিত। একটিতে ধরা থাকে বাংলার আবহমান দেশজ কৃষ্ণকথার মহিমা, আরেকটিতে ফুটে ওঠে সাহেবধনী মতবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত কৃষ্ণরাধা গৌরাঙ্গের নতুন ভাষ্য। আমরা মানতে বাধ্য হই যে, সেই ব্রজধামের কর্তা যিনি তিনিই এখানে নামান্তরে সাহেবধনী। অর্ধনারীশ্বরের মত এই মতবাদের একদিকে ইসলাম আরেকদিকে বৈষ্ণব সহজিয়াদের যুগল সমন্বিত এক ব্যাপক চিদাকাশ জেগে ওঠে। সেখানে একইসঙ্গে উদ্ভাসিত হয় মরমী সাধনার অতল রহস্য এবং দেহধর্মের তাল।

'আমার দুখের কথা রইল গাঁথা'

সাহেবধনীদের গান উনিশ শতক থেকে সূচিত হয়ে বিশশতক পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে গেছে কেননা এই গানের ধারায় শেষ গীতিকার যাদুবিন্দু গোঁসাই দেহ রেখেছেন ১৯১৬খ্রীষ্টাব্দে। কুবির থেকে যাদুবিন্দু যেমন দুই শতাব্দীর প্রসারণ, তেমনই এঁদের দুজনের গানের বিষয় ও আঙ্গিকও লোকোত্তর থেকে লোকায়তের দিকে পরিব্যাপ্ত। এর কারণ যাদুবিন্দুর বাড়ি ছিল বর্ধমান জেলায় পাঁচলখি গ্রাম, যার একদিকে নবদ্বীপ আরেকদিকে কালনা শহর। পাঁচলখির পাঁচমাইলের মধ্যে সমুদ্রগড় রেলস্টেশন। যেখান থেকে ট্রেনে চাপলে তিন চার ঘণ্টায় কলকাতা যাওয়া যায়। পথে পড়ে অম্বিকা কালনা গুপ্তিপাড়ার মত সমৃদ্ধ প্রাচীন জনস্থলী। জলপথে শান্তিপুরও খুব কাছে। আশ্চর্য কি যে, যাদুবিন্দু লিখবেন নবদ্বীপ সম্পর্কে গান? অথবা গুপ্তিপাড়া শান্তিপুর কালনা এমনকি কলকাতা হবে তাঁর গানের সাংকেতিক প্রতীক? খুব কি অবাক লাগবে যখন তাঁর গানে মানবদেহকে রেলগাড়ির রূপকে গেঁথে নেবেন?

এরসঙ্গে যাদুবিন্দুর ছিল স্বচ্ছ একটি মন এবং চমৎকার সাবলীল লিখনশৈলী। শব্দের উপর অনায়াস অধিকার ও স্বাভাবিক ছন্দবোধ তাঁর গানকে বিপুল জনপ্রিয় করে তোলে। আমি দীর্ঘদিন যত বাউল বৈরাগীর মেলায় গেছি এবং যত বাউলের গান শুনেছি সর্বত্র যাদুবিন্দুর গান বহমান দেখেছি। এর বড় কারণ যাদুবিন্দুর রচনাশক্তির সৌন্দর্য ও উপমা রূপক নির্মাণের স্বাভাবিকতা। একটা গানের কয়েকটি অংশ তুলে কথাটা বোঝানো সহজ হবে। সহজিয়া দেহসাধনায় শান্তি পাবার পথ হল গুপ্ত মার্গ। কথাটা যাদুবিন্দু এইভাবে বলেন যে,

> আগে গুপ্তিপাড়া ছাড়া রে মন
> তবে শান্তিপুরে যাবি।
> সদা আনন্দে রবি॥

সত্যিই তো গুপ্তিপাড়া আর শান্তিপুর খুব সন্নিহিত দুটি স্থান। তাই ভৌগোলিক স্থানগত অবস্থানকে এমন সাধনার রূপক হিসাবে ব্যবহার যেমন চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করে তেমনই সাধারণ শ্রোতার রসবোধের অনুকূল হয়। ঐ

একই গানে নবদ্বীপের গঙ্গার পরপারে অবস্থিত স্বরূপগঞ্জ জায়গাটিকে কায়া-সাধনার রূপকে বলা হয়েছে :

গোঁসাই কুবিরচাঁদ রটে ঐ নদীর নিকটে
স্বরূপগঞ্জে বাস করিলে সন্দ যায় মিটে।

এখানে স্বরূপগঞ্জ বলতে আত্মবোধ বা দেহসন্ধির কথা বলা হয়েছে আর নদী মানে ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্নার যোগ। গানের একেবারে শেষে বলা হয় নবদ্বীপ (যার আরেকনাম নদীয়া) প্রসঙ্গ, বিশেষত সেখানকার বহু অলিগলির কথা। এই অলিগলি চেনা মানে দেহের অজস্র নাড়ি সম্পর্কে জ্ঞান। সেই কথাটা যাদুবিন্দু বলেন আধোরহস্যে মুড়ে :

শোন্ যাদুবিন্দু বলি চিনে নে নদীয়ার গলি
তবে তো শান্তিপুর যাবি ॥

এইবারে গানের বুননে ভেতরের সংকেত চমৎকৃতিতে ভরে গেল, তার অন্তস্তলে নির্মাণের গভীর সুষমা।

এইভাবেই যাদুবিন্দু কলকাতাকে দেখতে পান মানবদেহের রূপকে। 'মানবদেহ-কলকাতার কেতা চমৎকার' গানে লালদিঘির জল, বউবাজারের কাম এবং বাগবাজারের উল্লেখ নিতান্ত সাংকেতিকতায় ভরা। অপেক্ষাকৃত সহজ-বোধ্য অংশ হল :

কলকাতার বাহান্ন বাজার ও তার তিপান্ন গলি
হাত ধ'রে ঘাড় মুচড়ে ভেঙে দেয় নরবলি।
ও নামে সোনাগাছি মানিকতলা
জোড়াসাঁকো আচ্ছা বাহার।
কেতা চমৎকার ॥

এখানে সোনা মানিক আর সাঁকোর সম্পূর্ণ কূট সাধনতাত্ত্বিক অর্থ গানে অপূর্বনৈপুণ্যে গাঁথা আছে।

কিন্তু যাদুবিন্দু যখন লেখেন, 'মানবদেহ রেলগাড়ির খবর কর মন' তখন বৈজ্ঞানিক সত্যের সঙ্গে যোগ হয় নতুন এক মাত্রা। এ গানের পরতে-পরতে অভিনব চিন্তনের সৌন্দর্য এবং লৌকিক গীতিকারের নিপুণ কল্পনাশক্তির অভিভব! প্রথমেই রেলগাড়ির পাশাপাশি যাতায়াতের দুটি লাইন সম্পর্কে বলা হয় :

এই গাড়ি চালাবার তরে দুই রাস্তা তৈরার।
যায় একপথে যমরাজার বাড়ি একপথে ভাবউদ্দীপন ।।

এরপরে মানবদেহরূপ রেলগাড়ির যাত্রার সময় ও চরমতীর্থপ্রাপ্তি সম্পর্কে বলা হল :

সাধুসঙ্গ করো ভাই ও সেই গাড়ি চাপা চাই
টাইম হ'লে দুয়ার খুলে পাবে খাসা ঠাঁই।
যাবে তীর্থ আশে নিত্য দেশে রসের নগর বৃন্দাবন ।।

রেলগাড়ির ফার্স্ট সেকেণ্ড ও থার্ড ক্লাশকে কায়াসাধনার তিনস্তর প্রবর্ত-সাধক-সিদ্ধরূপে কল্পনায় মধ্যে বেশ নতুনত্ব আছে :

গাড়ির প্রথম কেলাসে গিয়ে বেঞ্চিতে বসে
অল্প মানুষ সব সমতুল যায় নিজদেশে।
ও সে প্রবর্ত ধর্ম সত্য যাজন করিবার কারণ ॥

গাড়ির দ্বিতীয় কেলাস হয় উপর ঘরে বাস
সাধুসঙ্গে প্রেমতরঙ্গে পুরায় মনের আশ।
করেন কৃপাংকুর শিক্ষাগুরু নিজ বীজ করেন রোপণ ।।

গাড়ির তৃতীয় নম্বর ও ভাই সুখের নাইক ওর
রত্ন পেয়ে সিদ্ধ হয়ে যায় প্রাপ্তিনগর
আসবে না আর গাড়ির ভিতর গুরুকে দেহ অর্পণ ।।

রেলগাড়ির মধ্যেকার বহুরকমের যাত্রী নানাজাতের ও মতের সম্মিলনকে যাদুবিন্দু দেখেন তাঁর ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে মিলিয়ে এবং সহর্ষে লেখেন :

ও তার নেই দ্বেষাদ্বেষ বেশ দরবেশ সমান সব হিন্দু যবন।

এইপর্যন্ত পড়ে কেউ যদি ভাবেন যাদুবিন্দুর দক্ষতা শুধু রূপকনির্মাণে তবে ভুল হবে। একেবারে নিজস্ব দুঃখ বেদনা, দৈনন্দিন দারিদ্র্য ও গ্লানি প্রকাশ করার কাজে তাঁর লেখনী যেমন বলিষ্ঠ তেমনই নির্বিকার। গ্রাম্য কবি তাঁর দারিদ্র্যজর্জর জীবনযাপনে বিস্মিত হয়ে বলেন :

আমি সুখের নাম শুনেছিলাম দেখি নাই তার রূপ কেমন।
আমার দুখনগরে বাটি পরিবার দুঃখরাজার বেটি
দুজনায় দুঃখে করি কালযাপন ।।

এই বিস্মিত বেদনায় পরের স্তরে কবির একান্ত অভিলাষ ও তাঁর স্বপ্নভঙ্গ ব্যক্ত হয় এইভাবে,

মনে করি সুখের দেশে সুখী হয়ে থাকবো ব'সে
দুঃখুবেটা তাড়িয়ে এসে কেশে ধরে করে শাসন।
দুখের বেলা দুইপ্রহরে দুখের অন্ন করি ভোজন
দুখের শয্যা পেতে সন্ধ্যাকালে দুঃখেতে করি শয়ন।

এই মর্মস্পর্শী অতুলনীয় গানখানির শেষ কথা :

দুঃখু আমার মুক্তি গতি দুঃখু আমার সঙ্গের সাথী
হৃদয়ে জ্বলে দুখের বাতি দগ্ধ করে দিল জীবন।
আমার দুখের কথা রইল গাঁথা করবে কে তা নিবারণ॥

এ তো আমাদের ধন্যধান্য পুষ্পভরা দেশেরই প্রকৃত ছবি। বৈরাগ্যবিধুর জীবনদর্শনের দেশ আমাদের। অর্ধাহার আর অনাহারের টানাপোড়েনে জীবন থেকে উঠে আসা দুঃখ সান্ত্বনা পায় জীবনেরই উষ্ণতায়। তবু কোন অভিযোগ নেই, নেই বিপ্লব। এ যে বিধাতারই দান। তাই অতিভোজন আর অনাহার দুটোই সত্য আর স্বাভাবিক। গরীব কবি সার বুঝেছেন ;

কখনও দুগ্ধ চিনি ক্ষীর ছানা মাখন ননী
কখনও জোটে না ফেন আমানি—
কখনও আ-লবণে কচুর শাক ভখি।

যাদুবিন্দুর ধর্মমতের মূল উপাস্য দীনদয়ালের মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তিনি সর্বদর্শী ভগবানকেই দেখেন এবং সিদ্ধান্ত করেন :

ওহে দুখ দিতেও তুমি সুখ দিতেও তুমি
মান অপমান তোমার হাতে সুনাম বদনামী।

এর টানে টানে যাদুবিন্দু যে-সিদ্ধান্ত করেন তা রীতিমত চমকপ্রদ। ব'লে বসেন :

তুমি সর্বঘটে রও তুমি সর্বরূপ হও
ভালকথা মন্দ কথা সবই তুমি কও।
কহিছে বিন্দুযাদু তুমি চোর তুমি সাধু
তুমি এই মুসলমান তুমি এই হিন্দু॥

ঈশ্বরে সর্বস্পর্শিতা ও সাম্যভাব বোঝাতে গিয়ে শেষপর্যন্ত যাদুবিন্দু যে ধর্ম সমন্বয়ের চিন্তায় চলে আসেন তা অনেকটাই সাহেবধনী মতবাদের অন্তঃস্থ উদার টানে। কবিত্ব ছাপিয়ে উঠে আসে এক গভীর মানুষ। মানুষটিকে আমরা ভাল না বেসে পারি না।

যাদুবিন্দুর রচনার আরেক শক্তি সহজ কবিত্ব। কোন জটিল বিন্যাস বা রূপবন্ধে নয় তাঁর উচ্চারণ খুব সহজ ও অনায়াস। একটি গানে গৌরকে না পাবার যে আত্মধিক্কার তা ব্যক্ত করেছেন খুব আন্তরিকভাবে :

তুমি আমায় নিদয় হওনা সদয় পেরেছি তা জানতে।
ভবঘোরে বেড়াই ঘুরে সুখ পেলাম না তিলের তরে
মনের কথা বোলবো কি আর তোরে—
আমি পেলাম না প্রেমভক্তিলতায় তোর দুটি পায় বানতে ।

কিন্তু সবচেয়ে উপভোগ্য আর অভিনব হ'ল যাদুবিন্দুর গানের আত্মধিক্কারের অংশগুলি। খাঁটি বৈষ্ণবী বিনয়ে যাদুবিন্দু প্রত্যেক গানের শেষে ভণিতায় নিজের অকৃতার্থতা, অযোগ্যতা অথবা নির্বুদ্ধিতার কথা এমন ভাবায় বলেছেন যার উদাহরণ বাংলা গানে বিশেষ নেই। এখানে তেমন কিছু আত্মধিক্কারের নমুনা সাজিয়ে দেখানো যায় :

১ গোঁসাই কুবিরচাঁদের মুটে যাদুবিন্দু ভদরকুটে
হতভাগা যায় না সাধুর হাটে।
ও সে ফ্যানেভাতে পায় না খেতে পায়েস অন্ন চাচ্ছে ॥

২ গোঁসাই কুবির বলছে ঠিক বোকা যাদুবিন্দুর জন্মে ঠিক
ইষ্ট ত্যেজে কাষ্ঠ পূজে ॥

৩ এই যাদুবিন্দু বোঁচা
বুদ্ধি তার অতিশয় কাঁচা
গোঁসাই কুবিরচাঁদ বলে ।।

৪ যাদুবিন্দু ছুঁচো পেয়ে পেঁচো
প্যাঁচে পড়ে হয় মরণ ॥

৫ যাদুবিন্দু কানা ভাব জানেনা
চেনে না কুবির ধনে ॥

৬ গোঁসাই কুবির কহিছেন বারবার
যাদুবিন্দু ঢেঁকি ফাঁকিজুকি দেখলে না সাধুর বাজার ॥

৭ গোঁসাই কুবির বলে বিন্দুযাদু হাড়পেকে পাজী নিজে॥

৮ ও সে যাদুবিন্দু জুয়াচোর বৃথাই পরা কপ্নিডোর
আছে সেই বোকার কুঁড়ে পাঁচলখিতে ॥

গুরুর পদপ্রান্তে আত্মাবমাননার এই চরম দীনতা যাদুবিন্দুর উন্নত সাধক চরিত্রকেই ব্যক্ত করে। সেই সঙ্গে ঈর্ষণীয় তাঁর হীনার্থবাচক লৌকিক শব্দের পুঁজি। ভদরকুটে, উড়পেকে, বোঁচা, পেঁচো, ঢেঁকি, হাড়পেকে, উরোনপেকে, হাবাতে, ঠেঁটা, মূর্খমেড়া, কানা, ভেড়ুয়া এবং এমনকি জুয়াচোর। লৌকিক হীনার্থবাচক শব্দের উপর যাদুবিন্দুর এই অনায়াস অধিকার তাঁর ব্যাপক সমাজ অভিজ্ঞতাকেই প্রমাণ করে। তাঁর কোন কোন পদাংশ শহুরে লোক বুঝতেই পারবেন না শুধু বাচনের পরিভাষার জন্য। যেমন একটি ভণিতায় তিনি নিজের বাহ্য আড়ম্বর অথচ ভজনহীনতার ছবি এঁকেছেন এই ভাবে :

চেলুতি নাম বাড়ালি কুঁড়ো মেখে।

এ বাক্যের বিশিষ্ট অর্থ হ'ল কোন কোন কৃষিজীবী যেমন গায়ে কুঁড়ো মেখে মিথ্যে ক'রে বোঝায় যে তার গোলায় অনেক ধান, তেমনই যাদুবিন্দু বাইরে আচার আচরণ বড় ক'রে সাধনের জাঁক দেখাচ্ছেন। এ বাক্যের নিহিত অর্থ আমরা বুঝবো না, কিন্তু বুঝবেন কৃষিজীবী পল্লীবাসী এবং আনন্দ পাবেন। এইরকম আরেকটি ভণিতায় বলা হয়েছে :

কাঙাল যাদুবিন্দুর টোলো ডোঙা ডুবে মলো মাঝবেলায়।

এখানে টোলো ডোঙা বলতে অনির্ভরশীল সাধন-পথকে বোঝানো হয়েছে, যা যখন তখন বিনাশ পাবে।

এসব উপমা রূপক উঠে এসেছে নিবিড় জীবনদৃষ্টি থেকে। যে-জীবনের রস শোষণ করতে পারেনা উৎকট দারিদ্র্য, বরং বাড়িয়ে দেয় বৈপরীত্যের সীমা এবং দৃষ্টির তির্যকতা। এমনই তির্যকদৃষ্টি থেকে যাদুবিন্দু নবদ্বীপে ভ্রমণ করতে গিয়ে শ্রীবাস অঙ্গনে গৌরাঙ্গবিগ্রহ দর্শনের ব্যবসাদারি দেখে ফেলেন এবং লেখেন মনের খেদে :

ভাবছি তাই মনে শ্রীবাস অঙ্গনে
আটটি গণ্ডা পয়সা লাগে ঠাকুর দরশনে।
তারা পয়সার তরে ঠাকুর গ'ড়ে রেখেছে অনেকগুলো ॥

বিগ্রহবিরোধী এই সাহেবধনী বিদ্রোহী তাঁর গানে জানাতে ভোলেন নি যে বঙ্গাব্দ ১৩০০ সালে ঘোর আকালে বহু মানুষ মারা গেছেন :

সন তেরো শো সাল তিন পোয়া আকাল
অনেক মানুষ মরে পড়ল ছিঁড়ে মায়াজাল ॥

অথচ সেই দুর্বৎসরেও নবদ্বীপের বৈষ্ণব-সমাজ তাদের বিগ্রহ দেখিয়ে গরীব ভক্তদের কাছ থেকে দর্শনী আদায় করেছেন। ক্ষোভে বেদনায় ব্যঙ্গে যাদুবিন্দু লেখেন :

দেখ ভাই বুঝে নদীয়ার মাঝে
অনেক লোকের ঘরের ভিতর-ঠাকুর বিরাজে।
যাদের নেইকো কড়ি ঠাকুরবাড়ি
কিরূপেতে যায় বল ?

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের শোষণ সম্পর্কে সচেতন যাদুবিন্দু সমাজে টাকাকড়ির অপ্রতিহত ভূমিকা বিষয়েও সতর্ক ও সমীক্ষাপ্রবণ। তার প্রমাণস্বরূপ তুলে ধরা যায় আরেক গানের অংশ যেখানে স্পষ্ট বিদ্রূপের টানে তাঁর উচ্চারণ :

টাকায় দেবদেবী গুরুদেবাদি সর্বদা আনন্দে থাকে।
টাকা হলে স্বর্গের সিঁড়ি জগতে নেই টাকার জুড়ি—
পরমসুন্দরী নারী যত্ন ক'রে দেয় বুড়োকে।
ও সে সখের জামাই হোক না বুড়ো কথায় কথায় রয় বেঁকে ॥

বিদ্রূপ থেকে চকিতে যাদুবিন্দু চলে যান বেদনার বিহ্বলতায় যখন তাঁর মনে পড়ে বিবাহের পণপ্রথার প্রসঙ্গ। তখন গভীর খেদে তিনি বলেন :

বিয়ের কথাতে মাথা যায় ঘুরে।
শুনে পণাপণ কণ্ঠেতে আসে জীবন
হয় সোনার সঙ্গে মেয়ের ওজন
এত টাকা কার ঘরে ?
গোয়ালা চাষী সদ্গোপে
পণ শুনে পেট উঠছে কেঁপে
কতজনা নবদ্বীপে ভেক লয়ে কৌপিন পরে ॥

এই বেদনার পাশে একঝলক সরসতা উঁকি মারে যখন পাশাপাশি যাদুবিন্দু দেখান বিপরীত ছবি এইরকম :

মাছ ধরা কৈবর্ত দাসে মেয়ে হ'লে বেড়ায় হেসে
চারশো টাকা নেব ঠুসে জামাই বেটার কান ধ'রে।

ষষ্ঠী পাছে বাঁধবো ঢেলা ছোকরী মেয়ে হোক দুবেলা
ষোল টাকা বেচবো তোলা কোরবো না আর জাল ঘাড়ে ॥

একই সমাজে অর্থনীতির এমন অসমতা যাদুবিন্দুকে ভাবায়।

যাদুবিন্দুর গানে আরেকটা মৌলিকতার দিক পাওয়া যায় কৃষ্ণরাধাবিষয়ক রচনার সংলাপ নির্মাণে। তাঁর এ ধরণের বেশির ভাগ গান গ'ড়ে ওঠে মানিনী বা খণ্ডিতা রাধার জবানীতে। এই রাধা শাস্ত্রীয় মহাভাবস্বরূপিনী নন, ইনি গ্রাম্য নারী। স্বামী অন্য নারীর কাছে রাত্রিযাপন ক'রে ফিরলে গড়পড়তা গ্রাম্য নারী তাকে যে-ভাষায় সম্ভাষণ করে যাদুবিন্দু তাঁর গানে সেই বাচনটি তুলে ধরেছেন আশ্চর্য নিপুণতায়। অন্য নারীর দ্বারা ভুক্ত কৃষ্ণকে যাদুবিন্দুর রাধা বলে :

শুনবো না আর শ্যামের বাঁশি সাধ ক'রে হব না দুষি
ভাল জিনিস হলে বাসী নেয় না লোকে চক্ষে হেরে—
ও তার গন্ধ ছোটে বিঘ্ন ঘটে পচা ক্ষীর খেলে পরে ॥

এবং তার চেয়েও নির্মম উক্তি হ'ল :

কাল যেখানে ছিলে কালো সে রমণী রসিক ভালো
সর মোহে ননী তুলিল ঘোল ফেলে দিয়েছে দূরে—
আমি টোকো ঘোল নেব না সখী টাট্‌কা মাখনের দরে ॥

অন্য এক পদে যাদুবিন্দুর রাধা বিদ্রূপ ক'রে কৃষ্ণ ও চন্দ্রাবলীর মিলনকে উপমিত করে কানা বক আর শুকনো নদীর মিলনের সঙ্গে। এই উপমা গ্রাম্য কবির পল্লী পরিবেশ থেকে উঠে এসেছে। আঠারো উনিশ শতকের কলকাতায় কবিগানে একই প্রসঙ্গে এমন সজীব উপমা পাই না। কিন্তু বহুদর্শী গ্রাম্য গীতিকারের রচনায় জীবন থেকে-উঠে-আসা উপমার অভাব হয় না। যেমন রাধা সম্পর্কে যাদুবিন্দুর কৃষ্ণ দূতীকে বলে :

উষ্মা কোরো না দূতি নারীজাতি ভারি কু।
বুঝালে বোঝে নাকো রাঙের টেকো কথায় কথায় রয় বেঁকে।
নারীর অন্তরেতে গরল পোরা মিষ্ট কথা কয় মুখে
বিশেষ কথা রয় না পেটে জালার মত ফুলে ওঠে।

নারীজাতির সঙ্গে রাঙের টেকো বা জালার উপমা বয়নে এক সাবলীল নির্মাণের কুশলতা লক্ষ না ক'রে পারা যায় না। রাধাকৃষ্ণের এই উতোর-চাপান জমে ওঠে যখন রাধিকা কৃষ্ণকে ব'লে বসে, 'সরকারি নাগর উনি আমি তা বিশেষ

জানি'। 'সরকারি নাগর' এক অত্যাশ্চর্য বিশেষণ। এ পর্যায়ে শঠ কৃষ্ণ সম্পর্কে রাধিকার চরম উক্তি হ'ল :

ওকে দেখলে আমার ঘেন্না করে
বুক চিরে ওঠে বমি ॥
জগতের ভিতরে বাঁকা বংশীধর
সবাই বলে আমার বারোয়ারী ঘর।
ঘরে চন্দ্রাবলী থাক কিছুদিন শ্যাম প্রেমের প্রেমী—
কানাইলাল-ভুঁয়ে কষে চাষ দিয়ে
বীজ বুনেছে চন্দ্রাবলী শুভযোগ পেয়ে
আমি কোরবো না আর কাড়াকাড়ি ইস্তোক জমি ॥

এখানে রুচিদূষ্যতার গা ঘেঁষে যাদুবিন্দুর ভাষা ও বাচন চলে গেছে, কিন্তু যাকে বলে Rustic simplicity তা এই গানে দেখবার মত। প্রকাশভঙ্গীর কি তীব্র শক্তি। জমি চাষ, বীজ বোনা ও তার অধিকার নিয়ে যে-রূপকটি গাঁথা হয়েছে তা প্রায় অশালীন কিন্তু গ্রাম্য পরিবেশে স্বাভাবিক। কৃষিভিত্তিক গ্রামসমাজে জমির দখলীস্বত্ব বীজবোনা এসেবের আলাদা জ্ঞাপকতা থাকে এবং সেইজন্যই নারীর উর্বরা শক্তি আর জমির উর্বরতা এক উপমায় গাঁথা হয় সহজ সারল্যে। একে কোনভাবে অশ্লীল বললে প্রসঙ্গবিচ্যুতির দোষ ঘটে।

এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে যাদুবিন্দুর গানে যা পাই তা অশ্লীলতা নয়। স্বাভাবিক জীবনের সরল অভিজ্ঞতার সংকেত। নারীর জননাঙ্গকে গুপ্তিপাড়া বা ঢাকা শহর বলাটা বাউল গানে খুব স্বাভাবিক। যাদুবিন্দু তাকে বলেন 'বাঁকা নদীর বাঁক'। এই বাঁকা নদীর বাঁকে যে-নদী,

সেই নদীতে মাসে মাসে দিনদুপুরে জোয়ার আসে
ডাঙা ডহর যায় রে ভেসে বিদঘুটে বন্যে এসে।

এখানে কৌশলে রজপ্রবৃত্তির কথা বলা হ'ল, অবশ্য সেই সঙ্গে যাদুবিন্দু জানাতে ভোলেন না যে,

নাইতে গেলে বাঁকার ঘাটে বিষ্ঠেবুদ্ধি রয়না ঘটে
কাম নামে কুমির জুটে চিবিয়ে চুষে খায় তাকে।

কিন্তু বাঁকা নদীর বাঁক সম্পর্কে এত যে সতর্কবাণী ও সশংসয় ভয় সেইটাই যাদু-বিন্দুর শেষ কথা নয়। শেষকথা গুরুমন্ত্র। সেই গুরুমন্ত্র এবং গুরুনির্দেশিত পথে চললে পরিণাম হয় মহা উত্তরণে ও উল্টা সাধনে। তাই,

মহারসের রসিক হলে বাঁকা নদীর বন্যা এলে
আনন্দে সাঁতার খেলে চলে যায় উজানস্রোতে।

যাদুবিন্দুর এই সব গান পড়তে পড়তে কেবলই মনে হয় সাহেবধনীদের ভাবনা-চিন্তা কোথাও কোথাও কখন যেন চিরকালীন বাউল গানের ধারায় মিশে যায়। অন্তত উপমা রূপক আর বাচনে যাদুবিন্দুর গান বাউলদের অনেক কাছের সামগ্রী। হাটে মাঠে মেলায় শব্দগানের আসরে বাউল গায়ক যাদুবিন্দুর গান যত ব্যাপক ভাবে গায় কুবিরের গান তত গায় না। এর কারণ কি? কুবির কি সাহেবধনী ঘরের লোকোত্তর তত্ত্বে অনেক বেশি কূট ও দুর্বোধ্য? যাদুবিন্দু কি অনেক বেশি লোকায়ত তাঁর ভাষায় উপমায় উচ্চারণে? কারণ যাই হোক, একথা সত্য যে, দুশো বছরব্যাপী সাহেবধনীদের গানের দিগন্তে একদিকে প্রভাময় দীপ্ত কুবির আরেকদিকে আভাময় স্নিগ্ধ যাদুবিন্দু। একে অন্যের সম্পূরক। একের তালে অন্যের লয় গাঁথা। 'গুরু প্রতি নিষ্ঠা চাই নইলে সাধন হয় না' তাই যাদুবিন্দুর এই কথা নিতান্ত অন্তঃসারশূন্য বুলি নয়। গুরু কুবিরের নির্দেশিত পথেই শিষ্যের পরিক্রমা। তবে যাতায়াতের পথে রয়েছে অনেক সন্নিপাত ও সংঘটন। বৃত্তিহুদার ক্ষুদ্র বিন্দু থেকে তিনি ছড়িয়ে পড়েন বৃহৎ বঙ্গের বৃত্তে। তাই যাদুবিন্দুর একটা গানের অংশ তাঁকেই ফিরিয়ে দিয়ে বলা যায়:

রবির তাপে ধান কি পেকে?
খ্যাপা, শিশিরে কি ফসল হয়?
জোর ফুঁক না দিলে কি শংখ বাজে?

যাদুবিন্দুর প্রতিভা আগুনের মত পক্ককারী, বৃষ্টির মত ফলদ এবং উচ্চারণে প্রকৃতই শংখনিনাদী।

'রূপে নয়ন ডুবল নারে'

বাংলা লৌকিক গানের ভাব ও প্রকরণে এমনকি প্রতীক ও প্রতিমায় অনেক সময় বিস্ময়কর মিল খুঁজে পাওয়া যায় এক রচয়িতার সঙ্গে বহুদূরবর্তী অঞ্চলের আরেক রচয়িতার। লিখিত সাহিত্য হ'লে এই মিলকে সহজেই একের উপর অন্যের প্রভাব বলে আমরা নিশ্চিন্ত থাকি কিন্তু মৌখিক শ্রুতিবাহিত গানের জগতে প্রভাব শব্দটি অত সহজে উচ্চারণ করা চলে না। আমাদের দেশের পণ্ডিতরা জীবনানন্দের কোন কবিতায় এডগার অ্যালেন পো-র কোন কবিতার আভাস দেখে প্রভাব খুঁজে পান, রবীন্দ্রনাথের মানসচরিত্রে উপনিষদের আনন্দ-বাদ সংক্রমিত একথা প্রমাণ ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গ থেকে লৌকিক গানের ক্ষেত্রে প্রভাব ব্যাপারটি বিবেচিত হলে ভ্রান্তি অনিবার্য। গায়কদের কণ্ঠবাহিত হয়ে স্মৃতি ও শ্রুতির গহনলোকে একটি গান কীভাবে যে আরেকটি গানকে তৈরী করে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভূখণ্ডে তার নির্ণয় কঠিন। ব্যাপারটি বোঝানো যায় একটি প্রতিতুলনার উদাহরণ সূত্রে। পাবনার নরসিংদি অঞ্চল থেকে অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য একটি গান সংগ্রহ করেছিলেন, যার একটি অংশ :

স্বাতী নক্ষত্রের জলে
গজে মুক্তা-ফল ফলে
ভাণ্ডবিশেষে ফলাফল জানিও নিশ্চয়।
সে জল বাঁশে যদি পড়ে
বাঁশ-কাপুর নাম ধরে
সিংহের দুগ্ধ মাইট্টা ভাণ্ডে টিকে না॥

এখানে বলার কথাটা হল : সাধনার পাত্র অনুযায়ী ভক্তির বীজাংকুর হয়। সাধকের দেহভাণ্ড যদি পক্ক ও প্রস্তুত হয় তবে গুরুবীজ রোপন করলে অংকুর হবে। স্বাতীতারার জল বাঁশে পড়লে ব্যর্থ হয় অথচ হাতীর অঙ্গে পড়লে ঘটে দুর্লভ গজমুক্তার জন্ম এইরকম এক লোকবিশ্বাস আছে। তেমনই খুব গভীর ও গূঢ় বস্তু যথাযোগ্য আধার ছাড়া রাখা যায় না। সিংহের দুধ কি মাটির ভাঁড়ে

রাখা চলে ? তারজন্ত স্বর্ণপাত্রই বাঞ্ছনীয়। সংক্ষেপে একে বলা চলে আধার ও আধেয় তত্ত্ব।

এবার দেখা যাবে নরসিংদি থেকে বহুদূরে অবস্থিত বৃত্তিহুদা গ্রামে ব'সে কুবির গোঁসাই ঐ কথাটাই তাঁর নিজের ভাষায় এইভাবে লিখেছেন :

স্বাতী বিন্দু সর্বত্রয়ে সুনীর বরিষণ করে
গজে গজমুক্তা ফলে বংশলোচন বংশমূলে
এই কথা সকলে বলে শুনেছি শ্রবণে।
থাকে সিংহের দুগ্ধ স্বর্ণঘটে
টেঁকে না মাটির বাসনে॥

দুটি গানে একই লোকবিশ্বাসের রূপায়ণ ঘটেছে কেবল ভাষা ও আঞ্চলিক উচ্চারণ আলাদা। পাবনায় যাকে বলে বাঁশকাপুর, নদীয়ায় তার নাম বংশলোচন। নদীয়ার মাটির বাসন পাবনায় হয়েছে মাইট্টার ভাণ্ড। এখানে প্রশ্ন হ'ল, কে কাকে প্রভাবিত করেছে ? দুই গীতিকারে তো দেখাই হয়নি কোনদিন। লিখিত সাহিত্য নয় যে বহুদূরে বসেও প্রভাবিত হওয়া যায়। আসল ব্যাপারটা অন্য। লৌকিক গান সাধারণ গায়কের গলায় ভর করে খুব দ্রুত অতিক্রম করে অঞ্চলের সীমা। একজনের গানে-শোনা কোনো ভাব বা প্রতিমা, উপমা বা উল্লেখ হয়ত ভাল লেগে গেল অন্য একজনের। সেটুকু খুব সহজে ঢুকে গেল তাঁর গানে। একী প্রভাব ? আমাদের কয়েক শতাব্দীর বাংলা লৌকিক গানের স্বভাবে ও বাচনে এমন দেওয়া-নেওয়ার মানসচিত্র খুব প্রত্যক্ষ এবং তা নিয়ে কারুর কোন গ্লানি নেই। এ যেন খাঁচার ভেতর অচিন পাখির রহস্যজনক আসা-যাওয়ার মতই বিস্ময় জাগায় কেবল।

কথাটা উঠল এইজন্য যে, সাহেবধনীদের অনেক গানে বাউল গানের স্বভাব ও প্রতীক রয়ে গেছে। যার থেকে হঠাৎ মনে হওয়া আশ্চর্য নয় যে সাহেবধনীরা বাউলদেরই একটা অংশ। যাদুবিন্দুর গানে এই সংক্রাম খুব বেশি। কুবিরেও কম নয়। বাউলরা তাঁদের মতবাদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে গানের আসরে এঁদের গান গেয়ে থাকে। ব্যাপারটা স্ববিরোধী কেননা বাউল আর সাহেবধনীদের তত্ত্ব ও বিশ্বাসের জগৎটা খুব আলাদা। হয়ত সাধারণ দুয়েকটা মিল আছে কিন্তু বক্তব্য একেবারে স্বতন্ত্র। যেমন দেখা যাবে লালশশীর গানে প্রধান জোর গুরুবাদের দিকে, লালনের গানে সবচেয়ে বড়টান দেহ সম্পর্কে, অথচ কুবিরের ঝোঁক মাটির দিকে। তাঁর বক্তব্য :

নাই কিছু আর
এই মাটিতে খাঁটি কর মন আমার ॥

এই মাটি বা থাকি সম্পর্কে আলাদা মনোযোগই সাহেবধনীদের বিশিষ্টতা। অথচ কুবিরের এমন অনেক গান আছে যা লালন পদ্মলোচন বা হাউড়ে গোঁসাই-এর বাউল গানের সঙ্গে একই আসরে গাওয়া হয়। গাওয়া যে হয় তার কারণ গ্রামের মধ্যে গানের আসরের একটা বিশেষ রীতি আছে বলে। এই সব ভাবের গানের আসরে একজন গায়ক প্রথমে একটা বিশেষ ভাব বা তত্ত্বমূলক গান গায় তাকে বলা হয় 'দৈন্যতার গান'। এর জবাবে ঐ তত্ত্বের সম্প্রসারণ বা প্রতিবাদী তত্ত্ব দিয়ে আরেকজন আরেকটা গান করেন তাকে বলে 'প্রবর্তক গান'। দৈন্যত আর প্রবর্তের টানাপোড়েনে গ'ড়ে ওঠে একটা সম্পূর্ণ ভাবনার বৃত্ত। গায়কদের মনের মধ্যে পুঞ্জিত থাকে এক চমৎকার গীতি-সংকলন। তত্ত্বের প্রতিপাদনে বা বিরোধীতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গায়করা স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে নির্বিচারে গান তুলে আনেন স্মৃতির ঝাঁপি খুলে। সেই স্বৈরনির্বাচনে নজরটা থাকে গানের বক্তব্যের দিকে। তাই একই সুতোয় গাঁথা হয় লালন, কুবির, যাদুবিন্দু, গোঁসাইগোপাল পোদো বা হাউড়ের পদ। এই দেওয়া-নেওয়া থেকে গান এগিয়ে চলে। আসরে গান শুনতে শুনতে এমন মনে হওয়া খুব স্বাভাবিক যে, সব লৌকিক তত্ত্ব গানই বুঝি একরকম কেবল তফাৎ হল কবিত্বের তারতম্যে।

আসলে নানা ধরনেব লৌকিক তত্ত্বগানকে আলাদাভাবে সনাক্ত করা কঠিন বলে সাধারণভাবে সব গানকে 'বাউল গান' বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে-কোন গ্রাম্য গানের আসরকে বাউল গানের আসর বলা হয়। এমনকি গানের বাউল সুর বলে একটি অলীক ও অনির্দিষ্ট শব্দ খুব প্রচলিত আছে। অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর সুবৃহৎ সংগ্রহে বাউলগান বলে যা সংগ্রহ করেছেন তার অনেকগুলিই বাউলগান নয়। গৌণ ধর্মসম্প্রদায়ের বহু গান ঐ সংকলনে আছে যারা এমনকি বাউলবিরোধী। এখানে বুঝে নিতে হবে গানের আসরে কোন বাউল তার ভাব বা তত্ত্ব বোঝাতে যদি কোন গান গায় তবে সেটা বাউল গান হয়ে যায় না। বাউল গানের এবং সাধারণভাবে এই জাতীয় গানের কোন নির্দিষ্ট সুর বা ছক নেই। অনেকসময় কোন প্রসিদ্ধ সুরে অনেকগুলি গান গাওয়া হয়। সাধারণত বাংলা গ্রাম্যগানের মেলোডিক স্ট্রাকচার খুব সরল হয়। তার দুটি অংশ বা তুক থাকে—একটি আস্থায়ী এবং একই সুরে একাধিক

অন্তরা। গানের স্তবক গঠনের রীতিও খুব সদৃশ। লালন আর কুবিরের গান পাশাপাশি তুলে এই স্তবকগঠনের মিল দেখানো যায়।

লালন	কুবির
স্থায়ী	স্থায়ী
সোনার মানুষ ভাসছে রসে।	মানুষ হয়ে মানুষের করণ কর দেখি মন।
যে জেনেছে রস-পান্তি সেই	মানুষে বিশ্বাস করবি
দেখিতে পায় অনায়াসে॥	পাবিরে মানুষের দরশন॥
অন্তরা	অন্তরা
তিনশ ষাট রসের নদী	মানুষ হয়ে মানুষ মানো
বেগে ধায় ব্রহ্মাণ্ড ভেদি'	মানুষ হয়ে মানুষ জানো
তার মাঝে রূপ নিরবধি	মানুষ হয়ে মানুষ চেনো
ঝলক দিচ্ছে এই মানুষে॥	মানুষ রতন ধন॥

উদ্ধৃতি বিশদ ক'রে লাভ নেই, শুধু বু'ঝে নিতে হবে যে পুরো গানটায় ঐ একই অন্তরার সুর অনেকগুলি স্তবকে ফিরে ফিরে আসে।

সুরের ও বিন্যাসের এই সমাপতন এবং সেইসঙ্গে কিছু সাধারণ রূপক-প্রতীক ও তাত্ত্বিক শব্দ একই রকম থাকে বলে সব লৌকিক ভাবাত্মক গানকে বাউল গান বলে চালিয়ে দেওয়া সহজ ও সমঞ্জস বলে অনেকে মনে করেন। তাছাড়া বাউলদের জীবনযাপনের বিচিত্রতা, আলখাল্লা তসবী আর সর্বকেশরক্ষা তাদের চারপাশে তৈরী করে একটা সসম্ভ্রম রহস্য। কিন্তু এখন বলবার সময় এসেছে : যেমন সবাই বাউল নয়, কেউ কেউ বাউল, তেমনই সব ভাবের গানই বাউল গান নয়।

সাহেবধনীদের সঙ্গে বাউল মতবাদের কতকগুলি স্থূল ঐক্য থাকলেও মূল সাধনপদ্ধতি ও বিশ্বাসের পার্থক্য আছে। অথচ গানের প্রতীক ও ভাষায় এমন আশ্চর্য রকমের মিল পাওয়া যায় অনেকসময় যে অবাক লাগে। এখানে লালন ফকির (১৭৭৪-১৮৯০) এবং কুবির গোঁসাই (১৭৮৪-১৮৭৯)-য়ের কয়েকটি পদাংশ পরপর উদ্ধৃত করে এই কৌতূহলকর বিষয়টি উত্থাপন করব। পর্যায়ক্রমে দেখা যাক প্রথমে লালন ও পরে কুবিরের রচনা।

লালন

দুগ্ধে জল মিশাইয়ে
বেছে খায় রাজহংস হলে।

উদাহরণ—১

কুবির

সুজন হংস হয়গো যারা
তারা ক্ষীর ফেলে নীর ছোঁবে না

লালন

চাতকেরি এমনি ধারা
অন্য বারি খায় না তারা
তৃষ্ণায় জীবন যায় গো মারা
মেঘের জল না হলে ॥

উদাহরণ— ২

কুবির

চাতক যেমন বারির আশে
থাকে সে মনের বিশ্বাসে
প্রাণ যদি তার যায় পিপাসে
তবু সাগরে মুখ দেবে না ॥

লালন

মানুষ-তত্ত্ব যার সত্য হয় মনে
সে কি অন্য তত্ত্ব মানে।
মাটির ঢিবি কাঠের ছবি
ভূত ভাবি সব দেব আর দেবী
ভোলেনা সে এ সব রূপী
ও যে মানুষ রতন চেনে ॥

উদাহরণ—৩

কুবির

হরিষষ্ঠী মনসা মাকাল
মিছে কাঠের ছবি মাটির ঢিবি সাক্ষীগোপাল
বস্তুহীন পাষাণে কেন মাথা কুটে মর ॥

এমন চাঞ্চল্যকর মিল দেখে আমাদের কি সিদ্ধান্ত করতে হবে যে কুবির প্রভাবিত হয়েছিলেন লালনের গান শুনে ?

সেই সিদ্ধান্ত এই মুহূর্তে মুলতুবী রেখে আপাতত আমরা লালন শাহের গানের মূল বিষয়টির দিকে অভিনিবেশ করতে পারি। তার জাত পাত সংক্রান্ত বিতর্ক বাদ দিলে দেখা যাবে লালনের জীবন নানা নাটকীয়তা ও আঘাত সংঘাতে অস্থির। তার চেয়েও বড় সত্য হল, লালন তাঁর গানে একটি স্পষ্ট জীবনদর্শন ও মতবাদ গড়ে তুলেছেন। এই মতবাদকে প্রবর্তককেন্দ্রিক সংজ্ঞা দিয়ে লালনশাহী মতবাদ বলেছেন কেউ কেউ। তাঁর প্রয়াণের পর শরীয়তপন্থী কট্টর মুসলমানদের সঙ্গে লালনপন্থীদের প্রচুর সংঘাত হয়। আসলে লালন শাহ বাংলাদেশের প্রবাহমাণ বাউল সাধনার ক্ষেত্রে সংযোগ করেছিলেন বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী। সম্ভবত তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কঠিন অভিজ্ঞতা ও নিষ্ঠুর মানুষদের ব্যবহার তাঁর জীবনদর্শন গড়ে তুলেছিল। সঙ্গীদের সঙ্গে ভ্রমণে বেরিয়ে বসন্তরোগে আক্রান্ত হ'লে বন্ধুরা লালনকে ফেলে পালান তাঁকে মৃত মনে ক'রে। কিন্তু ঘটনাচক্রে লালন বেঁচে যান এবং নিজের জননী ও স্ত্রীর কাছে ফেরেন। আশ্রয় মেলে না। সম্পূর্ণ অপরিচিত এক মুসলিম দম্পতি তাঁকে ঠাঁই দেন। হতাশ ক্ষুব্ধ পরাজিত লালন দীক্ষা নেন বাউলধর্মে, সিরাজ সাঁইয়ের কাছে। ইতিমধ্যে তাঁর জীবনদৃষ্টি বদলে যায়। সংসারের অসারতা, মানবিক সম্পর্কের স্বার্থসর্বস্বতা, সনাতন ধর্মের অনুদার ভূমিকা এবং সমাজবদ্ধ মানুষের দুর্বলচিত্ত দেখে তিনি মায়াবাদী বৈরাগী হলেন না। বরণ করলেন জীবনবাদী বাউলের দ্রোহধর্ম। লালনের গানে ধরা আছে সামাজিক মানুষের আত্মবঞ্চনার নির্মম আলেখ্য। লালনের গান রচনার পশ্চাদ্‌পটে আছে তাঁর আত্মজিজ্ঞাসা এবং আঠারো শতকের শেষ পর্বের বাংলা সমাজের অবক্ষয় ও মুল্যবোধহীনতার সঙ্গে একজন জীবনধর্মী মানুষের সংঘাতের সত্য বিবরণ। মনে রাখতে হবে লালনের গানে বড় হয়ে উঠেছে ধর্মচেতনার চেয়ে জীবনচেতনা। এই অর্থে তিনি পূর্ববর্তী বাউলদের থেকে স্বতন্ত্রস্বভাবের। জীবন সংসক্তি তাঁকে পরাক্রান্ত গীতিকার ক'রে তুলেছে। লালনের গানে মধ্যযুগের একজন লোকধর্মসাধকের আত্মজৈবনিক উপাদান সবচেয়ে বেশি রূপ পেয়েছে।

লালনজীবনের নানা উপাদান, তাঁর বিশ্বাস, মতবাদ, তাঁর গানের নানা জায়গায় ছড়ানো আছে। এখানে প্রসঙ্গত তার কিছু কিছু তুলে দেখানো প্রয়োজন। প্রেম সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী হ'ল :

বলব কি সেই প্রেমের কথা
কাম হ'ল সেই প্রেমের লতা।

প্রকাশভঙ্গীর অনন্যতায় লালনের জীবনদর্শন খুব ঋজুভাবে উঠে আসে। মানবিক প্রেমের অলংকার কামনাবাসনা, প্রেমকে তাই রূপাঢ্য বর্ণাঢ্য করে কাম। অর্থাৎ বলা হ'ল দেহ ছাড়া প্রেম নেই। আসঙ্গ-লিপ্সাই জাগায় অসীমের প্রতি ঈপ্সা। এই কামনার পথেই তাই অধরমানুষের অন্বেষণ করতে হয়। লালন সেই কথাটাই সাবলীলভাবে বলেন :

ধরো রে অধর চাঁদেরে
অধরে অধর দিয়ে।

এই অধরে অধর সংযোগের জন্য যে স্বচ্ছ দেহবোধ দরকার তার মূলে চাই বলিষ্ঠ জীবনপ্রত্যয়। বৈরাগ্য নয়, নারীর কাছ থেকে পলায়ন নয়, তীর্থব্রত ইত্যাদিও নয়। তাই বলা হ'ল :

অন্য গোলমাল ছাড়
আপ্ততত্ত্ব ধর।
লালন বলে তীর্থ ব্রতের কার্য নয়॥

নারীসংসর্গ ছেড়ে যে সব বৈরাগ্যপন্থী আশ্রয় নেন বনেজঙ্গলে পাহাড়ে, লালন তাঁদের কাছে নির্মম বক্রোক্তিতে জানতে চান, সেখানে গিয়ে লাভ কি? 'স্বপ্নদোষ কি নেইকো তথায়?' এরপরে তিনি সঠিক পথটি বলে দেন :

না জেনে ঘরের খবর তাকাও কেন আসমানে?
স্বর্গ-চন্দ্র দেহ-চন্দ্র হয়
তাহাতে ভিন্ন কিছুই নয়।
ঐ চাঁদ ধরিলে সে চাঁদ মেলে
ফকির লালন কয় তাই নির্জনে॥

এখানে 'দেহচন্দ্র' মানে বাউল মতবাদসম্মত রজবীজের স্বীকরণে জীবনসাধনা, যা বাস্তব ও অতিপ্রত্যক্ষ। তবে দেহসর্বস্বতায় মণ্ডূকের মত কন্দর্পকূপে প'ড়ে থাকলে হবে না। কিন্তু দেহটা উপায়, তার সঙ্গে যুক্ত হবে 'দমের সম্মিলন' অর্থাৎ যোগক্রিয়া। সেই পথে পাওয়া যাবে অটল অবস্থা এবং মনের মানুষের গভীর নির্জন পথের নিশানা। একেই লালনপন্থীরা বলেন মানুষতত্ত্ব। বস্তুবাদী ব্যাখ্যাই লালনের মানুষতত্ত্বের ভিত্তি। সমকালীন নাড়ার মত, কালার মত, বীরভদ্রের মত বা গোরক্ষনাথের ঘর যেখানে আধ্যাত্মিকতায় অস্পষ্ট

রহস্যাচ্ছন্নতায় পরম সত্যের সন্ধানে নিরত ছিল, লালনপন্থা সেইখানে নবতর সত্যের অনুসন্ধানে প্রজনন তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ ক'রে অনেকটা বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এল। এইখানে তাঁর মতবাদের মৌলিকতা। বাংলা দেশের বাউল সাধনার সুদীর্ঘকালের অস্পষ্টতা, সাংকেতিক দুর্বোধ্য জগৎ, সন্ধাভাষার কুহেলি ও উপলব্ধির জড়তা ভেঙে লালন ঋজুকণ্ঠে দ্বিধাহীন বাচনে এক অনুভবের সত্যকে উন্মুক্ত করলেন। সে জগতে সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতা নেই, জাতিবর্ণের সংঘাত নেই, আচারসর্বস্বতার অহমিকা নেই। আছে উদার অনুভবের গূঢ় ভালবাসা, সদ্‌গুরু বা মুর্শেদের প্রতি শরণ আর মানুষের উপর আস্থা। শেষপর্যন্ত তাই লালন বলতে পারেন :

> মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি।
> মানুষ ছেড়ে খ্যাপা রে তুই মূল হারাবি॥
> মানুষ ছাড়া মন আমার
> পড়বি রে তুই শূন্যকার।
> লালন বলে মানুষ আকার ভজলে তরবি॥

লালনের এই অভিনব মানবতত্ত্ব আঠারো শতকের বাংলার সমাজমানসে খুব বৈপ্লবিক মনে হয়। রামপ্রসাদের গানে যখন ব্যক্ত হয় আত্মদীন মানুষের অসহায় অভিযোগ, ভারতচন্দ্রের কাব্যে কামসর্বস্ব মানুষের গোপন সুড়ঙ্গপথে আনাগোনা, সমসময়েই লালনের গানে দ্যোতনা পায় যে-মানবতত্ত্ব তার ভিত্তি বলিষ্ঠ জীবন ও যৌনতার স্বীকৃতি। খুব নিস্পৃহ ভঙ্গীতে লালন কত সহজে উচ্চারণ করেন :

> খেলছে মানুষ নীরে ক্ষীরে।

তিনি খুব সহজেই জৈবপ্রবৃত্তির বশীভূত মানুষকে তাঁর চেতনার বিষয়ীভূত করেছেন তাই নীর আর ক্ষীর অর্থাৎ রক্ত আর বীর্যকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কুবির গোঁসাইয়ের জীবনসাধনা ও ধর্মপ্রত্যয় লালনজীবনের সংলগ্ন নয় তবে একই জল-মাটির স্পর্শে একই যুগের চিত্ততলে সেই সাধনার বীজাংকুর। নাহলে কুবির কি ক'রে বলেন :

> ও মন-ভোলা এ মানুষে হচ্ছে রে মানুষের খেলা।
> পারিস তো ধরনা কেন এই বেলা॥

> ঘরে মানুষ বাইরে মানুষ ব্রহ্মাণ্ডে সকলই মানুষ
> আমি খুঁজে পাইনে মনের মানুষ।

মানুষে মানুষ মিশেছে
নীরে ক্ষীরে গোলা ॥

এখানে লালনের সঙ্গে কুবিরের জীবনদর্শনের বোধ খুব সন্নিহিত। তবে এ-প্রভাব লালনের গানের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শজাত ব'লে মনে হয় না। অবশ্য লালনের সাধনভূমি কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়া থেকে কুবিরের বৃত্তিহুদা সোজা স্থলপথেই যুক্ত ছিল। কাজেই লালনের গান যে বাউলদের সংসর্গ থেকে কুবিরের কাছে একেবারে আসা অসম্ভব তা তো নয়।

আসলে লালন ও কুবির দুজনেই সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। বেদ পুরাণে বিশ্বাসী হিন্দু এবং শরীয়তসর্বস্ব মুসলমান উভয়কেই তাঁরা ব্যঙ্গ করেছেন। ধর্মের বাহ্য আচারকে সর্বদা নিন্দা করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁদের মতৈক্য নিরাভরণ ভাষায় রূপ পেয়েছে। লালন অনভিবিদ্ধরূপে সাম্প্রদায়িকতাকে এঁকেছেন :

ফকিরি করবি খ্যাপা কোন্ রাগে
হিন্দু মুসলমান দুইজন দুইভাগে।
আছে বেহেস্তের আশায় মমিনগণ
হিন্দুদিগের স্বর্গেতে মন ॥

অবশ্য শেষপর্যন্ত সমন্বয়বাদী চিন্তা থেকে সুস্থ সমাধানের অনুভূতি লালন প্রকাশ ক'রে বলেন :

যে যা ভাবে সেই রূপে সে হয়।
রাম রহিম করিম কালা এক আল্লা জগৎময় ॥

আশ্চর্য যে, কুবিরের সমন্বয়বাদী মনও একই সিদ্ধান্ত ক'রে বলে :

রাম কি রহিম করিম কালুলা কালা
হরি হরি এক আত্মা জীবনদত্তা
এক চাঁদ জগৎ উজ্জ্বলা।
আছে যার মনে যা ভাবুকতা ॥

অনাধুনিক কালে বাংলার অপরিচিত গ্রামাঞ্চলের দুর্গমতায় থেকেও অশিক্ষিত দুই গীতিকার ধর্মসমন্বয়ের যে-আদর্শস্বপ্নের কথা ভেবে গেছেন ও ধরে রেখেছেন তাঁদের গানে তার পশ্চাদপটে আছে আপন অন্তরের নির্দেশ, যা গভীর উপলব্ধি-জাত ও গুরু পরম্পরায় সাধনালব্ধ। এসব বাচনে যদি আমরা বৃহত্তর ভারতের মধ্যযুগীয় সন্ত-সাধকের মহাবাণীর প্রতিধ্বনি পাই তবে দুই গ্রাম্য গীতিকারের

গ্রামছাড়া উদার চিত্ততলের প্রসারিত মানসভূখণ্ডই জেগে ওঠে। এই অসাম্প্রদায়িক উদার দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু আপনাআপনি গড়ে ওঠেনি। যুগে যুগে ব্রাহ্মণের অত্যাচার, মোল্লাদের গোঁড়ামি, শ্রীচৈতন্য ও সহজিয়াদের জাতিবর্ণ-বিরোধী প্রচার এবং সুফী মরমিয়াদের সৎ জীবন-যাপন এঁদের একই সাধনার ছত্রতলে টেনে এনেছিল।

এত সব উদাহরণ ও বিশ্লেষণ দিয়ে আমাদের বলবার কথা এই যে, মধ্যযুগের সামুহিক অবক্ষয় ও জীর্ণ মূল্যবোধের মধ্যে লালন ফকির ও কুবির গোঁসাইয়ের বলিষ্ঠ জীবনপ্রত্যয় ও সুস্থ যৌনতাবোধ আমাদের অবাক করে এবং বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে যে এই দুজনের মধ্যে যোগাযোগ ছিল। যদিও কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই তবু দুজনের ভৌগোলিক অবস্থান এবং কালগত নৈকট্য এমন অনুমান জাগায়। অবশ্য আমাদের মনে থাকে যে, লালন নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে বাউল মতাবলম্বী এবং কুবির সহজিয়ামার্গী সাহেবধনী। কিন্তু কোথায় যেন দুজনের বিশ্বাসে ও ভাষণে এক অনতিলক্ষ ও নিগূঢ় মিল রয়ে গেছে। আশ্চর্য যে এই দুই কবি তাঁদের আত্মবেদনা ও নিঃসঙ্গতার দুঃখও প্রকাশ ক'রে গেছেন প্রায় একই ভাষায়। লালনের মনে হয়েছে :

> কারে বলব আমার মনের বেদনা
> এমন ব্যথায় ব্যথিত মেলে না।
> যে দুখে আমার মন
> আছে সদায় উচাটন
> বললে সারেনা ॥

কুবির আর এক সুর এগিয়ে বলেছেন :

> আমার মনের কথা হয় মনের সাথে
> যখন একলা চলে যাই পথে।
> দুখের দুখী পেলাম কই
> দুটো মনের কথা কই ॥

একজন মনের বেদনা বলবার মত সমব্যথী পাননা এবং দুঃখের তাপ তাঁর এত গাঢ় যে তা বললেও সারে না। আরেকজন মনের কথা বলেন নিজেরই সঙ্গে তাঁর 'একলা-চলার নির্জন করুণরঙিন পথে, কেননা তিনিও পাননা দোসরজনের শুশ্রূষা। এতবড় দুই গীতিকার তাঁদের অজস্র গানের এত ব্যক্ততার পর কেন এত নিঃসঙ্গ? কী ছিল তাঁদের বলার অন্তর কথা? সে কি তাঁদের প্রতিকার-

হীন ব্যক্তিগত কোন ব্যর্থতা থেকে উঠে-আসা কোন উপলব্ধি? সে কি কোন সামাজিক অমার্জনীয় আঘাতের নিঃসঙ্গ ক্ষোভ? এতদিন পরে সেকথা আমাদের জানবার উপায় নেই। তবে কল্পনা করা চলে শেষ মধ্যযুগের সেই নিষ্ঠুর তামসিকতা। মানুষের মধ্যে মানুষের সন্ধান করতে গিয়ে সেকালে লালন লিখে গেছেন: 'কলিকালে অমানুষের জোর/যত ভালমানুষ বানায় তারা চোর। /কারে বিশ্বাস কেউ করে না/ওগো শঠে শঠে সকল কারখানা।' কুবিরের দুঃখ লালনের চেয়ে গাঢ়। সমস্ত সদর্থক উচ্চারণের পরেও তাঁকে তাই বলতে হয়: 'আমি লিখলাম সব ঠিক দিতে পারলাম না।'

সাহেবধনীদের গান তাই শেষ পর্যন্ত আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয় দ্বিধাসংকুল প্রান্তরে, দুলিয়ে দেয় এক বৈপরীত্যের দোলাচলে। জাতিবর্ণে অবিশ্বাসী, বেদবিরোধী, মানবতাবাদী, সমন্বয়স্বপ্নের শরিক তাদের গীতিকার কোন্ গভীর বিশ্বাসভঙ্গের বেদনায় এমন লেখেন যে,

অগণনায় বর্ণ লেখা—
রাধাকৃষ্ণ যীশুখৃষ্ট খোদ আল্লা এক
রছুল একা ধোঁকা মিটল না।
আর রাম রহিম কালুল্লা কালা
সে নামেতে ভুললাম না।।
সৃষ্টিকর্তা যে হোক বটে
নবদ্বীপে গৌররূপে সকল জাত ছেঁটে
করলেন একচেটে
সে এক মানলাম না।
তিনি হিন্দু মুসলমানের গুরু জেনেও
বিশ্বাস করলাম না।।
ভেক লয়ে বৈরাগ্য হলাম
মুড়িয়ে মাথা ছেঁড়া কাঁথা গলাতে নিলাম।
জাত খোয়ালাম
কিছুই হ'ল না।।
যদি এক পিতা সকলের হত
এক পথে একসাথে যেত

এক পাতে খেত এক নাম নিত

তাও তো নিলাম না ॥

এই ব্যর্থতাবোধ কি ব্যক্তিগত না সামগ্রিকভাবে সে কালের সমন্বয়বাদী সকল লোকধর্মসাধকদের? একদিক থেকে ভাবলে মনে হয় সাহেবধনীরা শুধু নয়, সব লোকধর্মসাধকরাই উনিশ শতকে ক্রমশ হয়ে পড়ছিলেন সংখ্যালঘু। ভক্তি বিশ্বাসের তাপ কমে, ক্রমেই এসে যাচ্ছিল শ্রেণীবৈষম্য আর জাতপাতের সংকীর্ণতা। মধ্যযুগের প্রবল জীবনস্পন্দী লোকবিশ্বাস ঘা খাচ্ছিল ক্রমাগ্রগত বিজ্ঞানবুদ্ধি আর জ্ঞানমার্গের সংঘাতে। হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান, ব্রাহ্মধর্মের উন্মেষ, ইসলামের রুদ্রতা এবং খৃষ্টধর্মের প্রবলতা সমন্বয়বাদীদের সব হিসেব ঘুলিয়ে দিচ্ছিল। 'লিখলাম সব ঠিক দিতে পারলাম না' কুবিরের এই খেদোক্তি অনেকেরই।

তবু থেকে যায় সাহেবধনী ঘরের সত্যনাম, সব প্রতিরোধ আর প্রতিকূলতার মুখে। জলাঙ্গী নদীর ছায়ায় স্মৃতির স্বর্ণোজ্জ্বল রূপকথার বাড়ির মত কিংবদন্তীর অহংকার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চরণ পালের বাড়ি। তার ভেতরকার কোঠা ঘরে থাকেন দীনদয়াল সাহেবধনী গোপ্ত বাবাজী। বৃহস্পতিবার ভোগরাগ নিবেদন হয় দীনভাবে দীনবন্ধুর উদ্দেশ্যে। একটা দুটো বিশ্বাসী মানুষ বা ভ্রাম্যমাণ ভক্ত আসে। মানত করে, কামনা করে রোগমুক্তির, দীনদয়ালের স্মরণে দেয় প্রণামী। চরণ পালের বাড়ীর অদূরে সমাধিমন্দিরে শুয়ে থাকেন কুবির গোঁসাই মাটির তলার নির্দ্বিধ শান্তিতে। পাশে স্ত্রী ভগবতী আর সাধনসঙ্গিনী কৃষ্ণ-মোহিনীর সমাধিমন্দির। কেবল দূরে গ্রামের আরেক প্রান্তে রামপ্রসাদ ঘোষের ভিটায় লোহার সিন্দুকে লাল খেড়োয় বাঁধা থাকে ১২০৯ খানা কুবির-গীতি, স্বর্গত রামলাল ঘোষের অনুলিখনে। যাদুবিন্দুর গান জমা থাকে বর্ধমানের নসরৎপুরের পাঁচলখি গ্রামে। কিন্তু ছড়িয়ে পড়ে সে সব গান কুবিরের প্রিয় উপমা কাপাস তুলোর মত শত শত লোকগায়ক আর বাউলের কণ্ঠ থেকে কণ্ঠে। নদীর মধ্যে লুকিয়ে থাকা মহামীনের মত রহস্যময়, অধর মানুষের মত গোপন, মনের মানুষের মত অপ্রাপণীয় এসব গানের বন্দেশ, অন্তর্তত্ত্ব কজন আজ বুঝবে?

সাহেবধনীদের গান সনাক্তকরণও তো কঠিন। এখানে উল্লেখ করতে হয় যে শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'উত্তর রাঢ়ের লোকসংগীত' বইতে ছেপে দেন তাঁর সংগৃহীত 'সাহেবধনী সম্প্রদায়ের মাতৃবন্দনা'। তার বিষয়টি এইরকম :

মায়েব সেবা কর রে ভাই যাইবে তরি।

মার দোয়াতে ভবপারে যাইবে তরি ॥

রসুলের ঐ জামানতে[১] একজনা আকলিম নামেতে
সে জন কুল বেমারিতে[২] যাইলো মরি।
রসুলুল্লা পয়গম্বরে পুছিলেন আকলিমের গোরে[৩]
দেখেন নবী সেই কব্বরে আজাব[৪] হয় ভারি।
আকলিমের মাতাকে আনি পুছিলেন তখুনি
কি গুনাহ্[৫] করেছে বলো বেটা তোমারি॥
রসুলের ও কথা শুনে তবে তো আকলিমের মাতা
আল্লার দরবারে বিন্তি করলেন জারি।
দেখসে মায়ের দোয়াতে খালাস পাইল আজাবেতে
কইছে মুস্তাজ সভা হ'তে মার দরজা ভারি॥

খুঁটিয়ে পড়লে বোঝা যায়, সাহেবধনীদের সঙ্গে বা তাদের মতবাদের সঙ্গে গানটির সংযোগ থাকতে পারে না। কেননা সাহেবধনীরা কোন মাতৃবন্দনা করেন না। শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় উত্তর রাঢ় অঞ্চল থেকে গানটি যে পেয়েছেন তা নিঃসন্দেহ তবে গানটির যথার্থ সনাক্তকরণ হয়নি। আসলে সাহেবধনীদের গান তো আলাদাভাবে চিনে নেবার কোন বিশেষ সংকেত বা লক্ষণ নেই। তার প্রতীক ও প্রকরণে বাউল গানের ধারাই খুব সুপরিস্ফুট। খব সহজেই তাই এ-গান মিশে যায়, সাধারণীকৃত হয়ে যায় বাউল গানের সার্বিক সংজ্ঞায়। অন্তত শ্রীরামকৃষ্ণ তো কুবিরের গানকে বাউল গান বলেই গ্রহণ করেছিলেন। সরলা দেবী চৌধুরাণীও চুঁচুড়ায় মাঝিদের কণ্ঠ থেকে কুবিরের গানটি ছেঁকে তুলেছিলেন বাউল গান বলেই।

এই তথ্য থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি সাহেবধনীদের বিশ্বাস আচরণ ও প্রত্যয় যত বিশিষ্ট ও অভিনব হোক তাদের গান অন্তত বিন্যাসে ও ভঙ্গীতে আবহমান লোকসংগীতের গঠন মেনে নিয়েছে। এইজন্যই সুর বা গায়ন থেকে এই মতবাদের গানগুলিকে এখন আলাদাভাবে খুঁজে নেওয়া কঠিন। একমাত্র ভাব বিষয়বস্তু ও বক্তব্য থেকে কুবির বা যাদুবিন্দুকে চিনে নিতে হবে। কোথায় তাঁরা বিশিষ্ট, কোনখানে ধরা আছে তাঁদের তত্ত্ব, কোন্ প্রতীকটি তাঁদের ধর্মতত্ত্ব-সংগত, কোন্ কোন্ সংকেত শব্দে লুকিয়ে আছে দীনদয়ালের বিশেষ ঘরানা। এই প্রসঙ্গে আমাদের এই কথা নিঃসন্দেহে ঘোষণা করা দরকার যে সাহেবধনী মতবাদ কর্তাভজাদের উপশাখা নয়, বাউল বিশ্বাসের সংলগ্ন নয়, কোন সুফি

---

[১] সময় [২] অসুখ [৩] কবর [৪] কষ্ট [৫] দোষ

ধারার (চিসতিয়া বা কাদেরিয়া) প্রত্যক্ষ প্রজাতি নয়, ইসলাম বিশ্বাসের উপজাত মারফতী ফকিরিতত্ত্ব নয়—যদিও এ সবেরই কিছু কিছু লক্ষণ ও মতামত সাহেবধনীতত্ত্বে মিশেছে বা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। তবে কি সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে সাহেবধনীদের সম্পর্ক কোন ঘনিষ্ঠসূত্রে জড়িত? এই সন্দেহ দৃঢ় হয় কুবির বা যাদুবিন্দু নামের শেষে গোঁসাই উপাধি দেখে। সাঁই নয়, শাহ নয়, শুধুই গোঁসাই। আরও দেখা যায়, কুবির ও যাদুবিন্দুকে বৈষ্ণবমতে সমাধি দেওয়া হয়েছে মাটি কেটে তাতে পিঠ ঠেকিয়ে উপবিষ্ট ভঙ্গীতে পা-ছড়িয়ে। এই সহজিয়া সূত্রে খোঁজ করতে গিয়ে পাঁচলখি গ্রামে যাদুবিন্দুর ভিটেয় আমি পাই একটি পুরানো হাতে-লেখা পুথি, যার লেখক শ্রীহরানন্দ দাস। তাঁর পরিচয় 'সবকেশী বৈরাগী' এবং নিবাস ছিল নদীয়ার গোপালপুব। সেই পুথির প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে বর্ণাশুদ্ধিসহ হুবহু উদ্ধৃতিযোগ্য :

> বৈষ্ণবঠাকুর: মথুরানন্দী হইতে পঞ্চবিংসতি মতে: সর্ব্বকেশী শ্রীশ্রীরূপের ঘর মহাবাউল: তাহা হইতে পঞ্চবিংশীতি ঘর: নিরূপন হয়: তাহার বিবরণ:। প্রথমে দ্বাবিংসতি মতে: সর্ব্বকেশী শ্রীশ্রীরূপের ঘর: মহাবাউল: তাহা হইতে পরে ফকির:। কি?:। বাউল ১। দ্বিতিয় নাড়া ২ ত্রিতিয় সাই ৩ চতুর্থয় দরবেষ ৪ পঞ্চমে শাহেবধানি: ৫ শষ্টমে শ্যাম বাউবি: ৬ সপ্তমে অবধৌত ৭ অষ্টমে সেবাকমলিনি ৮ নবমে ভাবকিস্বরি ৯ দশমে ভাবলোচন ১০ একাদশে উদাশীন ১১ দ্বাদশে কেনা-গিরি ১২ ত্রিওদশে আউলাচণ্ডী ১৩ চতুর্দ্দশে গোরক্ষনাথ ১৪।। পঞ্চদশে পশ্চীমবাশীকর্মজ্ঞানি আললপন্থি ১৫। শষ্টদশে লোকসাই ১৬ সপ্তদশে নানকপন্থি ১৭। অষ্টদশে কুবিরপন্তি: ১৮ ঊনুবিংসতিতে কামালপন্তি ১৯ বিংশতিতে খড়িয়া বৈষ্ণব ২০ একবিংশীতিতে আলেকসাই ২১। দ্বাবিংসতিতে ·· ···সাই: ২২। ত্রিয়বিংশতিতে ছতুরাপন্তি ২৩। চতুর্বিংশতিতে মরকট বৈষ্ণব ২৪ পঞ্চবিংশতিতে গুরুত্যাগী রূপ কবিরাজ: ২৫ এই পঞ্চবিংশতি মতে শ্রীবৈষ্ণব সকল: ব্রহ্মাণ্ডে বিলাষ: শ্রীশ্রীরূপের কৃপায় কহে রাই রামানন্দ দাস মহাবাউল গোস্বামি নবদ্বীপে বাষ: লেখক শ্রীহরানন্দ দাস: গোপালপুর বাষ:।। সর্ব্বকেশী বৈরাগী:।।

শ্রীরূপের ধারাশ্রয়ী পঁচিশটি মতবাদের মধ্যে একটি মত যে সাহেবধনী এমন তথ্য পুথির পাতায় মিলছে। পুথিটি যেহেতু একশো বছরের পুরানো তাই এটিকে নির্ভরযোগ্য বলা যায়। তবু ইতিহাস, বস্তুদৃষ্টি ও আভ্যন্তরীণ প্রমাণ থেকে বলা

যায় সাহেবধনী মতবাদ কোন অমিশ্র সহজিয়া স্রোতের অবিকৃত ধারা নয়। এর পুষ্টি ও চলমানতায় এসে মিশেছে আরও অনেক গৌণ মতাদর্শ, আচার ও মন্ত্র। এঁদের গোপন মন্ত্রে যেমন আছে 'ক্লিং সাহেবধনী আল্লাধনী' তেমনই গানে বলা হয়েছে 'আল্লা মোহাম্মদ রাধাকৃষ্ণ একাঙ্গ একাত্মা সার'। বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্ম সম্পর্কে কোন সুনিশ্চিত মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত করা উচিত নয়। সুতরাং সাহেবধনী মতবাদ বলতে নিঃসন্দেহে কী বোঝায়, স্পষ্টভাবে কী তাদের বক্তব্যের পরিধি এসব প্রশ্ন মুলতুবী রেখে আমাদের শেষ সিদ্ধান্ত করতে হবে তাঁদের গানের অভ্যন্তরে দ্যোতিত ভাবনাচিন্তা অবলম্বন ক'রে।

একটি গানে সাহেবধনীদের করণসিদ্ধির সাধনা স্তরে স্তরে বলা আছে। প্রথমে সাধককে বলা হয়েছে মনের খুঁটিনাটি ময়লা মাটি অর্থাৎ লোভ সংশয় দ্বেষ মাৎসর্য ত্যাগ ক'রে খাঁটি পথে দাঁড়াতে। তারপরে সাধককে বলা হয়েছে :

জপো নামের মালা।

তারপর :

ধুনী জালায়ে ছয় রিপুকে
তাপাও রে তফাতে থেকে
সেই ভস্ম অঙ্গে মেখে করো রে ভাবগ্রহণ॥

তফাতে থেকে ছয় রিপুকে ভস্ম করা এবং সেই ভস্ম অঙ্গে মেখে (দুরে ফেলে দিয়ে নয়) ভাবগ্রহণ খুব লক্ষণীয়। এবারে সাধকের যে-ভাবলোকে উত্তরণ হবে সেখানে প্রশান্তি ও আনন্দের স্তর। তারপরে শুরু হবে নির্বিকার হয়ে নারীর সঙ্গে দেহাশ্রিত সাধনা :

শুদ্ধ নির্বিকারী হয়ে
কামের ঘরে প্রবেশিয়ে
কামে কাম নিবারিয়ে কর কামের কারণ।
সেই কামিনী সাপিনী সঙ্গে
মন বিহার কর রসরঙ্গে
যেন সেই কালভুজঙ্গ অঙ্গে করে নাকো দংশন॥

এই স্তর পেরিয়ে এলে সাধকের সামনে উন্মুক্ত হবে এক প্রত্যাশার জগৎ। তখন সেই

ভাবের আশা লয়ে হাতে
যেতে হবে ভবের পথে

সর্বদা সাধুর সাথে কর ভাব আলাপন।
তবে ভাবেতে ভাব উপজিবে
দীক্ষে মন্ত্র শিক্ষে হবে।

এইখানেই সাধনার সমাপ্তি, যখন দীক্ষামন্ত্র শিক্ষা হবে। স্থূল মন্ত্র যখন ভাবাত্মকতায় ব্যাপক ও সত্য হয়ে উঠবে জীবনে।

এখানে যে কথাটি উহ্য থাকে তা হ'ল গুরুর প্রসঙ্গ অথচ সাহেবধনীদের মতবাদে ঐ প্রসঙ্গটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। যাদুবিন্দুর গানে গুরু সম্পর্কে চিন্তাভাবনা খুব স্বচ্ছ। প্রথমেই মনে রাখা চাই যে, গুরু কোন সাধারণ মানুষ নন। তারপরে বুঝতে হবে শিষ্যের জীবনে গুরু অপরিত্যজ্য ও আবশ্যিক। হাল বিনা যেমন তরী চলে না, জাঁতার নাই না থাকলে যেমন মুগ মুসুরি ভাঙা যায় না, তেমনই গুরু ছাড়া সাধনা হয় না :

আবার হাল বিনে চলে না তরী ভাল করে দেখ বুঝে।
দেখ দেখি মন জাঁতার থাকলে নাই
অতি যত্ন করি মুগ মুসুরির ডাল ভাঙে সবাই।
হ'লে নাই-ছাড়া আ-কাঁড়া জাঁতা পরে রয় কাজে কাজে॥

গুরুছাড়া সাধক যেন নাই-ছাড়া জাঁতা, অকেজো পরিত্যক্ত। এরপরে বলা হয়েছে :

যারা গুরুকে ভুলে হরি হরি বোল বলে
গাছের গোড়া কেটে যেমন আগায় জল ঢালে।

গুরুর আবশ্যিকতা বোঝা গেল। এবারে বুঝতে হবে গুরু কে? গুরু কেন? গুরুর কাজ কি? তার জবাব :

গুরু রূপ ধ'রে সদয় হন তিনি
মন্ত্রদান করেন শিষ্যের শ্রবণে।
যদি গুরু চেনো মন পাবে কৃষ্ণ দরশন
পরমসুখে রয়ে যাবে বৈকুণ্ঠভবন।
হ'লে গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি সাজা দেবে শমনে॥

গুরু আর শিষ্য যদি হন পুরুষ আর নারী তবে সাধনা হয়ে ওঠে কঠিন। দৃষ্টিভঙ্গী অবিকৃত রাখা তো সোজা নয়। তাই প্রশ্ন ওঠে :

লোভী গুরু কামী চেলা যার
ও সে কেমন ক'রে হয়ে যাবে ভবনদী পার ?

যাদুবিন্দু নিজে পুরুষ তাঁর গুরু কুবিরও পুরুষ. যাদুবিন্দুর খেদ এইখানে যে গুরুকে তিনি সর্বস্ব দিতে পারেন না। তাই আমাদের বিস্মিত ক'রে দিয়ে তাঁর আকুতি:হ'ল :

যদি হতাম মেয়ে দেহ দিয়ে
থাকতাম গুরুর পায়ে ধরি ॥

কেননা তাঁর মনে থাকে যে,

হলে শিষ্য-প্রকৃতি করে গুরুকে পতি
প্রাণ সঁপে শ্রীগুরুর পদে ক'রে পিরিতি ॥

এখানে গুরুশিষ্যা বা পুরুষপ্রকৃতি দেহ-সাধনা বিষয়ে যে ইঙ্গিত আছে ভুল করে যদি আমরা তার কোন হীনার্থ করি তাই যাদুবিন্দু মনে করিয়ে দেন :

গুরু শিষ্যে হয় যদি রমণ
আছে শাস্ত্রে গাঁথা সত্য কথা নরকে গমন।

সাহেবধনীদের এই নিষ্কলুষ গুরুতত্ত্ব বোঝা খুব সুকঠিন সন্দেহ নেই। তবে কুবির আর যাদুবিন্দুর পদ পড়লে বোঝা যায় গুরু চরণের প্রতি কুবিরের এবং গুরু কুবিরের প্রতি যাদুবিন্দুর ছিল অসাধারণ ভক্তি বিশ্বাস ও সমর্পণের আনন্দ। কুবির তাঁর গুরু সম্পর্কে এতদূর ভাববিহ্বল যে বলেন :

হৃদিপদ্মে চরণপদ্ম রেখে করি সাধনসিদ্ধ
চরণে মন করি বদ্ধ রাখি দিবানিশি।
আমি রাঙা চরণ পাব কিন্তু রে হব না বৈকুণ্ঠবাসী ॥

কিন্তু তবু গুরুপ্রাপ্তির চরম আনন্দ আসেনা। তাই তাঁকে আরেক পদে বলতে হয় :

আমার যত ঋণ ছিল ও সব শোধ দিতে হ'ল
আমার রইল দেনা শোধ হ'ল না
কুবির কয় চরণচাঁদের খাতাতে ॥

গানে যে গুরুতত্ত্ব এত প্রাধান্য পেয়েছে সাহেবধনীদের গুহ্যমন্ত্রে সেই গুরু বন্দনার পর্যায়গুলিও কম আশ্চর্যজনক নয়। তাঁদের মার্গে যে-গুরু-চর্যা তার ক্রমগুলি নিচে দেখানো গেল।

গুরুদত্ত আসন শুদ্ধ

জল শুদ্ধ স্থল শুদ্ধ আর শুদ্ধ মন।

গুরু আমাকে আসন দিয়েছেন
মন তুই এই আসনে বস্।
গুরু সত্য গুরু সত্য গুরু সত্য ॥

গুরু আরোপ

ওঁ ক্লিং ক্লিং চক্ষের মধ্যে নিরীক্ষণ
চৌত্রিশ পবন পানি জানি
প্রভুর উৎপত্তি কায় বহুকার্য সিদ্ধ হয়।
তোমার আসন ছাড়িয়া প্রভু
আমাব আসনে কর ভর।
আমাব হৃদ্‌পদ্মে কর ভর।
দোহাই প্রভুর দোহাই প্রভুব দোহাই প্রভুর।
তুমি সত্য।
[রাত দুই প্রহর সময়ে ১০১ বার পড়িবে]
এস হে ধেয়ানে বস হে আসনে
আসন করিলাম দেহ ও ভুবনে
খাট পাট সিংহাসনে।
দীনদয়াল চামব ঢুলাই
বজ্রভবনে বসিলাম তোমার।
এসহে লাসরি প্রভু
আমার আসনে কর ভর ॥

এ মন্ত্র অনুধাবন করলে বোঝা যাবে গুরুবরণ গুরুআরোপ ইত্যাদির ক্রম শেষ পর্যন্ত দীনদয়ালের সঙ্গে মিশে যায়। ধ্যানের শেষে তাঁর চরম সম্বোধন দাঁড়ায় লাসরি (লা-সরিকালা) অর্থাৎ খোদ আল্লা।

এর সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে কুবিরের উচ্ছ্বসিত আল্লা-বন্দনা যেখানে বলা হয়:

আধকার প্রকাশ্য দিন
দীন মোহাম্মদ দীনের অধীন
যারে মেহেবাল্লা আলমিন্
দোস্ত সে খোদার।

আল্লার নামের উপর নামের জারি
কীর্তি ভারি চমৎকার ॥
একহাতে বাজেনা তালি
এক সুরের কথা বলি
নীরে ক্ষীরে চলাচলি
বীজের এই বিচার ॥

এরই গায়ে গায়ে কুবির উদ্বেলিত বিশ্বাসে বলেন :

মুসলমানের আল্লাতালা
হিন্দুর কৃষ্ণব্রহ্মা বিষ্ণু ভাবে বিভোলা
এক ঘরে খেলা করে পিঁজরাতে।
খানা দানাপানি একই জানি
বিরুদ্ধ হয় ফ্‌করাতে ॥

এই সবই আসলে সাহেবধনী ঘরের শিক্ষা। সাধনা থেকে দেহ, দেহ থেকে গুরু, গুরু থেকে উপাস্য দীনদয়াল, দীনদয়ালের মধ্যে কৃষ্ণ আর আল্লার সমবায়, দীন মোহাম্মদ আর দীনবন্ধুর যুগলবন্দী। সাহেবধনীরা একই সঙ্গে বিশ্বাস করে চারযুগের সত্য, মানুষের সত্য এবং মাটি বা খাকির ভাবসত্য। চারযুগ আর মানুষতত্ত্বও আসলে এক, কেননা

চারিযুগেতে মানুষ আছে
সেই মানুষ মানুষের কাছে
বহুরূপ ধারণ করেছে
মানুষ মানুষের কারণ।
আবার তার উপরে মানুষ আছে
মানুষ প্রাপ্তিধন।
কর সেই মানুষের অন্বেষণ ॥

যেমন চারযুগে মানুষের লীলা চলছে ব'লে চারযুগ সত্য, তেমনই চারযুগ ধরে মানুষেরই অন্বেষণ বলে মানুষ সত্য, কাম সত্য, করণ সত্য। আর যেখানে মানুষের লীলা, যেখানে কাম ও করণ, যেখানে দেবতা নেমে আসেন অবতার হয়ে সেখানে অর্থাৎ মাটিতে রয়েছে সাহেবধনীদের শেষ সত্য।

নাই এমন আর
এই মাটিকে খাঁটি কর মন আমার।

মাটি ব্রহ্মাণ্ড মূলাধার।
এই মাটিতে দীননাথ হয়েছেন অবতার॥

শুধু ব্রহ্মাণ্ডের মূলাধার বলে নয়, নয় অবতারবাদের লীলাভূমি বলে, পরবর্তী সম্প্রসারণে তাই বলা হয় :

নীচ হয়ে রয়েছেন মাটি
এই মাটিতে বসত বাটি
হ'লে মাটি ম'লে মাটি
মন মাটি কর সার।
চাষ আবাদ হয় এই মাটিতে
ফলে তায় নানা শস্য জীবাহার॥

মধ্যযুগে উদ্ভূত এই লোকধর্ম আমাদের সামনে যে চিন্তা তুলে ধরে তা যেমন বিস্ময়কর তেমনই সর্বাধুনিক। এ ধর্ম জানায় যে, 'স্বর্গ সত্য এই মাটিতে'। আমরা অভিভূত হয়ে ভাবি চিন্তার এতটা অগ্রগতি সামান্য কজন অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে এতদূর কী ক'রে ঘটেছিল? তাঁদের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি থেকে এমন ভাবনাও এসে যায় :

পাহাড় আর পর্বত গাছ পাথর হ'ল মাটিতে
এই মাটিতে তলাতল ভূতল পাতাল নিরাকার॥

মাটিতে পাহাড় পর্বত গাছ পাথর লীন হয়ে থাকার সত্য যেমন বিস্ময়কর-ভাবে এসেছে সে যুগের পক্ষে খুব অগ্রবর্তী ভাবনায়, তেমনই ভূতল পাতালকে নিরাকার বলার মধ্যে রয়েছে এক ঋজু মনীষার লক্ষণ।

এই নিরাকার অতলশায়ী পাতাল তলাতলের প্রতিমা, সাধক-গীতিকারকে আরও গভীরের দিকে টানে। তিনি নিজের অন্তরকেই উদ্বুদ্ধ করে বলেন 'ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন' কেননা তলাতল পাতাল খুঁজলেও রত্নধন মিলবে না। কারণ রত্নধন তো তলাতল পাতালের গভীর জটিল অতলে নেই। আছে রূপে অর্থাৎ মানুষে। সেই রূপের মধ্যে স্বরূপের অন্বেষণ করতে হবে। মানুষই সেই রত্নধন। অথচ দুঃখ এই যে 'মানুষ রত্ন সযত্ন করলাম না'। তাই নানা গানে মানুষের শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ করা আছে।

আশ্চর্য যে, কুবিরের যে-গানখানি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা, যা কোনো অলৌকিক পরিবহণে পৌঁছে গিয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তার মুদ্রিত রূপ

(শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে) কুবিরের মূলগান তথা সাহেবধনীদের তত্ত্বের একেবারে বিপরীত। শ্রীরামকৃষ্ণ যে-গানটি গাইতেন তার মূল কথা হল :

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্নধন॥

অথচ কুবিরের গানের পুঁথিতে গানটির বক্তব্য সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে বলা হয় :

ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজে পাবি নাক রত্নধন॥

শেষের বক্তব্যটাই তো ঠিক। তলাতল পাতাল খুঁজলেও রত্নধন মিলবে না। কেননা রত্ন তো রয়েছে সামনেই, মানুষরূপে। গানটির পরবর্তী অংশে (যা কথামৃতে নেই) আছে মূল তত্ত্ব এই ভাষায় যে :

আবার বোজ বোজ বোজ বুজলে হবে
সহজ মানুষের করণ॥

'সহজ মানুষের করণ' কথাটি সাহেবধনীদের মতবাদে খুব বড় জায়গা নিয়েছে। কুবির আরেকটি গানে মানুষের করণ ব্যাপারটি বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন :

এই মানুষকে করবে বিশ্বাস
এই মানুষ জানিও সত্য-নির্যাস
এই মানুষ বিনে হবে নাকো
সহজ মানুষের করণ॥

এই মানুষে আছে সেই মানুষ
তার ভাব অগম্য পরব্রহ্ম পরমপুরুষ।
এই মানুষ ধ'রে যাবি তরে।

মানুষ ধ'রে তরে-যাবার সাধনাই সাহেবধনীদের মূল অন্বিষ্ট। তারজন্য রূপসাগরেই ডুব দিতে হবে। রূপ বলতে এখানে বোঝায় কায়ারূপ, যা নরনারীর যুগ্মদেহকে আশ্রয় ক'রে ব্যক্ত। সেই রূপ থেকে হবে স্বরূপের অনুভব। যে কোন বড় সাধক আসলে রোমান্টিক, তাই প্রাপ্তি মুক্তি মোক্ষ তার কখনও আয়ত্ত হয় না। শুধু তার আভাস ধরা দেয় অনুমানে। শুরু হয় এক অনাদ্যন্ত অন্বেষণ। দুরূহের দারুণ আকর্ষণ আর বিফলতাব নৈরাশ্য দোলাচলে বেঁধে রাখে যে কোন সাধক বা শিল্পীকে। তাই 'কোথায় পাবো তারে' আসলে কোন একক বাউলের কান্না

নয়, এরমধ্যে ধ্বনিত হয়ে আছে লক্ষ মরমীর 'আর্তি। সেইজন্য চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে 'লক্ষ যোজন ফাঁক' কোনদিন ভরে না।

সাহেবধনী সম্প্রদায়ের মরমী গীতিকার কুবির গোঁসাইয়ের গানেও শেষপর্যন্ত লেগে থাকে একই অকৃতার্থতার আকুতি, অন্বিষ্টের জন্য সন্তাপ। তাঁর মত সিদ্ধ সাধককেও বলতে হয়:

রূপে নয়ন ডুবলো না রে।
স্বরূপ-সিন্ধুমাঝে কি ধন আছে
তলিয়ে খুঁজে দেখলি না রে॥

নয়ন আমার নয়কো ডুবারী
তলায় নাকো ভেসে বেড়ায় ঐ দুখে মরি।
অমূল্যধন রূপমাধুরী
হেলা ক'রে চিনলিনা রে॥

স্বরূপ আমার রূপের মহাজন
রূপে রূপ ঢেকেছে কি রে ভুবনমোহন।
যে-রূপে ব্রহ্মাণ্ড ভোলে
সে-রূপে মন ভুললো না রে॥

একদিন বিলীন হয়ে যাবে সাহেবধনী সম্প্রদায়। ভেঙে পড়বে চরণ পালের বাস্তু। কুবিরের সমাধিমন্দির মিশবে মাটিতে। কিন্তু থেকে যাবে তাঁদের গান পরাক্রান্ত গ্রাম্য গায়কদের কণ্ঠে। কেননা কুবির আর যাদুবিন্দুর গানে ভরা আছে কোন গৌণধর্ম সম্প্রদায়ের সাধনতত্ত্ব তো শুধু নয়, ভরা আছে চিরন্তন মানুষের কান্না আর খেদ। তারচেয়ে আন্তরিক ও আপন মানুষের আর কিছু নেই।

গান

সাহেবধনীদের আড়াই হাজার গানের মধ্য থেকে এখানে সুনির্বাচিত নব্বইটি গান সংকলিত হল চারটি বিশেষ পরিকল্পিত পর্যায়ে। গানগুলির রচয়িতা দুজন : কুবির গোঁসাই ও যাদুবিন্দু গোঁসাই। এঁদের দুজনের গান এখানে মিশ্রিত রূপে আছে। কুবিরের প্রত্যেকটি গানের ভণিতায় তাঁর গুরু চরণের নাম আছে, যাদুবিন্দুর গানের ভণিতায় আছে গুরু কুবিরের নাম। গানগুলি আলাদাভাবে সনাক্ত করবার এই সংকেত।

মানুষতত্ত্ব গুরুতত্ত্ব মাটিতত্ত্ব সমন্বয়তত্ত্ব

১

মানুষে নিষ্ঠারতি কর, মন !
তবে রতি ফিরবে, জানতে পারবে
মানুষ কেমন বস্তুধন ॥
পরমাত্মা পরম-ঈশ্বর
তিনি সর্ব ঘটে স্থিতি বটে
বেদবিধি অন্তর ।
এবার পরমজ্ঞানে ভাব তাঁরে
হবে ভাবলে ভাবের উপার্জন ॥
এই মানুষকে করবে বিশ্বাস
এই মানুষ জানিও সত্য-নির্যাস ।
এই মানুষ বিনা হবে নাকো
সেই সহজ মানুষের করণ ॥
এই মানুষে আছে সেই মানুষ
তার ভাব অগম্য পরব্রহ্ম পরমপুরুষ ।
এই মানুষ ধ'রে যাবি তরে
গোঁসাই চরণ বলে কুবির শোন ॥

২

যার মনে যে রূপ লেগেছে সেইরূপে সে ডুবে আছে
কেউ ভাবে শ্যাম কেউ ভাবে রাই কেউ নামের মালা সার করেছে ।
রাধাকৃষ্ণ বনমালী কেউ ভাবে চামুণ্ডা কালী
কেউ ভাবে কাষ্ঠপুত্তলি কেউ শিলাবিগ্রহ পুজিছে ॥
এক ব্রহ্ম মহামান্য ভেদাভেদ ছত্রিশ বর্ণ ধারণ ক'রে বাঁচে ।

পরশে পরমেশ্বর জীবাত্মা সব জীবাধার
অসংখ্য লীলে তাহার মূর্তি সব প্রকাশ হয়েছে ॥
কেহ বিষ্ণু পূজা করে কেহ ব্রহ্মরূপ নেহারে
কেহ সাধন করে মহেশ্বরে ।
কেহ সূর্য পানে চেয়ে সাধন করে সিদ্ধ হয়ে
কেহ চন্দন লয়ে ইষ্টাঙ্গে অর্পণ করেছে ॥
গোঁসাই চরণচাঁদের বাক্য যে করে তাহাতে ঐক্য
তাতেই মোক্ষ প্রমাণ নিয়েছে ।
সে কি ভক্ত কোন ঋষি হয়েছে বৈকুণ্ঠবাসী
শোন্ কুবির বেড়ালতপস্বী তোর গতি চরণের নীচে

৩

হিন্দু আর যবনের করণ বলব এখন কায় ।
এরা আসল ছেড়ে নকল ধরে ঠিক যেন পাগলের প্রায় ॥
ছিল নৈরাকার যখন
ভেসে ছিল নিরঞ্জন দেখে চিনতে পারলে না দুইজন
হলো ব্রহ্মা বিষ্টু মনোভীষ্ট
শিব কিঞ্চিৎ ধ্যানে পায় ॥

কোন কোন মুসলমান ভাই হয়ে বেইমান
খোদাকে ত্যেজে আউলে ভজে
মানে না কোরআন ।
ত্যেজে আহানবি কি আজগুবি
সাগুবির দরগাতে যায় ॥

এই পৃথিবী সৃজন ভাই করেছে যে জন
তারে মানে না জন্মকানা হিন্দুদের আচরণ ।
করে দেবীপুজা ভূতের বোঝা রাত্রিদিন বয়ে বেড়ায় ॥
যত আউলে চাষী পীর তারা করেছেন জাহির
মুসলমানে হাজুদ মানে চাটিম কলা ক্ষীর
দেয় খোদার নামে লবডঙ্কা সালাম করে গাধার পায় ॥

হিন্দুর অসংখ্য ঠাকুর যেমন পাদাড়ে ভাশুর
নেংটা হয়ে ঘোমটা টানে লজ্জাতে প্রচুর।
এরা নিজপতি চেনে নাকো উপপতির গুণ গায় ॥
এই কলমা কালুল্যা সেই আকবতের হেল্যা
মানে নাকো গেল্যা করে এমনি বেলেল্লা
হলো যার নূরে আলম পয়দা তার কালাম করে না হায় ॥

এই হিন্দুর হাবা পূজে দেবী আর দেবা
জন্মেছে যা হ'তে তারে বলে না বাবা।
তাই দেখে শুনে চরণ ভেবে কুবির কয় হায়রে হায় ॥

৪

কৃষ্ণপদ পাবো বলে মনে বাঞ্ছা করি
সকল বাঞ্ছা পূর্ণ করলেন জগতের ঈশ্বরী ॥
যিনি কৃষ্ণ তিনি কালী
হরিহর একাত্মা বলি
শিবদুর্গা নিত্য বনমালী
তিনি রাম তিনি শ্যাম
হবেন জানি তিনি গৌরহরি ॥
হলেন কৃষ্ণ দশ অবতার ভক্তের কারণ
শুন বলি বিবরণ মরি হায়।
মৎস কচ্ছপ বরাহ বামন নৃসিংহ রাম রাজীবলোচন
জগন্নাথ অধমতারণ ত্রৈলোক্যউদ্ধারী ॥
এক কৃষ্ণ যুগে যুগে হলেন অবতার
নানা মূর্তি চমৎকার মরি হায়।
শ্যামাশক্তি মূর্তির প্রধান
ভক্তি করলে দেন পদে স্থান
বিপদে সম্পদে মান বাড়ান ত্রিপুরারী ॥
হয়েছেন দশমাবিদ্যে আদ্যাশক্তি যে
এ ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে মরি হায়।

চামুণ্ডা মুণ্ডমালিকে খর্পরধারী কালিকে
শম্ভু আর নিশম্ভুকে তিনি বিনাশ করি।।
তিনি কৃষ্ণ তিনি বিষ্ণু তিনি শ্রীহরি
নদের গৌর রূপ ধরি হরিনাম বিলালেন হরি।
ব্রহ্মাণ্ডের মন নিলেন হরি
কুবির কয় চরণ ধরি বলি হরি ।।

৫

করে এমন সাধ্য আছে কার।
সেই বেদ ছাড়া গুরু কল্পতরু
অসাধ্য করণ তার ।।
গুরুর করণ এমনধারা
জীয়ন্তে হইবে মরা
অনলে মিশালে ঘৃত
গলে না এক বিন্দু তার ।।
অন্য ধর্ম না যজিবা
অন্য দেব না পূজিবা
গুরু পরমার্থ সেবা
উত্তম অধম নাই বিচার ।।
গোঁসাই চরণ বলেন কুবির
হতে পার ভাবের ফকির
গুরু হবেন ভবনদীর
পারাপারের কর্ণধার ।।

৬

রাম কি রহিম-করিম-কালুল্যা-কালা
হরি হরি এক আত্মা জীবনদত্তা এক চাঁদ জগৎ-উজ্জ্বলা।
আছে যার মনে যা সেই ভাবুকতা
হিন্দু কি যবনের বালা।

নিরঞ্জন নিরাকারে ভেসেছেন বিশ্বভরে
ব্রহ্মা আর বিষ্ণু তারে চিনিলে না করি হেলা
সেই ষড়মাংস অঙ্গ যেন
কিঞ্চিৎ ধ্যানে জানে ভোলা ।।
লক্ষ্মী আর দুর্গা কালী ফতেমা তারেই বলি
যার পুত্র হোসেন আলী মদিনায় করে খেলা
আর কার্তিক গণেশ কোলে ক'বে
বসে আছেন মা কমলা ।।
কেউ বলে কৃষ্ণ রাধা কেউ বলে আল্লাখোদা
থাকে না তেষ্টা ক্ষুধা ঘুচে যায় জঠর জ্বালা ।
মনে ভেবে দেখ এক সকলে পরো রে এক নামের মালা ।
এক লয়ে ভাগলবাটি এক পানি আছেন মাটি
এক হাওয়া জানো খাঁটি একের কবল এ কলা ।
কুবির বলে করি এক ভাবনা অঙ্গে মাখি চরণধুলা ।।

৭

সর্ব্বদেবে ভক্তি বিশ্বাস কররে আমার মন । পাবিরে নিত্য বস্তু ধন । তিনি বাঞ্ছা-কল্পতরু অখিল ব্রহ্মাণ্ডের গুরু । সেই দীননাথ তিনি করেছেন ভক্তের কারণে বহুরূপ ধারণ ॥

তিনি কায়া তিনি ছায়া তিনি দয়া তিনি মায়া তিনি কাশী তিনি গয়া
তিনি গোলোক বৃন্দাবন । সর্বধামের পাত্র তিনি বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণ ॥
তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-কর্তা পালন-কর্তা প্রলয়-কর্তা পরমেশ্বর পরমার্থ জীবাত্মা
জীবের জীবন । সর্বঘটে আবিভূ'তা সর্বময় শক্তি সুলক্ষণ ॥
তিনি ব্রহ্মা তিনি বিষ্ণু তিনি শম্ভু তিনি কৃষ্ণ তিনি সর্বলীলের শ্রেষ্ঠ
তিনি ব্রহ্ম নিরঞ্জন । চারিযুগে ভাব প্রকাশিলে মানুষ রূপ মানুষের চরণ ।।
তিনি শক্তি তিনি শ্যামা তিনি উমা তিনি ধূমা তিনি ক্ষেমঙ্করী ক্ষেমা
দশমহাবিদ্যে দরশন । দশ অবতার রূপ বিভিন্ন বরাহ নৃসিংহ বামন ॥
ঋতুঘট মনসা মাখাল হরি ষষ্ঠী কাল মহাকাল মঙ্গলচণ্ডী সর্বকুশল
গ্রাম্য দেবতার রূপ কল্পন । ঘটে বিরাজ করেন রূপ ধরেন বাঞ্ছা যার যেমন ।।
তিনি পশু তিনি বৃক্ষ তিনি নানা জাতি পক্ষ তিনি জীবের প্রাপ্তি মোক্ষ
তিনি ত্রৈলোক্যতারণ । তিনি শিষ্য তিনি গুরু কুবির কয় ধরে চরণ ।।

৮

আছে বারি পয়দা করি শরিক নাইকো তার
কি স্ববেদে মহম্মদের নূরে পয়দা এ সংসার
এ সব কিতাবে লিখেছেন সত্য যথার্থ
কই সারবার খোদ নিরঞ্জন নিরাকার।
ভেসেছিলেন বিম্ব ভরে
হয়েছেন কুদরেতের জোরে নীরেতে সাকার।
আল্লা আলেকেতে আলোকলতা
আলেকে করেন বিহার ।।
লা এলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মাদুর রসুল-উল্লাহ
রাম কালা কালা কালুল্লা
করবে মন সার।
আল্লা মহম্মদ রাধাকৃষ্ণ একাত্ম একাত্মা সার ।।
আধকার প্রকাশ্য দিন দীন মহম্মদ দীনের অধীন
যারে মেহের আল্লা আল্‌মিন দোস্ত সে খোদাব
আল্লাব নামের উপর নামের জাহির
কীর্তিভারি চমৎকার।

এক হাতে বাজেনা তালি এক সুরের কথা বলি
নীরে ক্ষীরে চলাচলি বীজের এই বিচার।
পিতা আল্লা মাতা আহলাদিনী
মম বোঝা হলো ভার।
হর্দ তারিফ সেই কারিগর ঘরের মধ্যে বানিয়েছে ঘর
বিরাজ করে আপনি অধর
খোলা নয় দোয়ার
করেন হাওয়া রূপে আসা যাওয়া কুবির কয় চরণ ধরে ।।

৯

প্রেম কভু বিচ্ছেদ ছাড়া থাকে না। ভারি ভাব ভুজনা। ও যেমন সোনাতে সোহাগা মাখা রূপের দিতে নাই তুলনা ।।
মেঘের লক্কার হেরে ময়ূরী নৃত্য করে পবন হিল্লোলে যায় সে মেঘ উড়ে

ও সেই নবঘনের বারি বিনে চাতকিনীর প্রাণ বাঁচে না ।

বিচ্ছেদ প্রেম দ্বিগুণ বাড়ে হেম ঝলকে গোঁড়ে গোঁড়ে যায় মলা মাটি ঝেড়ে
খাস্ত বাটা থাকে না । সে অমূল্য রতন প্রেম আভরণ করে
সহ দণ্ডে তার তাড়না ।।
পদ্মের মৃণালে কাঁটা চন্দ্রেতে কলঙ্ক খোটা বিষম সুখের ছটা উত্তাপ সহে না ।
আছে যেখানে দুখ সেইখানে সুখ পূর্বাপরে এই ঘটনা ।।
প্রেম অনুমত্তা চকাচকি সর্বদা রয় মুখামুখি উভয়ে দুখের দুখী এমন
আর মেলে না । কিন্তু রজনীতে দুজনাতে জন্মে হয় না দেখাশুনা ।।
ভানু আর নলিনী যেমন লক্ষ যোজনান্তে দুজন জন্মেতে হয় না মিলন
কিরণে সান্ত্বনা । কুবির বলে আমার মনে প্রাণে চরণে সুযোগ হয় না ।।

১০

মানুষ হয়ে মানুষের করণ কর দেখি রে মন । মানুষে বিশ্বাস কররে পাবিরে
মানুষের দরশন । মানুষ নিত্য মানুষ সত্য ত্রিবেদ মানুষের গঠন যেমন
পঞ্চ বর্ণ গাভীরে মন দুগ্ধ হয় তার একবরণ ।।
মানুষ হয়ে মানুষ মানো মানুষ হয়ে মানুষ জানো মানুষ হয়ে মানুষ চেনো
মানুষ রতন ধন । মানুষ মন ছাড়া বেদ বিধি ছাড়া বিরজা পার তার আসন
সেই মানুষ জীবাত্মা জীবের জীবন ।।
চারিযুগেতে মানুষ আছে সেই মানুষ মানুষের কাছে বহুরূপ ধারণ
করেছে মানুষ মানুষের কারণ । আবার তার উপরে মানুষ আছে মানুষ
প্রাপ্তি বস্তু ধন । কর সেই মানুষের অন্বেষণ ।।
মানুষ সেই ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিরাজ করেন ব্রহ্মরূঢ়ে মানুষ আছে ধড়ে ধড়ে
অসাধ্য হয় তার করণ । জলে স্থলে হৃদকমলে মানুষ নয় মানুষের
বোলে কুবির বলে ধরে শ্রীচরণ ।।

১১

জানি আল্লা আর রছুল বিভিন্ন নয় । যুগল রূপ রাধাকৃষ্ণ বলি স্পষ্ট সর্বঘটে
পটে রয় । হিন্দু মুসলমানে সবাই মানে বোঝেনা ভাবের নির্ণয় ।।
যুগল মন্ত্র আল্লা রছুল । খোদ আল্লা লা-সরিকালা বলে ঠিকে ভুল যায়ে
বেকুবুল একে দুয়ে ভয়,ভালো একে সৃষ্টি হয় কেমনে কেবল ভুতের পরিচয় ।।

সৃষ্টিকর্তা এক নিরঞ্জন। হিন্দু যবন জাত নিরূপণ দুই কিসের কারণ।
পুরুষের লক্ষণ প্রকৃতি আশ্রয়। হলো যুগলেতে জন্ম সবার মর্ম বোঝে মহাশয়।
মুসলমানে খায়না কাটা জবাই করে দণ্ডে মারে রাখে এক ফোঁটা। বাঁদায়
নেটা বালিকে সব সয়। করে শেষে মোল্লা কেটে কল্যায় হারামখুরি সমুদায়॥

শনি শুক্রকুল বীজরূপে এক। আব আতস খাক বাদ চারে এক চারের মধ্যে
এক। মনে বুঝে দেখ সৃষ্টির বিষয়। আল্লা আত্মারূপে সব শরীরে বিরাজ
করে সর্বময়॥
সব হিন্দুতে দেবী পূজা করে ধরে পাঁঠা কামারবেটা এক কোপে মারে।
তার শরীরে নাইক ধর্মভয়। কিন্তু দুইজাতে এক সমান বটে
ভাবে পেলাম পরিচয়॥
খোদায় তালায় সৃষ্টি করে হাওয়া রূপে সব শরীর মধ্যে বিহরে। নিয়ম
ধরে মহাত্মা রয়। দেখ রাম রহিম এক বস্তু বটে চরণ ভেবে কুবির কয়॥

১২

মন আমার অমান্যকে মান্য কর মাণিক ঝুটো। জোনাক পোকার আলোক দেখে
চাঁদকে বলে মাতাল ফুটো। শুনি এ বড় আশ্চর্য কথা আম্র চেয়ে আমড়া মেঠো।
ঘোরেনাকো মনের ধোকা। ভ্রমরকে কয় গুবরে পোকা অঙ্গেতে যার গোবর মাখা
মধু খায় না কুড়ায় খুঁটো। বলে কোকিলে আর কাকে তুল্য মশার চেয়ে হস্তী
ছোট।

দেখে সেই বিলাতি গোরা। বলে তাদের নদের গোরা। মনে হয় আঁদয়ারা
নয়নতারার পারা-উঠো।
করে ঋতুর ঘটের পূজার ঘটা জগন্নাথকে বলে ঠুঁটো॥
স্বর্ণ চেয়ে পিতল ভালো। উজ্জ্বল রূপ ঝলমল। রং দেখে মন ভুলে গেলো
যার তোলার মূল্য পয়সা ছুটো
মনে শামুকের ডিম যত্ন করে মুক্ত ছিটায় মুটো॥
মাটির বাসন শানকি করা। যাজন করে দরবেশরা। খাল গড়ে মানেনা
তারা ছুটক নেড়া মুলুক মটো।
কুবির চরণ ভেবে বলে করি দেখে দন্তে কুটো॥

১৩

তোরাই কি রসিক মেয়ে। দয়া নাই ধর্ম নাই জীর্ণ করিল পুরুষ খেয়ে।
শ্যামা সতী হয়ে পতির বক্ষে নৃত্য করে ন্যাংটা হয়ে ॥
আদ্যাশক্তিরূপা মেয়ে ত্রিদেবতা প্রসবিয়ে খট্টাঙ্গ পরে বসিয়ে ছিলেন রাজেশ্বরী
তাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ রুদ্র আর্দি আছেন বোঝা বয়ে॥
মান গৌরবে ছিলে প্যারি। পায়ে ধরে তায় সাধলেন হরি। হয়ে ছিলেন
জটাধারী করে শিঙে ডম্বুরু লয়ে। তবু রাই তারে করলে না দয়া পাষাণ কায়া
কঠিন হিয়ে ॥

সংসারেতে মেয়ের জারি। মেয়ের গুণ কি বুঝতে পারি মেয়ে এক রাজকুমারী
কুলের প্রদীপ কুল মজাইয়ে। মেয়ের নিজ পতির মাথা কেটে বেরিয়ে গেছে
কোটাল লয়ে ॥
অন্তে পতি বাহ্য পতি। পুত্র পতি পশুপতি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের পতি
আছেন মেয়ের ঋণী হয়ে।
মেয়েরে লুকাইয়ে রেখেছেন পতি রূপেতে রূপ আশ্রয় দিয়ে ॥
জন্মদাতা পিতা হতে। জন্ম মেয়ের উদরেতে। পড়ে সেই মেয়ের হাতে
দায়ে পড়ে হয় করতে বিয়ে।
মেয়ে কোম্পানী ভিক্টোরিয়া রাণী বসেছে বাদশাই পেয়ে ॥

মেয়ে জগৎ কর্তা বটে। সবাই মেয়ের বেগার খাটে। মেয়ের
নিলে মুলুকলুটে হটে বেড়ায় পুরুষ ভেয়ে।
খেদে চরণ ভেবে ফকির বলে কাজ কি মেয়ের কথা কয়ে ॥

১৪

যে যেমন সেই নাম সাধনা করে। হিন্দু আর মুসলমানে যারে মানে
ভক্তি অনুসারে। করে ভাবেতে লাভ ভাবে অভাব এসে এ সংসারে ॥
উত্তম অধম হিন্দু যারা। রাধাকৃষ্ণ ভক্ত তারা। গুরু ছত্রধারা মন্ত্র জপে অন্তরে।
বলে হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে রাম হরে হরে ॥
মধ্যবিত্ত যবানেরা পান্তভাতে আপনি মরা পেটের জন্যে খেটে সারা হয়
পরিবারের তরে। বলে সেবার সময় আল্লা রছুল পেট ভরে ঘুম মারে ॥

দেখি পঞ্চপরিবারে। বৈষ্ণবিরে শংখ পরে। গৃহীর মত ব্যবহার করে
অনেকে ব্যবসায় ফেরে। কভু ভিক্ষার ছলে হরি বলে বেড়ায় দ্বারে দ্বারে ॥
ফরাজিরে রেখে দাড়ি রুজু করে ঘড়ি ঘড়ি নামাজ পড়ার হুড়োহুড়ি
যার যেমন ভাব অন্তরে। পড়ে আল্লা হামদা মামুদ ভয়ে মাথা কুটে মরে ॥
অদ্বৈত অবধোত নিতাই দরবেশেরা বলেন তাই গৌর প্রেমে পেলে না খাই
পড়ে মাঝ পাথারে। তারা রস মেরে রস খাঁটি করে রসতত্ত্বে ফেরে ॥
কেউ ভাবে পীর মাণিক মাঁদার। মল্লিকগ্রাম ভক্ত খোদার। কাটাপীর বাবাতে
সোয়ার নাম জারি অনেক দূরে। তাদের নাম করে খায় ভিক্ষা করে
ফকির বাবাজীরে ॥
দ্বিজ দীক্ষে দুর্গানামে। বলে তারা উমে ধুমে কুলায় কালীয়ে দুর্গমে
পড়েছি ভবঘোরে। বলে চামুণ্ড চণ্ডিকামাতা খেঁচুড়ি খাবিরে ॥
যে জন আছে হকের পথে। সেই মজেছে হকনামাতে। পার হবে সেই পুণ্যস্রোতে
যাবে ভেস্তের মাঝারে। নাই তার মনেতে মলামাটি চলে খাঁটির পরে ॥
ব্রহ্ম অধিকারী লোকে। ব্রহ্ম মন্ত্র উপাসকে ব্রহ্মময় সকলি দেখে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডদরে
দেখে কুলকুণ্ডলিনী হৃদিপদ্মের মাঝারে ॥
দিনের ভাবনা ভাবি একা। করি সদা দিনের লেখা। কবে পাবো দিনের
দেখা অন্ধকার যাবে দূরে। প্রভু দীননাথের চরণ ভেবে কুবির কয় কাতরে ॥

১৫

ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন
তলাতল পাতাল খুঁজে পাবিনাক রত্নধন ॥
চুপ চুপ চুপ চুপে চাপে হয়ে থাকো সচেতন।
আবার দুপ দুপ দুপ জ্ঞানের বাতি হৃদয় জ্বলবে সদক্ষণ ॥
খোঁজ খোঁজ খোঁজ হৃদয় মাঝে দেখতে পাবি বৃন্দাবন।
আবার বোজ বোজ বোজ বুজলে হবে সহজ মানুষের করণ ॥
ডেঙ ডেঙ ডেঙ ডেঙ্গায় ডিঙে চালায় আবার সে কোন্ জন।
শোন মন মন মন এ মনেতে ধর গুরুর শ্রীচরণ ॥

১৬

গুরু তেজে হরি ভজে পাইনাকো নিস্তার
পরকালের কার্য কিন্তু হয় না তার।
যে জন গুরু চেনে না ভজনহীন ডহর কানা
সে পাপী গুরুর কথা শোনে না।

হয়ে রয় ঘাসের প্রজা মন-রাজার গুরু অমূল্যরতন গুরুবাক্য মূল ভজন
গুরু কৃষ্ট গুরু বোস্টম গুরু নিত্যধন ও যে গুরুর চরণ করে স্মরণ হবে
ভবসিন্ধু পার।

যারা গুরুকে ভুলে হরি হরি বোল বলে, গাছের গোড়া কেটে যেমন
আগায় জল ঢালে

তারা পাবে সাজা দেখবে মজা হবে ভূত রাজার এয়ার।
ধরে গুরুর চরণে থাকো হরিসাধনে মোক্ষধামে যাবে চলে সাধনের গুণে
হ'ল গুরু-ভক্ত জগৎ ব্যক্ত গলে হরি-মুক্ত-হার।
ও যার গুরু নামে দ্বেষ মজা দেখবে অবশেষ লোহার মুগুর মারবে শমন
ধরে শিরের কেশ।
গোঁসাই কুবির বলে বিন্দুযাদু বুঝে নাও করে বিচার।

১৭

গুরু ছেড়ে গোবিন্দ ভজে সে পাপীর জায়গা হয় নরক মাঝে
কাঠের মালা টিপলে কি ভাই পাবে সেই রসরাজে।
সঙ্গদোষে সব গেলি ভুলে শুধু পাতায় কি তোর ফল ফলিবে
মূল কেটে দিলে।

হাটে হারিয়ে মামা হয়ে ভোমা মাঠেতে বেড়াস্ খুঁজে
কোন্‌কালে হয় খেই ছেড়ে মারণ খেপা ফুল বিনে
সেই কলার ছোটা (ছড়া) কে করে ধারণ।
আবার হাল বিনে চলে না তরী ভালো করে দেখ বুঝে।

দেখ দেখি মন জাঁতার থাকলে নাই
অতি যত্ন করি মুগ মুসুরির ডাল ভাঙে সবাই

হ'লে নাই ছাড়া না-কারা (কাঁড়া) জাঁতা পরে রয় কাজে কাজে।
মোটামুটি প্রমাণ বলে যাই ও এই বাছুর দুয়ে দুধ কি মেলে
বনে গেলে গাই।
গোঁসাই কুবির বলে বিন্দু যাদু হাড়পেকে পাজী নিজে॥

১৮

ভয় করে না তাতে যার আছে গুরুর প্রতি নিষ্ঠারতি
হেলায় পারে সাঁতার দিতে।
রসিকে সেকি পড়ে পাকে, ডুবে সে তত্ত্ব মিলায় সেই বাঁকেতে॥

মহারসের রসিক হলে বাঁকা নদীর বন্তে এলে
আনন্দে সাঁতার খেলে চলে যায় উজান স্রোতে,
ও সে গভীর জলে ডুব মেরে বসে থাকে দম ধরে,
তারে সেই কাম-কুম্ভীরে রে মন, নারে ছুঁতে॥
বাঁকা নদীর বাঁকে বাঁকে কত শাকনী ডাকনী বসে থাকে
কাঁচা জীব দেখলে চোখে ঘাড় ধরে ফালায় (ফেলায়) পুঁতে
ও যার শক্তিতে ভক্তি আছে ও তাই শাকনী যায় না তার কাছে
ও রসিক ঠিক জেনেছে ঠিকানাতে।
গোঁসাই কুবির গুণনিধি বৃত্তিহুদোর গ্রামে গদি
সাধন করেছে চাঁদি শ্রীচরণে মন গেঁথে।
ও সেই যাদুবিন্দু জুয়াচোর ও তার বৃথা পরা কোপনী-ডোর
আছে সেই বোকার কুঁড়ে পাঁচলকিতে॥

১৯

মন তোমায় খেলার কথা বলে যাই।
যাতে গুরু বস্তু লভ্য হবে সেই খেলরে ভাই॥
কার্য নাশা তাস পাসা খেলা ও তা খেলতে খেলতে চেয়ে দেখো
বোয়ে যাবে না।
সাধুর সনে সরল মনে খেলে নিও খেলা সর্বদাই।
ভোলানাথের খেলা চমৎকার ও ভাই তার মতো খেলা আর

খুঁজে মেলে নাকো আর।
অমর ভোলা করে খেলা ও তা সাধু মুখে শুনতে পাই ।।
মন তোমার খেলার কলাবনে যাই ।
সুখের খেলা বলে সকলে খেলা-খেলা খেলতে খেলতে
কতজনা পড়ে যায় তলে ।।
কাঙাল যাদুবিন্দু বলে আমার যা করেন কুবির গোঁসাই ।।

২০

গুরু কৃষ্ট বোস্টম গোঁসাই সমান তিনজনে
শোন বলি মন ছোট বড় করিস নে ।।
সাধু-বদনে শুনি জগতের চিন্তামণি
গুরু রূপ ধরে সদয় হন তিনি মন্ত্রদান করেন শিষ্যর শ্রবণে ।।
যদি গুরু চেনো মন পাবে কৃষ্ট দরশন
পরম সুখে রয়ে যাবে বৈকুণ্ঠ ভবন
হলে গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি সাজা দেবে শমনে ।
সদা সাধু সঙ্গে চল যাতে ফলিবে সুফল
খেতে শুতে পথে যেতে গুরু সত্য বল ।
আপন দেহ জীবন কর নিবেদন সাধু গুরু চরণে ।
করো স্মরণ হৃদয় দিয়ে গুরু নামে জয়
নয়ন দিয়ে দেখ চেয়ে গুরু জগতময় ।
যখন এভাব হবে মিশে গুরু শিষ্য একমনে ।।
হলে শিষ্য-প্রকৃতি করে গুরুকে পতি
প্রাণ সঁপে শ্রীগুরুর পদে ক'রে পিরীতি
যাদুবিন্দু কানা ভাব জানে না চেনে না কুবির ধনে ।

২১

রেখে অন্তরে দ্বেষ বেশ দরবেশ হয়েছে রে মন আমার ।
পরেছো রঙিন বেহাল গাঁজায় মাতাল ভজনের লেশ নাই তোমার
তোমার রসনায় বাসনা করে মিছরি মাখন সরভাজার ।।

সে ধর্ম জানে যে জনা কভু শাকে নুন জোটে না
কভু গলিত পত্র করে আহার তারা কভু থাকে উপবাসী
রূপ সনাতন যে প্রকার।
বেশ করে বেঁধেছো খোঁপা চারিদিকে পুষ্পচাঁপা
আয়না ধরে দেখছো মুখের বাহার।
গলার মালা ছিঁড়ে মাথা নেড়ে যাবে ভব-সিন্ধু পার ॥
বাড়ী বাড়ী ভাত তরকারী করে বেড়াও মাধুকরী
তাতে কি ভাই ঘুচবে মনের বিকার
গিয়ে রূপনগরে রূপের ঘরে করলে না সেই রূপ নেহার ॥
রঙ্গে মেতে সঙ্ সাজিলে তাতেই কি সেই রত্ন মেলে
গোঁসাই কুবির কহিছেন বারেবার।
যাদুবিন্দু ঢেঁকি ফাঁকি ঝুঁকি দেখলে না সাধুর বাজার ॥

২২

বেটা কি বেটি সেটি সন্ধ তাই।
কিভাবে করি সাধন ভাবছি এখন কার কাছে সে সন্ধি পাই।
ও সে নিরাকার কি সাকার মানুষ স্থির করে কয় কোন্ গোঁসাই।
কেউ বলে প্রধান নারী কালোরূপ দিগম্বরী
কেউ বলে গৌর হরি জগত মাঝে আর কেহ নাই।
আবার কেউ বলে তার উপর আছে নৈলে কি কাঁদে নিমাই ॥
কেউ বলে নীরদবরণ প্রধান রাম রাজীবলোচন
কেউ বলে সেই প্রাণধন বৃন্দাবনের নন্দের কানাই।
আবার কেউ বলে সে সেইটির তরে রাই ব'লে কাঁদে সদাই ॥
যবনে করে কবুল এলাহি পুরুষ মাকুল
দোস্ত যার হজরত রছুল কোরাণ বিচে লিখেছে তাই।
তিনি কোন্‌খানে তার রূপ দেখেছে ঠিক ঠিকানা শুনতে চাই ॥
কথা কয় ফাঁকা ফাঁকি এই যাদুবিন্দু ঢেঁকি—
অধিক আর বোলবো কি তুষ কুটে লাভ করবি কি ছাই ॥
ও তোর দিন ফুরোলো সন্ধে হ'ল কুবির পদে করগা ঠাঁই ॥

২৩

আমার নাম কুবির দীনহীন। এই দিনের অধীন হয়ে আছি চিরদিন আমি রাত্রদিন ভাবি মনে দীননাথ কি দিবেন দিন। এই দিন গেল বিফলে আমি আর কি পাবো এমনদিন॥

আমি সন্ন্যাসী উদাসীন। থাকি চরণ তলে চরণ ভাবি নিশিদিন। আমি সাধুর দ্বারে পাতড়া চাটা ফুলে খোটা বছর তিন। করি গুরু প্রতি নিষ্ঠে রতি যাবে সকল পাপের ঋণ॥

যখন যা মনে করি সকলি কর্তে পারি ভেবে দীনদয়াল হরি। সেই নামের গুণে বেড়াই তাল ঠুকে। তুই নিজে গাধা ওরে হারামজাদা মানিসনে খোদা কেনে খামকা কটু বলিস আমাকে॥

যে যা বলে তাই শুনি। ওরে তাতে আমার হয়নাকো হতমানী। এই নিদানের কাণ্ডারি আছেন আপনি কাদেবগণি। তুই মরবি ডুবে গোলামজাদা করিস কেনে শয়তানি॥

নাই মান অপমান আমার। মান রাখে যদি আল্লাহাদি পোরু আর। তবে পরোয়া কারে করি ওবে পাজির বেটা কুলাঙ্গার। ওরে হক পথেতে ভয় কি যেতে হুকুম আছে হকতালার॥

ওরে নাই আমার ঘরদুয়ার এই নাম ভরসা শ্রীগুরু করেছি সার। এই পরমার্থতত্ত্ব জানলে তাতে নাইক জাতবিচার। থাকি সাধুর সঙ্গে রসরঙ্গে ব্যাজতে কি হয় আমার॥

আমার নাম কুবির কবিদার। এই দেশে দেশে বেড়াচ্ছি ক'রে রোজগার। আমি সব ছেড়েছি সব করেছি দীনের কর্তা সে মোক্তার। হ'ল তাতে বাদী মিথ্যা-বাদী শুকরুল্যা কসমদার॥

আমি নয় কিছু এলেমদার। সেই কেতাব কোরাণ জানিনেক সন্ধি তার। শুনে না সাধুর মুখে প্রেমের কথা হকনাম করেছি সার। হ'ল তাতে মুগ্ধ মুলুকশুদ্ধ ক'রে কি করে ভাই॥

আমার ভরসা বারি। কারু ভয় নাইক করি। রয়েছি বরাবরি। নামের গুণ জাহির হবে আমার ঠাঁই। আমি নামের কাঙাল ও সেই প্রেমের কাঙাল চরণের কাঙাল। কাঙাল বলে হেনস্তা কেনে করো হে ভাই॥

আমি তোদের শত্রু নই। জাতে হিন্দুর ছেলে আল্লা ব'লে করি শমনজয়ী।
তুই ধরেছিস ফয়জুল্যার পাছা শুকনো ছেঁচা তোরে কই
তাই কুবির বলে কাতর হালে জানিনেক চরণ বই॥

২৪

তেম্নি মন ঘুরিয়ে মারে আমারে। যেমন উপুসে সন্ন্যাসী ঘোরে
চড়ক গাছের উপরে॥
তিলার্দ্ধ স্থির হইতে নারি ভুলে পরমার্থ স্বর্গ মর্ত্য সর্বদা ঘুরি।
হরিশ্চন্দ্র রাজা যেমন ঘুরতেছে শূন্য ভরে॥
ঘুরে ঘুরে হলো ঘুরণবাই পড়ে মায়া-ঘোরে মন-চক্রে ঘুরতেছি সদাই।
মাটির বাসন গঠনেতে চাক ঘুরায় যেমন কুমোরে॥
এমন করে ঘুরব আর কত এসে জন্ম ভূমে বেড়াই ভ্রমে কুকর্মে রত।
চরণ গোঁসাই বলেন কুবির থাক গুরুর চরণ সার করে॥

২৫

রূপে নয়ন ডুবলো নারে। স্বরূপ-সিন্ধুমাঝে কি ধন আছে
তলিয়ে খুঁজে দেখলি নারে॥
নয়ন আমার নয়কো ডুবারী। তলায় নাক ভেসে বেড়ায় ঐ দুঃখে মরি।
অমূল্যধন রূপমাধুরী হেলা করে চিনলি নারে॥
স্বরূপ আমার রূপের মহাজন। রূপে রূপ ঢেকেছে কিবে ভুবনমোহন।
যে রূপে ব্রহ্মাণ্ড ভোলে সে রূপে মন ভুললো নারে॥
নয়ন আমার হয়েছে কানা। স্বরূপ কেমন রূপ কেমন তা চিনতে পারলে না।
ঝলকে রূপ কাঁচা সোনা সে রূপে মন মজলো নারে।
গোঁসাই চরণ বলেন কুবির শোন্, শ্রীচরণের রেণু লয়ে পররে অঞ্জন।
তবে হবে দিব্য নয়ন চর্ম চক্ষু থাকবে নারে॥

২৬

কে আমায় ঘুরাইয়ে মারে। কার দোষ দিব বলো সবাই ভালো
বলব কি বিধাতারে। যেমন অন্ধ গত শনির দৃষ্টে তিষ্টিতে না দেয় ঘরে।।
দেহের মধ্যে রাজা আমার মন তারি আজ্ঞাকারি হয়ে চলে রিপুগণ।
থাকে কানা ভাঙ্গা মঙ্গলচণ্ডী ষোলো জনা এক ঘরে।।
গুরু সাধ্যসাধন করতে চাই কু বাতাসে অঙ্গে এসে লাগে উড়ো ছাই।
যেমন দুগ্ধেতে গোচোনা মিশে সকলি নষ্ট করে।।
করতে হলো মিথ্যে এ আপশোষ জন্ম দোষী কর্মদোষী আমারি সব দোষ।
কুবির মনের খেদে বলে কেঁদে শ্রীগুরুর চরণ ধরে।।

২৭

একের সৃষ্টি সব পারি না পাকড়াতে।
আল্লা আলজিহ্বায় থাকে আপন সুখে
কৃষ্ণ থাকেন টাকরাতে।
হ'ল এক নামেতে কৃষ্ণের প্রকাশ
বাস করে এক আখড়াতে।।
ভাই করেছে হিন্দু যবন
কুলীন বা কে চেমন বা কে হয় না নিরূপণ।
হয় কে ব্রাহ্মণ মন্ত্র পড়াতে
আবার কে করে কার ফয়দা দরূদ
বাঁচিনেকো ঝগড়াতে।।
মান্য হ'ল কোরাণ পোরাণ
জলকে পানি বলে জানি দুয়ে এক সমান।
একের কাঁকড়াতে সত্যনীরে
নিরঞ্জন ভেবেছেন আবার শূন্য কুদরতে।।
মুসলমানের আল্লাতালা
হিন্দুর কৃষ্ণ ব্রহ্মা বিষ্ণু ভাবে বিভোলা
এক ঘরে খেলা করে পিঞ্জরাতে।

খানা দানা পানি একই জানি
বিরুদ্ধ হয় ফুকরাতে ॥
আবার শূন্য বর্ণ বিচার
পরমার্থ মনস্তত্ত্ব অর্থ কর সার।
যেমন বুদ্ধি যার হয় অন্তরেতে।
কিন্তু এক বিনে কিছু হবে না
ঠিক থাকে এক টেওরাতে ॥
এক হাওয়া এক আগুন পানি
একে একা দিনের লিখা একই রজনী
সব এক জানি জানি
নারি ঠাওরাতে।
কুবির বলে একা চরণ ভেবে
পড়ে আছি বৌতড়াতে ॥

২৮

এই হিন্দু যবন করলে সেই কে। আল্লা রছুল বা কে। রাম রহিম কালুলা কে। ইহার সৃষ্টি কর্তা কারে বলি পালন প্রলয় করেন বা কে ॥
নাম নিরঞ্জন তিনি একা জন্মে কারু দেননি দেখা। ঘোচেনাক মনের ধোঁকা শুনেছি শাস্ত্রর লেখে। তিনি সাকারা কি নিরাকারা অধরাকে ধরে বা কে। হরি হরি একাত্মা বলি। একা শক্তি দুর্গাকালী। আহ্লাদিনী চম্পক কলি ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মলোকে।
থাকেন ব্রহ্মাণ্ডে সহস্রারে পূর্ণব্রহ্ম তিনি বা কে ॥
বুঝতে নারি একে একে। দশ অবতার হয়েছেন কে। ব্রহ্মা বিষ্টু মহেশ বা কে। বৃন্দাবন কৃষ্ণই বা কে। বেড়ান কেঁদে কেঁদে নদে পুরে
গৌর বা কে নিতাই বা কে ॥
পরমাত্মা পরমেশ্বর। যীশু কৃষ্ণ নাম চরাচর। শাস্তরেতে নয় পরাপর
শুনি যীশুভক্তের মুখে। শুনি অচলা সচলা চল অবলাকে বলে বা কে ॥
এক হাওয়া এক আগুন পানি। এক মাটিতে খাঁটি জানি একা ব্রহ্মবস্তু মানি সর্ববিচার করে বা কে। জানি এক দানা ছুনিয়ার খুঁটি জীবন রক্ষে করেন বা কে ॥

বর্ণবিচার কিসে হলো। দেহ তত্ত্ব জেনে বলো একাত্মা কিসে সঞ্চারিলো মূল এলো তার কোথা থেকে। আছেন সর্বজীবে আবির্ভূতা স্থিতি সর্বজীবস্ত কে ॥ একের কথা সবাই বলে। একের পথে কেউ না চলে। প্রাপ্তিধন মেলে না এক না হলে। একের করণ আছে একে। কুবির বলে চরণ পাবার আশায় ঘুরে বেড়াই পাকে পাকে ॥

২৯

আমি লিখলাম সব ঠিক দিতে পারলাম না। এক চন্দ্র কোটি অঙ্ক পদ্ম শঙ্খ বর্ণ অঙ্ক চিনলাম না। হলাম গুণে গেঁথে বরাহ পাগল হিসাবের গোল বুঝলাম না॥ অগণনায় বর্ণ লেখা। রাধাকৃষ্ণ যীশুখ্রীষ্ট খোদ আল্লা এক। রছুল এক ধোঁকা মিটল না। আর রাম রহিম কালুল্লা কালা সে নামেতে ভুললাম না ॥ সৃষ্টি কর্তা যে হোক বটে। নবদ্বীপে গৌররূপে সকল জাত ছেঁটে করলেন এক চেটে। সে এক মাল্যাম না। তিনি হিন্দু মুসলমানের গুরু জেনেও বিশ্বাস কল্যাম না ॥

ভেক লয়ে বৈরাগ্য হলাম। মুড়িয়ে মাথা ছেঁড়া কেঁথা গলাতে দিলাম। জাত খোয়ালাম কিছুই হলো না। হলো আমা হতে ভেক অমান্য হিংসে নিন্দে ছাড়লাম না ॥

কামার কুমোর তেলী মালী। ভেকের পথে একই সাথে সকলে চলি। মনের কালি তাও ঘুচালাম না। হলাম কাদের অংশ বংশ সেটা নিকাশ করে দেখলাম না ॥

যদি এক পিতা সকলের হতো এক পথে এক সাথে যেতো। এক পাতে খেতো এক নাম নিতো। তাও তো নিলাম না। কেবল পিতার গর্তে ডুবে মলাম পিতার তত্ত্ব করলাম না ॥

গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব বা কে। এক বটে কি ভিন্ন বটে প্রাণ সঁপি কাকে আপন ঠিকে কাউরে আনলাম না। কুবির বলে গুরু নিষ্ঠে করে চরণে মন রাখলাম না ॥

৩০

আছে যার মনে যা সেই ভাবুকতারে আমি রাঙা চরণ ভালবাসি। শুনি তীর্থ যাত্রা সব অযাত্রা আমার যাত্রা গয়া গঙ্গা চরণ কাশী।

নাই আমার অন্য আশা, অন্য ধনে নাই পিপাসা
কেবল চরণচাঁদের সুধায় নেশা পান করে তাই আনন্দ সাগরে ভাসি ।।
সাধন করি চরণমালা, অঙ্গে মাখি চরণধুলা, চরণের গুণ গাই দু বেলা
নির্জনেতে বসি ।
চরণ হৃদি-সিংহাসনে রেখে মনের সাধে দিই তাতে চন্দন তুলসী ।।
হৃদি পদ্মে চরণপদ্ম, রেখে করি সাধনসিদ্ধ, চরণে মন করি বদ্ধ রাখি দিবানিশি ।
আমি মনে বাঞ্ছা চরণ পাব, কিন্তু রে মন হব না বৈকুণ্ঠবাসী ।
শ্রীচরণ সাধন করি, শ্রীচরণের রেণু পাবো, মনের বাঞ্ছা পুরাইবো এই অভিলাষী
কুবির বলে প্রাণ তার সম্পত্তি গলায় পরলো চরণচাঁদের প্রেমের ফাঁসি ।

৩১

আমার মনের কথা হয় মনের সাথে
যখন একলা চলে যাই পথে ।
কত কথা হয়গো মনে হায় গো
যখন একা চলে যাই পথে ।।
দুখের দুখী পেলাম কই
দুটো মনের কথা কই
সবাই বলে 'আমার' 'আমার'
আমার হ'ল কই ?
তারা মিষ্টিমুখো আত্মসুখো
পাষাণ গলায় কথাতে ॥
আমি যে দুঃখে আছি
তোমায় আর অধিক বলব কি—
গাছে যেমন হোঁ হোঁ করে
'ধনসোকা' পাখী ।।
আমার যত ঋণ ছিল
ও সব শোধ দিতে হ'ল ।
আমার রইল দেনা শোধ হ'ল না
কুবির কয় চরণচাঁদের খাতাতে ।।

৩২

সাধনেতে সিদ্ধ হয়েছি—

ভক্তি ভাবেতে কেঁদে প্রেমের ফাঁদে

অধরচাঁদকে ধরেছি।

অতি যত্ন করে রত্ন নিধি

হৃদয় মাঝে রেখেছি॥

ঘুচাইয়ে মলামাটি হয়েছি পরিপাটি

করিনে খুঁটিনাটি

খাঁটি পথে দাঁড়ায়েছি।

আর রূপের সনে ঘরিষণে

রূপে রূপ মিশাইয়েছি॥

ছিলাম অচৈতন্য পেয়েছি চৈতন্য

প্রেম পরিপূর্ণ হয়ে ধন্য বুঝেছি।

ধরাচক্রের মধ্যে অনুরাগী

রাগে রাগ বাড়াইয়েছি॥

শোন কহি সত্যকথা

সতীত্ব পতিব্রতা সত্যতে মুড়িয়ে মাথা

করঙ্গ লয়েছি।

সদা বলি সত্য চলি সত্য

সত্য ভাবে ভুলেছি॥

অসাধ্য সাধন ক'রে রয়েছি চেতন ঘরে

দীপ্তকার অন্ধকারে

কাল মানিক পেয়েছি।

কুবির বিনয় ক'রে বলে

এবার চরণ মনে সার করেছি॥

৩৩

আমি সুখের নাম শুনেছিলাম দেখি নাই তার রূপ কেমন।
আমার দুখ নগরে বাটী পরিবার দুঃখ রাজার বেটি
দুজনায় দুখে করি কালযাপন ।।
সুখের দেখা পাবো বলে এসেছিলাম ভূমণ্ডলে
ঘটলো নাতো এই কপালে
কোন্‌খানে সে হ'ল গোপন ॥
আমি খুঁজে খুঁজে জগত মাঝে পেলাম না তার অন্বেষণ ।।
মনে করি সুখের দেশে সুখী হয়ে থাকবো ব'সে
দুঃখু বেটা তাড়িয়ে এসে কেশে ধরে করে শাসন।
আমি দুখের পথে দুখের মতে দুখের নাম করি সাধন ॥
দুখের বসন ভূষণ পরে ঘুরে বেড়াই দুখ সহরে,
দুখের বেলা দুই প্রহরে দুখের অন্ন করি ভোজন।
দুখের শয্যা পেতে সন্ধ্যাকালে দুঃখেতে করি শয়ন ।।
দুঃখু আমার মুক্তি গতি দুঃখু আমার সঙ্গের সাথী,
হৃদয়ে জ্বলে দুখের বাতি দগ্ধ ক'রে দিলে জীবন।
আমার দুখের কথা রইল গাঁথা করবে কে তা নিবারণ ॥
যাদুবিন্দু মনের দুখে কুবির কুবির ব'লে ডাকে,
একবার দেখা দাও আমাকে বিপদভঞ্জন মধুসূদন।
আমি তোমায় পেলে তোমার বলে দুখের শির করি ছেদন ॥

৩৪

মন আমার ভবে এসে মায়ার বশে কাজ হারালি গোলেমালে।
হ'ল না ভজনসাধন গুরুর করণ বাঁধবে শমন হাতে গলে ।।
দীননাথ দীনের গতি জগতপতি সব জ্বালা যায় শরণ নিলে।
তুমি এই দিনান্তরে একবারের তরে ডাকলে নাকো বঁধু বলে ॥
পেয়ে সব পুত্র নাতি কুলের বাতি হরিনাম গিয়েছো ভুলে।
তারা কি আপনার হবে সঙ্গে যাবে দেখতে পাবে নিদানকালে ।।

মজে এই বিষয় বিষে রঙ্গরসে গরব করে বেড়াও ফুলে।
সে যে ভাই নিশির স্বপন যৌবনধন পলক ভ'রে যাবে চলে ॥
বেড়াচ্ছো ফিরিয়ে টেরি ট্যাঁকে ঘড়ি গজমতির মালা গলে।
যেদিন প্রাণ যাবে ছেড়ে নেবে কেড়ে মুখে দেবে আগুন জ্বেলে ॥
ভবপার হবে যাতে সাধুর মতে শীঘ্র ক'রে এস চলে।
কুবিরের বাক্য মধু বিন্দু যাদু হবে নারে সময় গেলে ॥

৩৫

কঠিন ধর্ম ভজিতে নারি আমি আর ভেবে চিন্তে কি করি
যদি হতাম মেয়ে দেহ দিয়ে থাকতাম গুরুর পায় ধরি ॥
গুরু-শিষ্য হয় যদি রমণ আছে শাস্ত্রে গাঁথা সত্য কথা নরকে গমন,
আমি এক পা এগোই তিন পা পেছোই ভয়েতে কেঁপে মরি ॥
গুরুপদে দেহারতি দান, ও যে করতে পারে
জ্যান্তে মরে মহাভাগ্যবান।
যদি মদন এসে ধরে ঠেসে পাঠিয়ে দেয় যমের পুরী।
লুভি গুরু কামা চেলা যার ও সে কেমন করে হয়ে যাবে ভবনদী পার
ও যার শুদ্ধ প্রেম শ্রীগুরুর সনে পাবে কিশোর কিশোরী।
কাঙাল যাদুবিন্দু দাসে কয়, আমার কুবির গুরু কল্প-তরু রসিকের সময়
আমি দুষ্ট চেলা বাধিয়ে ঘোলা কুসঙ্গে ঘুরি ফিরি ॥

৩৬

গোঁসাই যে ভাবেতে যখন রাখো সেই ভাবে থাকি।
অধিক আর বলব কি ॥
কখনো দুগ্ধ চিনি ক্ষীর ছানা মাখন ননী
কখনো জোটে না ফেন আমানি
কখনো আ-লবণে কচুর শাক ভখি ॥
এ কুলআলম তোমারি ওহে কুদরত নেহারি।
তুমি কৃষ্ণ তুমি কালী
তুমি দীনবারি।

তুমি খাও তুমি খিলাও
তুমি দাও তুমি দেলাও
তৈয়ারী ঘর ফেলে তুমি পালাও
সকলকে ঘুরাচ্ছ দিয়ে ফাঁকি ॥

দুখ দিতেও তুমি সুখ দিতেও তুমি
মান অপমান তোমার হাতে সুনাম বদনামি।
তুমি হও রোগির ব্যাধি তুমি বৈদ্যের ঔষধি
তুমি এই সকলকার বল বুদ্ধি—
তোমার ভাবভঙ্গি বোঝা ঠকঠকি ॥

তুমি সর্বঘটে রও তুমি সর্বরূপ হও
ভালো কথা মন্দ কথা সবি তুমি কও।
কহিছে বিন্দু যাদু তুমি চোর তুমি সাধু
তুমি এই মুসলমান তুমি এই হিন্দু
আমি এই কুবিরচাঁদ বলে ডাকি ॥

দেহতত্ত্ব বৃত্তিচেতনা যৌন-অনুষঙ্গ

৩৭

এই ধড়ের বিচার কররে মন ভাই। চোদ্দ পোয়ার মাঝে
কোথা কোন খানেতে বিরাজে সাই :
ঘরের মধ্যে বা কে বাহিরে থাকে অধরচাঁদকে খুঁজে না পাই ॥
ধড়ের মাঝে হিন্দু যবন কোনখানে কোন জগৎ নিরূপণ
কোনখানে ব্রহ্মার আসন সেই কথা তোমারে শুধাই।
কর বর্ণ বিচার মন রে আমার কোথা উত্তম অধমের ঠাঁই ।।
ধড়ের কোথা গয়া কাশী কোনখানেতে বারাণসী
কোনখানেতে পূর্ণমাসী হেরে মনের আজ্ঞা পুরাই।
আছে কোন খানে অযোধ্যাবাসী দিতেছে রাম সীতার দোহাই ॥
কোথা দোজক ভেস্তখানা ধড়ের কোনখানে মদিনা
কোনখানে কাফের বেদিনা কোনখানে কারবালা কসাই।
ধড়ের কোনখানেতে সইদ হলেন হাসান হোসেন ভাই ভুটি ভাই ।।
কোনখানে বৈকুণ্ঠপুরী গোলোকনাথ গোলোকবিহারী।
কোনখানেতে গোবর্দ্ধনগিরি হেরে দুটি নয়ন জুড়াই।
ধড়ে বৃন্দাবন রয়েছে কোথা বিরাজ করেন কানাই বলাই ।।
ধড়ের কোথা সপ্তসাগর ভাসিছে কোথা মৎস্য মকর।
কোনখানেতে সিংহ শূকর ইহার সকল ঠিকানা চাই।
ধড়ের কোন গাছে কোন পক্ষী বসে কৃষ্ণ গুণ গাইছে সদাই :
স্বর্গমর্ত্য পাতাল আদি কোনখানে পুলছেরত নদী।
কোনখানেতে আল্লাহাদি হবেন সেই আখেরি কাজাই।
কুবির বলে আমি চরণ ভেবে অতি সংক্ষেপেতে বুঝাই ।।

৩৮

ভাঙলে মন আর গড়ে না গড়ে না।

পুড়িলে কাঁচা মাটি হয় নটখটি

সে মাটি মাটির সঙ্গে মেশে না।।

তরী ভাঙলে যায় না গড়া

বসন ছিঁড়লে লাগে জোড়া

মন হয়েছে বিষম পোড়া

প্রেম অনলে গলে না।

কি বল ভাঙ্গলে গড়ে সহজ পোড়ে

রাং তামা দস্তা আর রূপাসোনা।।

লোহা ভাঙলে জোড়া মেলে

তামারে পোড়ালে জ্বালে

পিতলেতে রাং ঝ্যাল চলে

কাঁসাতে প্যান মেলে না।

গড়ে সাঁকারিতে ভগ্ন সাঁকা

করে তাই নতুনেতে বেচা কেনা।।

শুনেছি এই জগৎ জুড়ে

অনেক দ্রব্য ভাঙলে গড়ে

ডাল যদিরে ভেঙে পড়ে

সে ডাল জোড়া লাগে না।

সত্য কথাতে ফল জোড়া লাগে

কুবির কয় করে চরণ সাধনা।।

৩৯

হায় ঘরামী ঘর করেছে ছাঁচে ঢেলে। গোড়োট নাই দেখতে পাই হাওয়ার জোরে আগি চলে। নাইক ছাটন পাটন ঢালা গঠন গঠেছে শনি শুক্কুলে।। সৃষ্টিকর্তা ঘরামির সির্জন তার দীর্ঘেতে আসমানি গঠন ছাচ পাড়ন নাইক তার চালে। সঙ্গে সঙ্গে জোড়া করলে খাড়া

চামের বেড়া কামের কলে ॥
রজে বীজে করে সমভাগ আর কড়ায় কড়ায় মিলাইয়ে দাগ
ঘরের রাগ মরকোচায় খুলে।
নাই খুঁটি খাঁটা পরলআঁটা মধ্যে কোটায় আগুন জ্বলে ॥
পূর্ব পশ্চিম উত্তর আর দক্ষিণ ঘরের নবদ্বার খোলা রাত্র দিন
সাড়ে তিন গঠন সকলে। কুবির বলে সেই ঘরামির চরণ পাই যেন অন্তিমকালে।

৪০

অতি সাবধানে ঘুরাই প্রেমের নাটা। যখন খেই যাবে ছিঁড়ে লব জুড়ে
ফেলব না তার এক ফোঁটা। সদা ইষ্ট প্রতি নিষ্ঠে রতি
আছে আমার মন আঁটা॥
ভয়কে যখন যাবে সুতো লব তুলে কলে বলে ভয় কি তায় এতো। কতশত
ঘুচাই জড় পটা। নাটিয়ে করব পাতা দেখব তা বাধবে না কোন নেটা॥
যখন সুতা করব মাতি। লাগাব তায় পাতায় পাতায় খৈ-ভিজে মাতি
দুই এক ঘড়ি ছাড়াব জটা। শেষে কাড়িয়ে তানা গাঁতা সানা
সাঁনাপেতে শাড়ির ঘটা।
হয় যদি তায় কানা ঘরে গুটিয়ে লব শেষে দিব আলগা খেই পুরে
এক নজরে দেখাব সেটা।
শেষে বোয়া গেঁথে নাচলিতে জুড়ে ফেলব তানাটা।
প্রথমে বিশকরম বলে চালিয়ে মাকু আঁকুবাঁকু করব না ভুলে তায়
ঝাঁপ তুলে ঘা দিব নটা। তবে ঝাপে ঝোপে বুনব কাপড় দিয়ে ও
সাবির কাটা।
কলে বলে নলি চালাব। ছিঁড়বে না খেই খাব সে দেই সাঁদ মেরে যাব
খুব দেখাব আমার গুণ যেটা। কাপড় বুনব কিসে নরাজ ঘিসে
রাখব না দশি কাটা ॥
ভালো কাপড় বুনতে জানি। চিরুণ কোটা শালের বোটো ঢাকাই
জামদানী তার ঢের কানি তা বুঝে দেয় কেটা। কুবির চরণ ভেবে
বলে এবার এ দফাতে নাই ঘোটা ॥

৪১

মন হয়েছে লোহারাম হয়না ভালো গঠন তায়। কামাবে হার মেনে গেছে আমার হলো একি দায়। তা মেরে পোড়ালে জ্বালে নরম হয় না ডাঙায় তুলে। তার খাঁচর যায় না যে রে মিলয় না দোতা হয় দোহাতার ঘায়॥
মন যেন ইংলিশ পাটি সকলি তার মলা মাটি পোড়ালে হয় না খাঁটি
চটে ফুটে বেরিয়ে যায়। কেবল পেটাপিটি দুড়ুম শব্দ ছোটে সকল গাঁয়॥
মন লোহার পরেশ ঠেকালে সোনা হয়না কোন কালে ছোঁয়না কেউ
পথে থুলে লোক দেখলে লজ্জে যায়। হয় লাভের মধ্যে আগড়া কালো
গাই বলদে লাঙ্গল বয়॥
মন লোহা খাচরের গোড়া তা মিলয় না দিলে জোড়া বিষম পোড়া
হায়রে হায়। বলে কুবিরচন্দ্র হয়ে ধন্ধ চরণচন্দ্র রেখে মাথায়॥

৪২

সোনার সঙ্গেতে যে সোনাকুঁচ থাকে। কখন সমতুল্য হয়না মূল্য টান মেরে ফেলায় তাকে। কেবল ওজনেতে এক রত্তি হয় এই কথা কয় সব লোকে॥
চাঁদির সঙ্গে দস্তা চলে। ফিটে ফাটা সিকি বাটা মিশায় আসলে। যার যেমন গুণ তাই বলে তাকে। যেমন দুগ্ধে বারি পীরিত ভারি বিষম ঘোলা চারিদিকে॥
মহৎ সঙ্গে অসতের চলন। ধানের চিটে ফলের মিটে মাকাল ফল যেমন।
সিন্দুরবরণ গঠন রংচঙে আছে ভিতরেতে গোবরপোরা ভুলবে কে সে রূপ দেখে।
সর্পের মাথায় মাণিক রে ভাই কুবির কয় ঢোঁড়ার মাথায় সেই মাণিক কি পাই।
তা হবে নাই কোন মুলুকে। আছে জোনাক পোকার মাগ্যে আলো
সেই আলোয় চাঁদ ঢাকে॥

৪৩

নেমেছে পাহাড়ে ঢল। রজেতে রজাই নদী ভেসে গেলো এসে আলতা গোলা জল। বড় বচ্ছে তুফান ভাটি উজান হাওয়ায় করছে টলমল॥
ক্ষুদ্র নদী পাতাল ভেদি জলধি জল উৎপল। কত সাধু মোহন্ত তলিয়ে গেলো হারিয়ে বিত্তে বুদ্ধি বল॥

শক্ত বড় রক্ত ধারা রক্তবিন্দু কি উজ্জ্বল। আবার হতেছে তায় প্রফুল্লিত
রক্ত পদ্ম শতদল ॥
ত্রিগুণে ত্রিদেব উৎপত্ত সত্ব রজ তম বল। সেই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ করেন
তীক্ষ্ণ ধারে চলাচল ॥
চরণ ভেবে কুবির বলে এ বড় আশ্চর্য কল। কলে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করে
ভূতল পাতাল তলাতল ॥

৪৪

জন্ম ছাঁদা নৌকা তার নাইক সাঁদা মারা। জল ঝরে বানে বানে নোনা বানে
জার্ণজরা।
তাকে গাবকালি নাই কালা পাতি স্বষ্টিধরের গঠন করা ॥
মানব-তরীর ছিদ্র নটা। টিপনে ফাঁসা মধ্যে ফাটা। হায়রে জল উঠে ফোটা।
ঘোচেনা
ভুলুক মারা। নায়ের ভগ্ন গুঁড়া। ডালি পড়ো পেরাক নড়ো তক্তা চেরা ॥
বাঁকের গোঁড়ায় চোঁয়ায় পানি। ছেঁচে মরি দিনরজনী। হায়রে গুঁজে দেই
ছেঁড়া কানি
তবু ডোবে ডহরা। জলে যায় রে ভেসে জলুই খসে দেখে হলাম দিশেহারা ॥
গড়ে ছিলো কাটে কাটে। পিলন কেটে পেরাক এঁটে। হায়রে জল উঠে
রাস্তা ছুটে
চারদিগেতে বয় ধারা। কুবির চরণ ভেবে বলে তরী ছেঁচতে ছেঁচতে
হলাম সারা ॥

৪৫

পাকা রাস্তা রেলের উপর চলে যায় কলের গাড়ি। হাবড়া আর হুগলী জেলা
যেতে
বেলা হয় না পুরো একঘড়ি। সদা হুড় হুড় হুড় শব্দ করে হাওয়া ভরে দেয়
পাড়ি ॥
কমে গরীবের দু পয়সা ভাড়া। বাবুলোকের নিরিখ বাড়া হায়রে জায়গা পায়
তাকিয়া পাড়া।

তোক্কা কোটা ঘর বাড়ী। তাতে চড়তে চড়তে নামতে বলে
হাঁই তোলে ঠিক দেয় তুড়ি ॥
রেলের গাড়ী ডেঙায় চলে। ধোমার জাহাজ চালায় জলে হায়রে আসমানে
ফনাস জলে।
উড়ে পতঙ্গ ঘুড়ি। বাঙ্গালি রেখে বশ কবে কলে লুটে নিল ধন কড়ি ॥
তার-টাঙানো বাঙ্গলা জুড়ে বসে খবর নিচ্চে চুঁড়ে হায়রে অন্যলোক ভাবছে
পড়ে হায়
মেনেছে চৌপাড়ি। তারে হাত বুলায় জানে যেমন কবিরাজ ধরে নাড়ি ॥
কলের সুতায় কাপড বুনে। কলেতে জল তুলেছে টেনে হায়রে
কলেতে ধান্য ভানে গম পিষে কলে গুড়ি।
কলে টাকা পয়সা কাগজ তৈয়ার কলেতে পাকায় দড়ি ॥
কলে করলে জব্দজমি। নদনদী পুষ্করিণী ভূমি। হয়েরে রাখলে না বেশী কমি
এমনি ইংরাজের খড়ি।
কলে নিশানেতে কয়লা পুতি বসে কল্যে ঝাণ্ডা গাড়ি ॥
চোদ্দ পোয়া ধড়ের মাঝে বিচার করে বুঝে বুঝে হায়রে
কল করেছে ইংরাজে ঘুরতেছে
বত্রিশ নাড়ি। কুবির বলে সত্যি কলের কীর্তি চরণ নাই ছাড়াছাড়ি ॥

৪৬

রূপের ভিয়ান কর দেখিরে মন
রসে হবে নানা দিব্য উপার্জন।
সারমেতে দাওরে পেচে
ঝিরিত্রি সব পড়বে নীচে
পাটেতে রস যাবে চেঁচে
হবে চিনির জন্য পাকের কর্ম
ভাবী জনার সম্মিলন ॥
জ্বেলে দাওরে তিউড়ি চুলা
আর ভিরে রসাও খোলা
সাফ করবে গাদ মাটি মলা

হবে চিনির পাকে মিছরি দানা
চর্বণ সুরস ভোজন ॥
ভিয়েন যদি করতে পারো
রস মেরে রস খাঁটি কর
রসের পাত্র রসিক পুরো
রসের ময়রা হয়ে দেখরে কুবির
গোঁসাই চরণের বচন ॥

৪৭

মানব-তরী বানিয়েছে সেই হদ্দ কারিকর
খুঁজে পাইনে তাকে কোথায় থাকে আছে কোন মুলুকে বাড়ী ঘর।
সকল গড়তে পারে গড়ে যে ভাঙ্গিতে পারে পারে সব পারে বেটা
গুণকারী বেটা সুত্তুরধর ॥
অসংখ্য কারিকর আছে কেউ পেটে কেউ গটে ছাঁচে
ছকে বুঝে কাজ কর ভাস্কর।
ভালো এই ছুতোর কার পুত্র বটে এই ভেবে হলাম ভাবান্তর ॥
কি জানি কি কাষ্ঠ এনে অস্পষ্ট অতি গোপনে
মন-পবনে করিল নির্ভর
গঠিলে নিগুণে শতগুণে টানে ত্রিগুণে ত্রিগুণাধর।
উর্দ্ধে ছিল সপ্ত সিন্ধু লয়ে তারি একবিন্দু দীনবন্ধু সর্বগুণাধর।
গঠিলে চোদ্দপোয়া নৌকাখানি বলে মন তার চরণ ধর ॥

৪৮

আবাদ কর চোদ্দপোয়া জমি লয়ে
থাকরে মন খাটো কৃষাণ হয়ে।
দীক্ষে-গুরু বর্ত্তমান
হয়ে অধিষ্ঠান
জমির উঠিত পতিত কিছু নাহিরো
প্রেম ধীবরে তিনি উলুবনে গেছে বীজ ছিটাইয়ে
আমি হলাম হতভোম্বা।
জমি হল অজন্মা

মন তুমি রে কৃতিকর্মা
কৃষি জন্ম সুমন দিয়ে।
মনরে জোড়ো ধর্ম-হাল প্রবর্তক-ফাল
সাধক-মুড়ায় সিদ্ধ-ইষ লাগাইয়ে ॥
জোড়ান দিয়ে রিপুর স্কন্ধের
লাঙ্গল জোড়া সাবন্ধে
বেয়ে যাওরে প্রেমানন্দে।
অনুরাগ-পাঁচুনি লয়ে
মন রে কর ভক্তি-চাষ
উঠাও বিঘ্ন-ঘাস
জমি সমান কর ধৈর্য-মইয়ে ॥
নেত্র বারি কর সিঞ্চন
রূপ রসানে দেহ মার্জন
প্রকাশিবে বীজ কাঞ্চন
অঙ্কুর হবে প্রেমোদয়ে।
দেহ হবে সুনির্মল
ধরিবে সুফল
কুবির কয় চরণের ধুলা খেয়ে।

৪৯

হও দেখি আমার শিক্ষা ষোল আনা
এবার আসলে খাদ মিশালে কমি বলে কেউ ছোঁবে না ॥
পরখদারের হাতে প'লে, বাজিয়ে লবে নখে তুলে
সুরভাঙ্গা গরদা হলে বাটা লইলে তা চলে না।
রং চাঁদি হলে রূপঝলকে ফিটে ফাঁটার ভাঁজ থাকে না ॥
শিক্ষার নাই রোজন করা—
যেমন টাকশালেতে মার্কামারা, সনসনেতে হরপ করা
হাতে প'লে যায় চেনা।
অতি যত্ন করে রেখো তারে ফিরো ঘুরো কর্জ করবে না।
রাং তামা দস্তা মিশে গিল্‌টি করা পাকা কষে
দেখলে পর লাগবে দিশে ঝকমেরে যায় রূপাসোনা।
কুবির বলে মজে বিষয়-বিষে অবিশ্বাসে অঙ্গে সং সাজাওনা ॥

৫০

মন পিড়াও রে মানব-ইক্ষু শিক্ষা-কলের চরকি পেতে।
গুরু নামামৃত সুধারস নির্গত হবে তাতে ॥
দয়াধর্মের পোয়াগাড়া, প্রবর্তক সাধকের ডাঁরা
গুরু সিদ্ধরসের গোড়া, জ্বাল দেয় বিষামৃতে।
রসে নয়ন ধরবে গুচি, হয়ে শুদ্ধ শুচি, রসের পাত্র হবে পঞ্চভূতে ॥
শ্রবণ করবি পেতে নিচে, বস রে মন তারই কাছে,
পূর্ণ হলে তোল ছেঁচে, রাখো অন্য বাসনেতে।
শেষে কারুয়ে বলে, জ্বালে দিও ভুলে—
চেতন হয়ে থাকো সালমুখেতে ॥
ছয়জন ভালো টানের মুনিষ কেউবা কুড়ি কেউ বা উনিশ
মন তাদের স্মরণ রাখিস পরমার্থ জানাইতে।
কুবির বলে ওরে মন আমার কথা শোন
যুগল চরণ রেখো হৃদয়েতে ॥

৫১

চোদ্দপোয়া নৌকাখানি গড়েছে কোন্ ছুতার হুদ্দরে
তার গুণ বাখানি।
সদাই চলে কলে বলে আছেন জলে দিনরজনী ॥
উপরে একমাথা জমিনে দুই পাতা
মাঝারে কল পাতা ঘুরতেছে আপনি।
খুঁজে সন্ধি না পায় কেউ ঠেলে যাচ্ছে ভবের ঢেউ
মাঝে হালে আছে শুনেছি সে জাত পাটুনি ॥
আগে তলা গড়ে শেষে তক্তা জোড়ে
আড়ে আড়ফাঁরে তাই না জানি।
আরও গুড়োয় বসায় বাঁক তাতে মেরেছে পেরাক
গলুই জলুই আঁটা দুই কিনারায় মুক্তামানিক ॥

কারিকর কি অর্থে পারে নাই সাঁধ মারতে
ঢালা উপর করতে হয় পানি।
ব্যানে ব্যানে জল ঝরে নাই রাস্তার ভিতরে বসে ডহরায়
একমনেতে ছেঁচতে হয় পানি ॥

অতি সাবধানে তরী বোঝাই করা ভারী
মহাজন মারোয়ারী কর্তা আপনি।
যেতে হবে ভবপার গুরু চরণ কর সার
কুবির কয় ছয়দিকে বয় ছয়জন করে টানাটানি ॥

৫২

নোনা গাঙে সোনার তরী বয়ে যায়
ও সুরসিক নেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বাগ বুঝে পাড়ি জমায় ॥
অনুরাগী মায়া ত্যাগি হরিনামের গুণ গায়
ও সে গুরুপদ নেহার ক'রে বসে আছে হাল মাচায় ॥
লগি ধ রে ধীরে ধীরে গভীর নীরের খবর পায়
ও সে জোয়ার হলে নৌকা খোলে
ছাড়ে না ভাঁটার সময় ॥
ঘাগী মাঝি কাজের কাজী পাল তুলে দেয় সু-হাওয়ায়।
ও তার রূপরসানের তরীখানি জল গাবি ধরে না গা ।
ছ'জন দাঁড়ি আজ্ঞাকারী সাধ্য কি যে গোল বাধায়।
তারা পোষ মেনেছে মাঝির কাছে ডুবে আছে নামসুধায় ॥
গোঁসাই কুবিরচাঁদে বলে রসিকে পার হয় হেলায়।
কাঙাল যাদুবিন্দুর টোলো ডোঙা ডুবে মলো মাঝ বেলায় ॥

৫৩

যদি হয় মহাভাবুক জেলে
ধর্ম-মাছ ধরতে পারে
ভাবের দ্বারে গুরুভাব-ভক্তি-জালে।
অমূল্য মাছ প্রাপ্ত হয় সে

হিংসা-গুগ্‌লি দেয় ফেলে ॥
সদাই সুসঙ্গে থাকে,
পড়ে না মায়ার-পাঁকে,
চলে সে ফাঁকে ফাঁকে
চেতন-গুরুকৃপা বলে।
ও সে মাছ ধরে লাগে না কাদা প্রেমসরোবরের জলে ॥

গুরু-রূপ নেহার ক'রে
মাছ ধরে ধীরে ধীরে,
রাখে ক্ষমা-খালুইতে পুরে
সে আপন হৃদ্‌কমলে।
তার মন নয়ন রয়েছে তাতে করবে কি আর লোভ-চিলে

পাঁচটা ভূত থাকে যদি
হয় নাকো প্রতিবাদী
দিয়ে তায় নাম ঔষধি
বশ করে কলেকৌশলে।
ও সে মাকাল পূজে হৃদয়মাঝে প্রেমবারি মন-ফুলে ॥

গাব করে জাল স্বরূপ-রসে
শক্ত জাল ছিঁড়বে আর কিসে
পতন তার নেই কোনকালে;
ও সে জাল বেয়ে যায় বোলে জানায়,
পিরিত মধুর-অঞ্চলে ॥

জগতে যে জেলে ওঁছা
এই যাদুবিন্দু বোঁচা
বুদ্ধি তার অতিশয় কাঁচা
গোঁসাই কুবিরচাঁদে বলে ॥

৫৪

আমার এই কাদামাখা সার হ'লো।
ধর্ম-মাছ ধরব ব'লে নামলাম জলে
ভক্তি-জাল ছিঁড়ে গেল।
কেবল হিংসে নিন্দে গুগলি ঘোঙা পেয়েছি কতকগুলো ॥

এই সত্যধর্ম-বিলে সুরসিক বাগদী ভুলে,
শুদ্ধভাব-জালটি ফেলে,
আনন্দে মাছ ধরছে ভালো—
আমি পড়লাম ফাঁকে মায়া পাঁকে বলবুদ্ধি চুলোয় গেলো ॥

কুসঙ্গে বিল গাবালাম্,
কুক্ষণে জাল নাবালাম,
ক্ষমা-খালুই হারালাম,
উপায় কি করি বলো।
আমি বিল ধুনে পাই চাঁদা পুঁটি লোভ-চিলে লুটে নিলো ॥

পাঁচটা ভূত লাগলো পিছে
মাছ ধরায় প্যাঁচ পড়েছে
ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে গেছে
আর বাদী জনা ষোল।
আমি মাকাল পুজোর মন্ত্র ভুলে হয়েছি এলোমেলো ॥

গোঁসাই কুবিরচাঁদ ভাস্য ছদার গদিতে বসে
এই যাদুবিন্দু দাসে
পাঁচলোকির পাট মস্ত হ'লো।
দিলে মোয়ান তাড়া মূর্খ মেড়া আপনার দোষে ম'লো ॥

৫৫

বাঁকা নদীর বাঁকে মন আমার যাসনে তাতে
সাঁতার দিতে প্রাণ হারাবি ঘুল্য পাকে ॥

বলি শোন্ কত দেব ঋষিগণ তারা সব ভাবছে বসে কেমন তুফান দেবে

নয়নেতে দে বলে বাঁকা ডরে মন খ্যাপা তোর লাগবে ধোঁকা—
একেবারে হবি বোকা সত্য কথা কই তোকে ।।

ও তুই সাধ করে তায় দিলি ঝাঁপ
ভুললি গুরুর মন্ত্রযাপ শেষকালে খাবি খাবি পাবি কাকে ।।

নাইতে গেলে বাঁকার ঘাটে বিশ্বেবুদ্ধি রয়না ঘটে
কাম নামে কুমির জুটে চিবিয়ে চুষে খায় তাকে ।।

ও হয় অপমৃত্যু সেইখানে ও তার জীবে কি সন্ধি জানে
একথা বুঝতে পারে সাধক লোকে ।।

সেই নদীতে মাসে মাসে দিনদুপুরে জোয়ার আসে
ডাঙা আর ডহর ভাসে বিদঘুটে বঙ্গে ডাকে ।।

ও তাই কহিছেন গোঁসাই কুবির বোকা যাদুবিন্দু খুঁড়িয়ে পির
চেলুতি নাম বাড়ালে কুঁড়ো মেখে ।।

৫৬

মানবদেহ রেলগাড়ীর খবর কর মন আছে তায় রত্নধন ।।

বসে হাবড়ার ভিতরে খোদকারী করে এই মানব রেলগাড়ী তৈয়ার করে
সকলে পায় নাকো তার দরশন ।
ও সেই কারিগর পাকা চোখে যাচ্ছে কাজ দেখা ।
লাগিয়েছে এই গাড়ীর নীচেয় দুইখানি চাকা
আছে ইঞ্জিন পাতা ঘুরছে হাতা যথা তথা হয় গমন ।
জগৎকর্তা মূলাধার ও ভাই তুল্য নাইকো তার
এই গাড়ী চালাবার তরে দুই রাস্তা তৈয়ার ।
যায় একপথে যমরাজার বাড়ী একপথে ভাবউদ্দীপন ।।

রাধারাণীর অধিকার ও শ্রীকৃষ্ণ ক্যাসিয়ার
দীক্ষাগুরু কল্পতরু বেশ টিকিট মাস্টার
নেবে তার নিকটে টিকিট কেটে ভক্তি-মাশুল চাই এখন ।
সাধুসঙ্গ করো ভাই ও সেই গাড়ী চাপা চাই

টাইম হলে দুয়ার খুলে পাবে খাসা ঠাঁই
যাবে তীর্থ আসে নিত্য দেশে রসের নগর বৃন্দাবন ।।

ও সেই হাবড়ার ইষ্টিশান তিনি তৈয়ার করেছেন
শোন বলি মন হয়ে চেতন ভাল করেছেন ।
পাবে চিন্তামণি হবে ধনী নইলে হারাবে জীবন ।।
গাড়ীর সন্ধি করা ভার আছে খোলা নয় দুয়ার চালায় বেগে অনুরাগে ।
মন-ইঞ্জিনীয়ার করে তার তাঁবে কাজ খালাসী সাজ দশ-ইন্দ্রিয়-ছয় রিপুগণ ।
গাড়ির ভিতর কলখানি আছে অগ্নি আর পানি
কলের ঘরে নয়ন দিয়ে রয়েছেন তিনি
হয় স্থানে স্থানে ইষ্টিশনে খালাস বোঝাই বিলক্ষণ ।।

মানবগাড়ী চমৎকার তাতে নাই রেলের দরকার ।
জলে স্থলে সমান চলে জঙ্গলের মাঝার ।
আছে চামড়া-ঘেরা মধ্যে পোরা হীরে মতি লাল কাঞ্চন ।।
ও সেই কলকাতার কাছে কথা নয় কিছু মিছে
শেয়ালদা আর হাবড়া হতে গাড়ি বেরিয়েছে
ছিল স্বর্গপুরে শূন্যভরে সন্ধি জানে সাধুগণ ।।

গাড়ীর শিকল যত শিব ও সেই কর্ত্তাজির ফিকির
এ সব কথা বুঝতে পারে রসিক সুগভীর ।
নেয় রত্ন খুঁজে দেহের মাঝে লাল ঘরে দিয়ে নয়ন ।
গাড়ীর কবজা কল করা আছে অনেক ঠাঁই জোড়া
ইস্‌কুরূপ্‌ দিয়েছে এঁটে নাই চড়াপড়া
ও তার কারিকুরির বলিহারি মিস্ত্রি মধুসূদন ।।

আছে গাড়ীর ভিতর চোর তাদের এমনি ছাতির জোর
পকেটমারে অর্থ হরে চক্ষে লাগায় ঘোর
করে দেয় কুপোকাৎ মূলে হাভাত বিদ্যেবুদ্ধি হয়-হরণ ।।

গাড়ীর প্রথম কেলাসে গিয়ে বেঞ্চেতে বসে
অল্প মানুষ সব সমতুল যায় নিজদেশে
ও সে প্রবর্ত ধর্ম সত্যযাজন করিবার কারণ ।।

গাড়ীর দ্বিতীয় কেলাস হয় উপর ঘরে বাস
সাধুসঙ্গে প্রেমতরঙ্গে পুরায় মনের আশ
করেন কৃপাংকুরু শিক্ষাগুরু নিজ বীজ করেন রোপণ ॥

গাড়ীর তৃতীয় নম্বর ও ভাই সুখের নাইকো ওর।
রত্ন পেয়ে সিদ্ধ হয়ে যায় প্রাপ্তিনগর
ফিরে আসবে না আর গাড়ীর ভিতর গুরুকে দেহ অর্পণ ॥

হলে হাবড়াতে হাবড়া হবে সকল কাজ গোবরা।
শাঁসে জলে যাবে চলে সাধ হবে ছোবড়া
থাকো ঠাণ্ডা হয়ে প্রাণটা লয়ে গুরুকে কর স্মরণ ॥

এই যে হাবড়া শেয়ালদা জীবের পারিয়ে দিলে দ'
অর্থ নিজে করে দিলে হাঁটু ভাঙা দ'।
সেথা কারখানা কল হচ্ছে প্রবল সাধ করে চাঁদ হয় পতন ॥
মনের গাড়ীতে চেপে তুমি থাকো চুপচাপে
কর্তা যিনি গুণমণি করিবেন কৃপে।
রাখো তার মতে মত খোলসা পথ বুঝে দেখো শুচিরাম।
রেলে হয় টেলিগ্রাফ খোদের কায এম্নি ছাপ।
কবিরাজেতে ধরে নাড়ী অঙ্গে হলে তাপ
পায় পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর সুবন্দ রাজের ধরণ ॥

আছে পুলিস মতেয়ান দেখে চমকে ওঠে প্রাণ
কসুর পেলে ধরে চুলে দেয় ক'রে চালান
রাখে বন্দী করে কারাগারে উর্দ্ধপা অধোবদন ॥
গাড়ীর মাঝখানে বোমা তাতে উড়ছে ভাই ধোঁয়া
প্যাসেঞ্জার চেপেছে কত কর তার সীমা
ও তার বুঝবে কে ফোঁস দিয়েছে দোষ গাড়ীর মালিক মোক্তাবন

এসে এই ভবের মাঝে গাড়ীর সন্ধি করে যে
অমূল্যধন রত্ননিধি নিয়েছে খুঁজে।
ও তার নেই দ্বেষাদ্বেষ বেশ দরবেশ সমান সব হিন্দুযবন
এই যে খোদের কারখানা মনে বুঝে দেখ না

ইংরাজের ঐ রেলের গাড়ী হয় না তুলনা।
কত রং বেরঙে নতুন ঢঙে গাড়ী করেছেন সৃজন ।।

গোঁসাই কুবিরের কথা কিছু নয় কো অন্যথা
চোদ্দভুবন এই গাড়ীতে রয়েছে গাঁথা।
যাদুবিন্দু ছুঁচো পেয়ে পেঁচো প্যাচে পড়ে হয় মরণ ।।

৫৭

ওরে মানবদেহ-কলকাতার কেতা চমৎকার।
ও ভাই লাল দীঘির পানি বড় মিঠা যে শুনি
কেউ বা বলে লুনছা লাগে ধর্মের হয় হানি।
ও পানি যে খেয়েছে সেই মজেছে সেই হয়েছে ভবপার ।।

তুমি কলকাতার বউবাজারে রও
ও ভাই কতই কাম বাজাও।
হরিনামের মণ্ডা এনে ঠাণ্ডা হয়ে খাও।
যেদিন বাগবাজারে পড়বি ফেবে
সেদিন প্রাণ বাঁচানো হবে ভার ।।

কলকাতার বাহান্ন বাজার ও তার তিপান্ন গলি
হাত ধরে ঘাড় মুচড়ে ভেঙে দেয় নরবলি।
ও নামে সোনাগাছি মানিকতলা
জোড়াসাঁকো আচ্ছা বাহার ।।

তোমার গঙ্গার ধারে ঘর কাঁপে থর থর
তার ভিতরে দেখতে পাবে আজব রঙ বিথর।
যাদুবিন্দু বোকা হয়ে ধোঁকা ভাই উলের বনে
দেয় সাঁতার ।।

[অং

৫৮

আগে গুপ্তিপাড়া ছাড়ো রে মন তবে শান্তিপুরে যাবি
সদা আনন্দে রবি ॥

আছে শান্তিপুর নদে কথা নয় সিধে
সেখানে নদীয়ার মাঝে বিষম গোল বাঁধে
তোমার করি বারণ সেথা যেয়োনা মন
মজা দেখাবে সে বাজার সমন
শেষকালে কোবলাতে ভ্যাবলা হবি ॥
সেই গুপ্তিপাড়া গোপন বৃন্দাবন
চন্দ্র যেমন গোপন রয় করে আসন।
সাধকের কাছে গেলে তার সন্ধি পাবি ॥

আছে অম্বিকে কালনা চেপে ধরবে তোর কললা
সামলাতে পারবিনা জীবে যাবি রে গোল্লায়
শান্তিপুর রয় বহুদূর
কালনাতে খাটবে না ফাকুর ফুকুর
কালের ঘা মেরে শেষে খাবি খাবি ॥

গোসাই কুবেরচাঁদ রটে ঐ নদীর নিকটে
স্বরূপগঞ্জে বাস করিলে সন্দ যায় মিটে।
শোন্ যাদুবিন্দু বলি চিনে নে নদীয়ার গলি
তবে তো শান্তিপুর যাবি।
নিতান্ত হোসনা গোবরের ঢাবি ॥

৫৯

নবদ্বীপে নিত্যধন আছে আছে কোনখানে জীবে তার কি জানে।
ও এই দেহ-নদীয়ায় উদয় গৌর রায়
নিতাইচাঁদে হাসে কাঁদে নাচে গায় সাধকে সন্ধি পায় সাধন গুণে ॥

নদের পোড়াজননী তিনি ত্রিতাপনাশিনী
তার সাধনা করেন সদাই বুড়োশিব যিনি।
আছে মালঞ্চপাড়ায় যে মজা জানে সেই ত্রিলোচনে ।।
বুড়ো শিবের চেলাগণ খেলা করে বিলক্ষণ
পোড়া মায়ের পদতলে রেখে দুনয়ন
তাদের মন ভুলাতে কোনো মতে পারে না নারীগণে ।
শ্রীবাস আঙিনা সত্য শ্রীধাম নদীয়া
নিত্যসাধক হলে নিত্য লীলে করে নেয় অর্থ ভুলায়
পুরুষ নারী গৌর হরি হরিনাম গুণগানে ।

যাদের আছে সুসঙ্গ দেখে গঙ্গ-গৌরাঙ্গ
সময় সময় সুরধুনীর বাড়ে তরঙ্গ।
যখন যোগ লাগে সেই যোগে শরীর মিলন হয় শিবের সনে ।।

দেহ-নদের বৌবাজার ভারী মজা তার মাঝার
শুনলে পরে হেসে মরে শিক্ষা নাইকো যার
ও কেউ সেই বাজারে লভ্য করে কেউ হারায় ধনে প্রাণে ।।

ও সেই বেদড়াপাড়াতে আপন প্রাণ করো হাতে
নইলে পরে পারবে না ভাই সেইখানে যেতে।
আছে ব্যাদড়া কজন প্রধান মদন ঘাড় ধরে পাঠায় বনে ।।
ও সেই গাবতলায় গেলে ভোলামন যাবি ভুলে
গাব খেলে সেই গাবের আঁটি লাগবে রে গলে।
যারা সাধু সন্ত জানে অন্ত তাকায় নাকো তা পানে ।।

নদের আছে চারচড়া ও সে মুনির মনোহরা
সাধক যারা জানে তারা সাধনের গোড়া
ও সেই বঁইচিআড়ায় বাঘের বাসায় যোগের আশায় হয় কেনে ।।
যদি রসিক সুজন হয় নদের মালোপাড়ায় রয়
তাদের মনে নাইকো কিছু বাঘভালুকের ভয়।
তারা বাগদিপাড়ায় বাবুর মত আসে যায় নিশিদিনে ।।

ধন্য নদীয়াপুরী গুণের যাই বলিহারি
আনন্দে আগমন করেন আগমেশ্বরী।
তিনি শিবের শক্তি জীবের মুক্তি ভক্তি করে নাও চিনে।।
দেখে গঙ্গার ধারে গড় খ্যাপা ন্যাংটা দিগম্বর
সাধনজোরে বাঁধা মারে করে নাকো ডর।
নদের তেমোহানা দেখে ভোলা বসে আছে শ্মশানে।।

গোঁসাইবাগান খুব ভালো আমার মন তুমি চলো
গোস্বামী-মত ঠিক সোজা পথ ফলবে সুফল
আর এই দরমাহাটার মিটবে ল্যাটা সাধুগুরুর স্মরণে।।
নদেয় আছে বালুচর ডোবে বন্যে এলে পর
জীবে কি তা বুঝতে পারে জানে দিগম্বর
আছে রাধিকে কলুনীর পোতা শ্রোতা হিন্দু যবনে।।
সাধু বন্ধপাড়ায় রয় করে ভব রোগের ক্ষয়
তাদের ঘরে মনরে আমার চিনতে পারলে হয়
দেখে নতুনপুকুর ফুকুর ফাকুর কল্য ধরে সমনে।

নদের নিকট তেঘরি সেটা জীবের ডোমপুরী
সাধুর সাধনপারা বটে চলছে রেলগাড়ী
ও সেই তেঘরিতে তিন মহাজন বসে আছে গোপনে।।
দেহ-নদীয়া খুঁজে আমার মন দেখ বুঝে
হাড়ি মুচি বাউরী ভুরো আছে তার মাঝে।
তারা নয়কো দুখী নদেবাসী জানে না গৌর বিনে।
সাধু সর্বকেশী সব কবে নিতাই গৌর রব
মলিন ভাবে আছে ডুবে নাই কোনো গৌরব।
তারা মনের সুখে বসে থাকে বনচারীর বাগানে।।

যত নদীয়ার নারী গুণের যাই বলিহারি
হরিবোল হরিবোল বলে দিবাশর্বরী
তারা গৌরপ্রেমে মাতোয়ারা ধারা বয় দুই নয়নে।।
নারীপুরুষ নদীয়ার করে বাহুতে বাহার
গোপনে পরেছে গলে গৌরনামের হার

নদেয় পশুপক্ষ পাবে মোক্ষ এই ভবে তরে
হরি তন্ত্র মহামন্ত্র জপ যদি করে
হলে আমার মত হতভাগা রবে শমন ভবনে।

যারা শুদ্ধ সাধুজন আছে এই নদে ভবন
ঘরের ভাড়া নেয়না তারা প্রেমের রসে মগন।
যারা সুখের আসে নদেয় আসে সাধু হবে কেমনে ॥
যারা করে ভণ্ডামী তাদের বাড়ে বদনামি
তিলক পরে টিকি নাড়ে নয় প্রেমের প্রেমী
তাদের মালা টেপা জপা জাপা পয়সা নেবার কারণে ॥
যদি সুজন সাধু হয় সে কি কোঠার ঘরে রয়
বৃক্ষ তলে বসে থাকে আত্মসুখী নয়
তারা হাল ছেড়ে হাল দীনের কাঙাল যেমন রূপ সনাতনে ॥

আসল অভ্যাগত যত তাদের প্রাণ হরিগত
রমণী দেখিয়ে ভাবে জননীর মত
তারা সিদ্ধপুরুষ হয় না বেহুঁশ আছে গুরুর করণে ॥
খ্যাপা বাউলের মতে যারা আসে এই পথে
স্কন্ধে ঝোলা তছবির মালা করঙ্গ হাতে
এখন কত ভেয়ে অতিথ থুয়ে ভাত মারে ঘরের কোণে ॥

নদের পশ্চিমে নিগূঢ় ও তার নামটি মায়াপুর
দেখলে চোখে অবোধ লোকের মন করে ঘুরঘুর
ও সে মায়াপুরের মধ্যে ঢুকে আম বলে আমড়া কেনে ॥
নদের ভঙ্গী বোঝা ভার স্বরূপগঞ্জ গঙ্গাপার
সেইখানে বাস করে যারা হয়ে হুঁশিয়ার।
তারা স্বরূপ ধ'রে সাধন করে ফেরে সে ধন সন্ধানে ॥

যাদুবিন্দুর নিবেদন শুন সাধু মহাজন
নিজগুণে দয়া কর জানি নে ভজন
যেন সদয় হয়ে কুবির গোঁসাই রাখেন রাঙা চরণে ॥

৬০

মানুষের করণ কর
এবার সাধনবলে ভক্তির জোরে মানুষ ধর।
হরিষষ্ঠী-মনসা-মাকাল
মিছে কাঠের ছবি মাটির ঢিবি সাক্ষীগোপাল
বস্তুহীন পাষাণে কেন মাথা ঠুকে মর॥
মানুষে কোরো না ভেদাভেদ
কর ধর্মযাজন মানুষভজন
ছেড়ে দাওরে বেদ।
মানুষ সত্যতত্ত্ব জেনে মানুষের উদ্দেশে ফের॥

ঘটে পটে দিওনারে মন
পান কর সদা প্রেমসুধা অমূল্যরতন।
গোঁসাই চরণ বলে কুবির
চরণ যদি চিনতে পার॥

৬১

এই মানুষ সত্য করি মানুষ লীলা আশ্চর্য হেরি।
মানুষ লীলা পূর্বাপরে মানুষ জ্ঞান বুদ্ধি হরে
ব্রহ্ম ভাবলে পরে হয় ব্রহ্ম অধিকারী॥
স্মরণমাত্র হয় দৃষ্ট ঈশ্বর পরম কৃষ্ট
লীলার শ্রেষ্ঠ নদেয় অবতরি।
ঘোষপাড়ায় ঘোষণা রেখে জঙ্গীপুর দিনকতক থেকে
গুপ্ত হলেন আপ্তসুখে ভক্ত সঙ্গে করি॥
মানুষ সত্য মানুষ সত্য গুরু সত্য সত্য সত্য দীনবন্ধু হরি।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি মানুষ সত্য চলাচলি সত্য সত্য বলি বলি

সত্য প্রেমের ভিখারী

একটি বৃক্ষের দুটি শাখা বেদবিধিতে নাইকো লেখা

সাধকে পায় দেখা অন্তঃপুরি।

জঙ্গীপুর ঘোষপাড়া সত্য কুবির বলে সত্য সত্য সত্য

শ্রীচরণ ধরি॥

৬২

গেঁজালে তোর শুদ্ধ কেবল মজা মারা। বেড়াও গেঁজা ডলে ডলে

কালী কালী বলে ভুলে গেছো নদের নবগোরা

গাঁজায় দোম মেরে ভোম হয়ে থাকিস বলিস কোথা মাগো তারা॥

জন্মেছ উত্তমের কুলে ভেক নিয়ে বৈরাগ্য হলে

নবীন দাড়ি মুড়িয়ে ফেলে হলে ঠিক মাকুন্দপারা॥

লয়ে যত দুষ্ট নেড়ি কর সদা হুড়োহুড়ি ধুলাতে যাও গড়াগড়ি

গাঁজা রসে হয়ে ভোরা॥

গরলে মজেছে চিৎ ত্যেজে গৌরনামামৃত বেড়াচ্ছ পাগলের মত

ভাং ধুতুরা পানে ভোরা॥

বেড়াও সাধুশব্দ গেয়ে বৈষ্ণবীদের প্রসাদ খেয়ে গাঁজাতে উন্মত্ত হয়ে

গাল বাজাও তাল হয়ে হারা॥

গেঁজা খেলে লক্ষ্মী ছাড়ে সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়ে

কুবির বলে চরণ ছেড়ে হলি ছেনের ঘাটের মরা॥

৬৩

ওরে বৃন্দাবন হ'তে বড় শ্রীপাট হুদা গ্রাম।

শ্রীপাট হুদা গ্রাম

যথা দিবানিশি শুনি দীনবন্ধু নাম॥

কেমন ক'রে বলি হুদা হলো বৃন্দাবন ধাম।

হেরি নীলাচলে যেমন লীলে

এখানে তার অধিক লীলে

হিন্দু-যবন সকল মিলে
স্বচক্ষে দেখতে পেলাম ॥

দেখ গোঁসাই চরণ চাঁদ আমার
বসিয়েছে চাঁদের বাজার
ভক্তবৃন্দ আসছে যাচ্ছে অবিশ্রাম।
আমার চরণচাঁদের নামের জোরে
দুখী-পাপী-তাপী তরে
হাঁপ কাশি শূল গুড়ম ব্যথা মহাব্যাধি হয় আরাম ॥

আছে গয়াধামে গদাধর
কাশীধামে কাশীশ্বর
বৃন্দাবনে আছেন কানাই বলরাম।
সেই ব্রজধামের কর্তা যিনি
রাইধনী সেই নামটি শুনি
সেই ধনী এই সাহেবধনী
জঙ্গীপুরে যার মোকাম ॥

আছে ভোলানাথ কৈলাসপুরে
জগন্নাথ শ্রীক্ষেত্তরে
অযোধ্যানগরেতে 'ছলেন শ্রীরাম।
তেমনি প্রহ্লাদচন্দ্র রুকুনপুরে
রামচন্দ্র বামুনপুকুরে
গোঁসাই কুবির আছেন দ্বারে
পূর্ণ করে মনস্কাম ॥

৬৪

বাতিকেতে কাঁজি সাঁতলা টাটকা ঘোল।
অরুচি হলে খেতে কি মজা আমচুরের ঝোল
তিলের তৈল আর দুবেলা চলে চিনি-ভিজে কুল অম্বল
আর পরশুতি-ভাত সাঁজো-দধি খেলে ভালো হয় পাগল।
ধনুষ্টঙ্কার হলে পরে চিনির শরবৎ ডাব নারকোল।

আর ওলা-ভিজে মিছরির পানা ডুমুরের জল কি শীতল
মদন বৃদ্ধি হলে পরে শক্তি-সাধন নারীর কোল
আর কুবির বলে চরণ পেলে ঘোচে আমার মনের গোল।

৬৫

কোম্পানীর রসিদে জরিপ করেছে আমিন। সবে চোদ্দ পোয়া কালী সেই
সারা কালী আড়ের বলি নাই তাইন॥

জমির নাল খিল খিচে যেখানে যা কাছে রসি ফেলে কসে লয়েছে।
বিকস্তি পয়স্তি চড়া রাজ জঙ্গল নদীছাড়া জরিপ সাবর আছে মস্তাকীন।
খোদের দস্তখতি চিটে লিখি গেছেন এঁটে দাগে দাগে করে চিন॥

জমির করেছেন চৌহদ্দি আমিনের যে সাধ্যি কি তাবতে কোন তফাৎ নাই।
উঠিত পতিত জমি নামা তাবত আছে টাম্বিত নাম। পূর্ব পশ্চিম উত্তর আর
দক্ষিণ।

ইহার মধ্যেতে সাবন্দ তাতে নাই সন্দ সবে মাত্র সাড়ে তিন॥

আরো ভবি বাটা পেয়ে তাবত মোবর দিয়ে আসল অঙ্ক বজায় রেখেছে
জমাবন্দি সিকেক টাকা অন্য বারের নাই এলেকা পাট্টার সত্ত এইমত লেখা
আছে কিস্তিবন্দি খোকা ঘুঁচে যাবে ধোঁক নিকাশ হবে যদিন॥

সাব কাগ কড়া ক্রান্তি ধুন নবদস্তা মনভ্রান্তি ক্রমে এড়ান নাই।
উসল বাদে বাকি যত তৌসিলদারের হিসাবমত আদায় হবে আখেরি যেদিন।
কুবির বলে চরণ ধরে মালগুজারির তরে সমনকে দিব জামিন॥

৬৬

কলিকালে এমন মানুষলীলে কোথাও নাই।
দোলেতে চড়েছে দুলাল
হেরে সকলের মনের সাধ পুরাই।
এই পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ
দেখে এলাম অনেক ঠাঁই॥

ধন্যরে ঈশ্বরলীলে ত্রেতার রামলীলে
দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণলীলে
এই কলিতে শ্রীচৈতন্য নিতাই
সেই শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ
ঘোষপাড়াতে দেখতে পাই ॥

শুনেছি এই দশ অবতার
হয়েছেন মৎস্য কচ্ছপ বরাহশ্চ বামনরূপ অবতার
কি চমৎকার গৌরাঙ্গ গোঁসাই।
সেই অবতার ঘোষপাড়ায়
এসে পুরাইলেন আশবাই ।

গোলক আর বৈকুণ্ঠপুরী
অযোধ্যা গোদাবরী তীর্থ ভারি
গয়া আদি করি ঘোষপাড়ায় হেরি
এমন কোথাও নাই।
কুবির বলে হেথায় উদয় সবাই
চরণচাঁদের গুণ গাই ॥

৬৭

মুষ্টি ভিক্ষে করে আমি খেতে পাইনে উদর পুরে। লয়ে ঝুলি কাঁধে মনের খেদে বেড়াই লোকের দ্বারে দ্বারে।
বাড়ী বাড়ী হাঁটব কত। ভূত খাটুনি খাটব কত। রৌদ্রে পুড়ে মরব কত মনের দুঃখ কই কারে। ঘরে থাকতে পোড়া কপালীরে বলে মিনসে
আয়গা ফিরে ॥
নামে কুঁড়ে কাজে কুঁড়ে। ভজন নাই ভোজনে ডেডে পাত পাড়ি মেঝে জুড়ে হাবু খুলে হা-ঘরে। আমার ঘরেতে বৈষ্ণবি আছে পণ কাটা চাউল
চিবিয়ে মারে ॥
তিনি দেবী আমি দেবা। আমি করি ঠাকুর সেবা। বলেন আমার ঠাকুর বাবা শুনে বড় রাগ ধরে।
তিনি বলেন সদা খাব খাব কোথায় পাব খাওয়াই তারে ।

এবার নীল এসে নীলকণ্ঠ বেশে ব্রহ্মাণ্ড বশ করে নিলে। নীলের জ্বালায় যাব
কোথায় নীলে সব ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে নিলে ॥
নীলের অনুষঙ্গী যারা শমনের দূত যেমন ধারা।
পায় যারে তায় করে সারা ডুবায়ে মারে হাত বেঁধে গলে ॥

প্রথমে নীল বিছনবেশে প্রবেশিল সর্বদেশে এই করলে সর্বনেশে সকলকে মজালে।
আড়াইসের ওজনে নীল ফি বিঘায় ছিটিয়ে পড়ে জন্ম নিলে ॥
নীলমণির দাদনের কালে দেওয়ানজী তার অর্দ্ধেক নিলে। আমিন জরিপের ছলে
কিছু কিছু নিলে। বিঘেতে তিন বিঘা নিলে চারিদিকে বগচরের সীমানা নিলে ॥

নীলমণি রোপণের সময় বড় ঢেলা বেচে ফেলায় শেষ কালে মই ফেলায়ে
চাষ ক'রে খুব নিলে।
বেদামীতে লাঙ্গল নিলে নীলে সব কাঙাল গরীব জ্বালিয়ে দিলে ॥

ছোট চাষ নিড়ানি বিদে দিতে সবাই নাকে কাঁদে না দিলে মারে বেঁধে এই
করে শেষকালে
আচট হতে গরু ঘিরে আমিন আর তাগিদদার বেচে নিলে ॥
দেওয়ানজী নীলমণির খুড়া তার কিছু পার্বণী বাড়া মুহুরী অঙ্ক ছাড়া তঙ্কা
কিছু নিলে
ইস্টাটের মুহুরি যে জন ইষ্টদেব হয়ে বার্ষিক সেধে নিলে ॥

এবার এই নীলমণির কাছে মান গেছে অপমান আছে একথা নয়কো মিছে
জানাবে কি বলে।
উত্তমে অধমে সমান হয়েছে বিচারশূন্য কলিকালে ॥
নীলমণিকে কসনদারে নেয় কিছু হার বেশি করে আমদানির মুহুরিরে
ভুট করে বাণ্ডিলে।
তঙ্কাতে কি তঙ্কা দিয়ে করে ঠিক হরণ পূরণ গোলমালে ॥

সদয় হলেন দমের রাজা দমেতে মজালে প্রজা আমলাদের দিলে সাজা
নিকাশী দায় ফেলে।
হাউজের ঘর করলে ফৌত এই কথা চরণ ভেবে কুবির বলে ॥

৬৯

চাষা নইলে মানীর মান থাকে না কোন কালে।
চাষার হলেরে ভাই খেয়ে সবাই কোঁচা দুলিয়ে চলে ॥

চাষা নইলে চাষ চলে না ভদ্রলোকের দিন চলে না
চাষা নইলে ভদ্র কেউ বলে না
চাষায় না দিলে পর মহাজনকে মহাজন কে বলে ॥

চাষা হতে রাজার রাজা দেবতাদের সেবা মর্ম বুঝবে কেবা
চাষার দিব্য হাল শোভা জীবনরক্ষে মনলোভা
চাষার গুণ সুদুর্লভা যদি চাষার ফলে ॥

চাষার হলে উত্তম অধম সকলে বাঁচে টপ্ পা ছাড়ে আর নাচে
চাষার মান্য রাজার কাছে 'এসো' ব'লে বসায় কাছে
এ কথা নয়কো মিছে প্রাণ চাষার ফসলে ॥

চাষাতে চালাচ্ছে মুলুক কৃষাণী ক'রে উত্তম অধমের তরে
চাষার ক্ষেতে হ'লে পরে সবাই বাবুগিরি করে
চাষার না হলে পরে শিকেয় হাঁড়ি দোলে ॥

চাষার ক্ষেতে ফসল নাইক হয়েছে আকাল লোকের ভেঙেছে কপাল
উত্তম অধম হ'ল কাঙাল বাবু কাঙাল কাঙাল ভূপাল
মহাজন দিচ্ছে দোশাল ধান ফুরালো বলে ॥

এই চাষার যে রাখে না মান ঈশ্বর করে তার অপমান
কুবির বলে চাষাকে দিবেন স্থান শ্রীচরণকমলে।

৭০

ভুট করেছে গত সনের ঝরে
আবার এই বাহাত্ত সালে ঘোর অকালে
লক্ষ্মী গেছে ছেড়ে।
হ'ল অন্ন বিনে ছন্নছাড়া ধান্য গেছে পুড়ে ॥

নাইক মুগ-মুসুরি মাসিনে ছোলা
তেওড়া মটর কাপাস তুলা
জমির মধ্যে শুধুই ঢেলা রয়েছে পড়ে।
অতি অল্পবিস্তর শস্য ছিল
তাও মেলেনা হয়ে সবার গেল।
হিতে বিপরীত হ'ল মাঘ-ফাগুনের জাড়ে॥

মুল্লুক হ'ল লক্ষ্মীছাড়া আট আনা চাউলের ধাড়া
এমনি লোকের কপালপোড়া মেলে না তা ঢুঁড়ে
হ'ল বিচারকর্তার উলটো দাড়া
সদা মড়ার উপর ঢোকায় খাঁড়া
টেকস করেছে বাড়া
জমির অঙ্ক চুঁড়ে॥

ভিখারীর প্রমাদ হ'ল
তারা যে ফেরে কই আর কেও বলে না
কি করি আর দিন চলে না
বেড়াই দ্বারে দ্বারে॥
আর পথে যেতে শংকা করে
লোকে পেটের জ্বালায় মানুষ মারে
ধর্মভয় করে না চোরে
পুটুলি নেয় কেড়ে।
হায় আর শুনি দিনদোপর বেলা
নেয় ভেঙে মহাজনের গোলা
কুবির কয় গেল বেলা
চরণ ভাবি পরে॥

৭১

যাব রে দরখাস্ত দিতে দ্বারে খোদ কোম্পানীর কাছে—
জানাবো হুজুরে আমার মনে যত দুঃখ আছে।
চৌদ্দ পোয়া জমিখানা--জমা সিক্কে ষোলআনা, মনমনাতে আমার দেনা
দিয়েছি তার কবচ আছে।

এসে ডেপুটি কালেক্টর জরিপ কল্লে পর জমার নিরিখ বেশী করে গেছে ॥
মনে হয় কোম্পানীর আমিন জরিপ করলে সরেজমিন পূর্ব পশ্চিম
উত্তর দক্ষিণ আড়েতে বেশী করেছে।
তাহার মধ্যে নদনদী আছে জন্মাবধি পতিতজমি সকল উঠিত নিয়েছে ॥
প্রধান রিপু হেডমুহুরী, নয়ন হলো রসনগিরি সে রাস্তায় শ্রবণচৌধুরী
দেওয়ানগিরি ভার পেয়েছে।
এরা সকলে এক ঐক্য আমারি বিপক্ষ নাজির মহাপেঁচে প্যাঁচ ফেলেছে।
কালেকটরীর আমলা যত তাহাদের গুণ বলব কত দেওয়ায়ের হাওড়ার মত
মামলা পেলে পরে নাচে।
আমার এ জনমের মত সকল করণেতে চরণ ভেবে খেদে কুবির কহিছে ॥

৭২

অনুরাগে গাছ কাটলেই কি গাছি হওয়া যায়
ও যে খোলারসে বীজমরে না
গাছি রাগ ক'রে রস ঢেলে ফেলায় ॥
প্রেমের গাছি হয় যে জন
ও সে মন-দড়া দিয়ে গাছ করে বন্ধন।
তীক্ষ্ণ দায়ে
হৃদয় ভেদিয়ে
ফটিক রসের বহায় প্লাবন।
ও সে মনের সুখে রস জ্বালায়ে মিছরি বানায় ॥
অধম যাদুবিন্দু কয় কুবির গোঁসাই সে রস পায়।
আমার ভাঁড়ের খোলা রস যে
ওঠে গেঁজে—
ও সে রসে বীজ মরে না মিছরি হয় না
ঘুঁটতে ঘুঁটতে জীবন যায় ॥

৭৩

আমার মনের কারখানা দেখে হাসি পায়
একথা বলব কায়।
নিজে বোকা আনাড়ী হাটফেরা ভেড়ী

হাবাতে কিনেছে তাড়াতাড়ি তাকে সেই জুরীর ঘোড়া করতে চায় ॥
বোঁচা ছোঁচা যে কুকুর তাকে খাওয়ায় মতিচুর
তার পায়েতে গড়িয়ে দিলে রত্নময় নূপুর—
ও সে রত্ন ফেলে যত্ন করে পায়খানাতে বিষ্ঠা খায়।
আমার মন যে মাতালে গেছে গুরুনাম ভুলে
মাণিকমালা পরিয়ে ছিল বাঁদরের গলে—
ও যে উপ করে এক লম্ফ মেরে সেই নিধি ছিঁড়ে ফেলায় ॥
আমার মন মানে না বাগ করে কথায় কথায় রাগ
সোনার খাঁচায় পুষলেন বাছা ঠোঁটকাটা এক কাগ—
ও সে নাম শুনিলে ওঠে জ্বলে চিৎকারে মাথা ধরায় ॥
যাদুবিন্দু দাস গাধা ফেলে অমৃতসুধা তাব না বুঝে
বেড়ায় খুঁজে গোবরের গাদা—
গোঁসাই কুবির বলে প্রাণ হারালে গোবর গিলে সাঁঝবেলায় ॥

৭৪

যখন জাত বেহারার কাঁধে চড়ে ভাই রে তুমি শ্মশানবাসী হবে।
তোমার চোখের বারি ট্যাকের ঘড়ি ও রে ভাই শখের গাড়ী কোথায় রবে ॥
গায়ের জোরে বেড়াও তাল ঠুকে কথা কও ঝেঁকে ঝেঁকে
ইষ্ট দেখে দিষ্ট করে দেখ না চোখে।
পায়ে রূপোর খড়ম মেজাত (মেজাজ) গরম
ওরে ভাই আখেরের কাজ করবে কবে ॥

জিন ব্রাণ্ডি চলছে অবিশ্রাম কাবাব কাটলিস্ অনুপাম
উল্ট্‌ম বিয়ার সামকিন শেরী রস ধেনো তামাম—
খাসী মুর্গির হেমে হাঁসের ডিমে তুমি ভাই ঐ রসেতে রইলে ডুবে ॥
পেণ্টুল কামিজ কোট সোনার ছাতা টুপি ইস্টকিন জুতা
চুরুট মুখে মনের সুখে ইংরিজি কথা।
যেদিন চিত হবে এই ক্ষিতিতলে একেবারে লম্প-দম্প ফুরিয়ে যাবে ॥

আসল কাজে হয়ে গেল ফাঁক তোমার ঘোচে না দেমাক
চেয়ার পেড়ে সটকা ধরে খাও মিঠে তামাক।
যখন যমের দূতে আসবে নিতে সে সময় টাকাতে কি ঠেকো দেবে ॥

ধুলো কাদা লাগবে বলে গায় বসে আছো [illegible] তলায়
এবার সনে খুসীমনে আশপাশ [illegible] খলায়।
যাতে নিমন্ত্রণে [illegible] তুমি [illegible] পাতা কেন খাবে ॥

গোসাই কুবিরচাঁদের ভক্ত বাণী যাদুবিন্দু চালুনি
ছুঁচের কথা বলে [illegible] দিনরজনী
আমার শত [illegible] ছিল ভালো এই দুঃখ সব এসে পাল মধ্যরে ॥

৭৫

সুসংযোগ ভালো গৌরহরির নতুন বনে বর হল
আমরা সবাই মিলে যাব বলে দেখে আসি গে চল ॥
আটই চৈত্রমাস সকালের উল্লাস
শ্রীগৌরাঙ্গের নতুন দেহ হল প্রকাশ
আবার পূর্ণিমাতে চন্দ্রগ্রহণ স্বচক্ষে দেখা গেল।
সন তেরশ সাল তিন [illegible] আকাল
অনেক মানুষ সরে পড়ল ছিঁড়ে মায়াজাল
গৌর কাউকে হাসায় কাউকে কাঁদায় জানি তা চিরকাল ॥
দেখসে যায় [illegible] নবীন গোরা
ভুবনমোহন রূপে ধৈর্য না পাসরা
এবার শ্রীধাম নদেয় মনের সাধে অনেকলোক জুটেছিল ॥
মেয়াপুরের মাঠ স্বরূপগঞ্জের ঘাট
তেঘরি আর নদেপুরি হলো চাঁদের হাট
লোকের ঠাসাঠেসি ঘেঁষাঘেঁষি বেশার ভাগ বাঙ্গাল এল ॥
ভাবছি তাই মনে শ্রীবাস অঙ্গনে
আটটি গণ্ডা পয়সা লাগে ঠাকুর দরশনে
তারা পয়সার তরে ঠাকুর গড়ে রেখেছে অনেকগুলো ॥
দেখ ভাই বুঝে নদীয়ার মাঝে
অনেক লোকের ঘরের ভিতর ঠাকুর বিরাজে
যাদের নাইকো কড়ি ঠাকুরবাড়ী কিরূপেতে যায় বল ॥
পয়সাকড়ি নাই চৈতন্যগোঁসাই দীনের অধীন যাদুবিন্দু ভাবছে বসে তাই
পাবে কোন্ গুণেতে এ হাবাতে কুবিরের চরণধুলো ॥

জয় চরণচন্দ্র জয় তব ভক্তবৃন্দগণ
আসি মম হৃদ-আসনে দেও হে একবার দরশন ॥
জয় জয় চন্দ্রতিলক নাম নিলে হয় অঙ্গ পুলক
রবে না কোন দুখ শোক বল মন চন্দ্ররতন ॥
মন তোমারে বলছি রে ঠিক মাথাতে হয়োনা বেঠিক
বল জয় চন্দ্রফটিক জুড়াবে তাপিত জীবন ॥
জয় রামভদ্রচাঁদ প্রজ্ঞার বীরভদ্রচাঁদ লক্ষণ তেনার
মনভদ্র প্রাণভদ্র আমার সাক্ষাৎ ভরত শত্রুঘ্ন ॥
প্রধান ভক্ত গোঁসাই কুবির মধ্যমে রামচন্দ্র গভীর
তৃতীয়তে প্রহ্লাদ সুধীর কনিষ্ঠ গৌরমোহন ॥
চরণভক্ত অনেক ফকির দেশে দেশে করছে জাহির
হিন্দুর গুরু যবনের পীর দয়াময় পতিতপাবন ॥
চরণচাঁদের ঘর সাবধানী আকাশে পাতালে ধ্বনি
গুরু সত্য সত্যবাণী সত্যকে করে সাধন ॥
কুবিরচাঁদের তেমন বেটা যাদুবিন্দু পাকা ঢেঁটা
ভক্তিতত্ত্ব নাই এক ফোঁটা কোন গুণে পাবে চরণ ॥

৭৭

বিয়ের কথাতে মাথা যায় ঘুরে।
শুনে পণাপণ কণ্ঠেতে আসে জীবন
হয় সোনার সঙ্গে মেয়ে ওজন এতো টাকা কার ঘরে ॥
তিনশো চারশো পাঁচশো মরে কনেকর্তা মাথা নাড়ে
পাতাল পানে মুখ সে করে গালাকাল বাত ঝাড়ে।
ঘাড় তুলে বোল বলে না কো দয়ামনা পাষাণ বুকে
বরের বাবা দেখে ভেকো ভয়েতে কেঁপে মরে ॥
গোয়ালা চাষী সদ্‌গোপে পণ শুনে পেট উঠছে কেঁপে
কতজনা নবদ্বীপে ভেক লয়ে কৌপিন পরে
ঘরেতে ঘটে না বিয়ে পাঁচশো ছশোয় দেয় না মেয়ে।

চাষ করে আর রেঁধে খেয়ে কতদিন বাঁচতে পারে ॥
মাছধরা কৈবর্ত দাসে মেয়ে হলে বেড়ায় হেসে
চারশো টাকা নেবো ঠুসে জামাই বেটার কান ধরে।
ষষ্ঠী গাছে বাঁধবো ঢেলা ছোকড়ী মেয়ে হোক দুবেলা
ষোলো টাকা বেচবো তোলা কোরবো না আর জাল ঘাড়ে।
চাষজীবী কৈবর্ত যারা পণ হয়েছে কাঠা পোরা
ঘটি-বাটি বেচে তারা বেড়াচ্ছে মেয়ের তরে।
কানা কুঁজো খেঁদা বোঁচা পোটাপড়া কালো পেঁচা
নাই কিছু তার বাছাগোছা সোনাতে ঝলক মারে ॥
কামার কুমোর তামলি তেলি ময়রা বেনে নাপিত মালী
পণ শুনে হল কালি কেউ সুখী নাই সংসারে।
সেকরা ছুতোর কলু ধোপা পণ শুনে হয় দফারফা
কেউ বলে ভাই হবে হেঁপা ঘ্যাট করে নাও পেট ভরে ॥
ছেত্রি খেত্রি কায়স্থরা কুলীন হলেই টাকার তোড়া
অকুলের নাই কুল কিনারা ভাসিছে অকুল নীরে
আইবুড়ো নাম ঘুচবে কিসে পণ শুনে গিয়েছ বসে
কেউ বলে ভাই সোজাবাসে বিয়ের দিন যাবো চলো ॥
যুগী তাঁতি খুশীমনে বিয়ে করে অল্প পণে
খাসা মেয়ে ঘরে আনে সাধ্যমত অলঙ্কারে।
যবনে পণ নিলে পরে দেয় তাকে দোজক মাঝারে
পাকানাপাক। কলার (কলাব) জোরে খোস হয়ে যায় অন্তরে ॥
সোনার বেনের মেয়ে হ'লে গিল্যে আঁটি লাগে গলে
সোনার গাড়ু ঘড়া দিলে জামাই বসে না ফিরে।
কুলীন বামুন মেয়ের দায়ে ভাবনাতে ঘুম হয় না শুয়ে
বুড়ো বরকে বলে কয়ে দিতে হয় চরণ ধরে ॥
বাগদী দুলে চাঁড়াল মুচি বাউরা হাড়ির বিয়ের লুচি
নাইকো কারুর বাঁচাবাঁচি পড়েছে বিষম ফেরে
কপালি আর তেওর মালো পণের দফায় আছে ভালো
কুবিরচাঁদের চরণ-ধুলোয় যাদুবিন্দু যায় তরে ॥

বৈষ্ণব-অনুষঙ্গ

৭৮

দয়াল গৌর হে তোমা বই কেহ নাই।
আমি খেতে শুতে পথে যেতে তোমার গুণ গাই ॥
সহায় ও সম্পত্তি তুমি
আমার বিভোর পরমার্থ তুমি
আগম্য নিগম্য স্থান আছে তোমার ঠাঁই ॥

তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত্য তোমার নাম আদিধাম যে পদার্থ
তুমি দয়াল সর্বতত্ত্বসার
দিও রাঙ্গা চরণে ঠাঁই ।।

তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি যীশু তুমি কৃষ্ণ
আমার মরণকালে চরণ দিও আর কিছু না চাই ।।

আমি সবধামে তোমায়ে হেরি
কুবির কয় চরণ ধরি আমার ঘুচাও আশাবাই ।।

৭৯

আমি এই মান ত্যেজে কুঞ্জেতে থাকবো আর কি ধন লয়ে।
আমি মান-প্রতিমা পূজা করি মানকে মন প্রাণ দিয়ে ।।
আপন মান রাখি আপনার ঠাঁয়ে ।।
ভাব-চিনির নৈবেদ্য দিব বাদ্য-ভাণ্ড বাজাইয়ে।
আর মিষ্টান্ন পক্কান্ন অন্নভোগ দিব মানালয়ে ।।
মানের মান বাড়াব মানের শ্রীচরণ আরাধিয়ে।
হবে মান সাপেক্ষে জীবন রক্ষে করিবেন বিপদ সময়ে ।।
মান-প্রতিমা পূজার ঘটা করবো কুঞ্জে বসিয়ে
দিব বিচ্ছেদের-নরবলি মানের জ্বালা জুড়াইয়ে ।।

নানা পুষ্প মান-তুলসী দিব মান-পদদ্বয়ে।
বসে গুরু মন্ত্র জপ করিবে সাধনে সিদ্ধ হয়ে ॥
মানকে রাখবো সিংহাসনে হৃদিপদ্মে বসাইয়ে।
কুবির বলে বাঞ্ছা পুরাইব শ্রীচরণ আশ্রয় হয়ে ॥

৮০

চেয়ে দেখতে পাই গৌরময় সকলি। আমার চাঁদ গৌর বসন গৌর ভূষণ
গৌর নয়নপুতলি। চাঁদ গৌর আমার দেহের জীবন গৌর যৌবনের ডালি ॥
গৌর আমার নয়নতারা গৌরচন্দ্র গগনচন্দ্র চাঁদে চাঁদ ভরা।
গৌর মনোহরারূপ হেরে ভুলি। চাঁদ গৌর আমার জপমালা গৌর গলার মাদুলি ॥
নয়নের অঞ্জন গৌর। গৌর নলক উলকি তিলক চন্দ্রহার। গৌর কঙ্কন গৌর
গৌর চাঁপাকলি। আমি গৌর গয়না পরে ধীরে ধীরে পা ফেলি ॥
গৌর আমার শংখ শাড়া। গৌর মালা পুঁইচে পলা চুল বাঁধা দড়ি। দুই
হাতের চুড়ি গৌর কাঁচলি। চাঁদ গৌর আমার স্বর্ণ সিঁথি মুক্তপাতি ঝলমলি ॥
গৌর চাবকি কোমরবেড়া হায় কি শোভা গৌর চাঁদচূড়া আমার
বুকজোড়া গৌর পাঁচনলি। আমি আপন অঙ্গ নিরখিয়ে ঘুচাই সব
মনের কালি।
সকল অঙ্গে গৌর হরি। করে নিষ্ঠে হেরি পৃষ্ঠে গৌরমাধুরী।
গৌরনাম করি গায়ে নামাবলি।
আমার অন্তরে বাহিরে গৌর হৃদয়ে গৌরমণ্ডলী ॥
বিরাজে ব্রহ্মাণ্ড গৌর। ফলে গৌর ফুলে গৌর বৃক্ষেতে গৌর।
জীবাত্মা গৌর যথার্থ বলি।
কুবির বলে আমি কি সাধনে পাব সেই চরণধূলি ॥

৮১

গৌর ধরব গো পেতে প্রেমসন্ধি-কল।
হৃদয়ে রাখব বেঁধে প্রেমের ফাঁদে
করে দার্ঢ্য ভক্তি বল।
দিব মনের সাধে রাঙা পদে মন তুলসী গঙ্গাজল ॥
গৌরবে গৌরাঙ্গী হবো। গৌর পাবো সাধ পুরাবো আনন্দে রবো।

আদর বাড়াবো আহ্লাদে টলমল। গৌর কল্পবৃক্ষ তলে বসি পেড়ে খাবো
প্রাপ্তি ফল ॥

কুচ গিরি চাপিয়ে বুকে বাঁধবো গো তায় ভুজলতায় মনের কৌতুকে।
আনন্দ সুখে করিব চঞ্চল। মনের সাধ পুরাবো আলিঙ্গনে প্রেমে করব টলাটল ॥
যত্ন করে গৌরচাঁদে মন দিব তায় প্রাণ দিব তায় ভুলাব কেঁদে।
চাঁদে চাঁদ বেঁধে রাখব অনর্গল। হৃদি-সিংহাসনে রেখে পদে দিব পদ্ম শতদল।
প্রাণ হয়েছে গৌরগত বলতে নারি রূপমাধুরী জনমের মত
হয়ে আশ্রিত ভাবেতে বিহ্বল।
কুবির বলে থাকব চরণতলে তাপিত প্রাণ হবে শীতল ॥

৮১

তাইতো গৌর পায় না ঠাওর পাগল হয়ে বেড়ায় ছুটে।
রাই ঠেঁটী আবাগের বেটী দিয়েছে কি প্রেমের ছিটে।
রাধা রাধা রাধা বলে ভেসে যায় নয়ন জলে
খেলায় ভুলে পড়ে ঢুলে প্রেমের রসি গেছে কেটে ॥

উপাসনার তত্ত্ব পেয়ে মত্ত সোনার গৌর হয়ে
প্রাপ্তিবস্তু হারায় নিকটে।
দীনের অধীন মানের দায়ে খেলাতে উন্মত্ত হরিনামের গুণ গেয়ে
রাধা নাম ভুলেছে বটে।
গৌরাঙ্গ ঘুমায়ে থেকে নিদ্রাবেশে রাইকে দেখে
থেকে থেকে চমকিয়ে উঠে ॥

অচৈতন্য রাধার শোকে কেঁদে বেড়ায় মনের দুঃখে
রা রা বলিতে ধা ধা বেরোয় না আত্মময়ী নাইক ঘটে ॥
হা রাধা যে রাধা রাধা বাঁশিতে জপিত সদা
সে বাঁশি ত্যজে নিষ্কপটে।
এখন বলেন হরি হরি কি ধন হরিবেন হরি
কুবির বলে শুধুই হরি হয়ে রাই চরণের মুটে ॥

৮৩

নাগর কালাচাঁদ হে
তোমায় লুকিয়ে থোবো হৃদয় মন্দিরে ।
জায়গা নাই রাখি কোথায়
তোমায় মাথায় থ্‌ুলে উকুনে খায়
মাটিতে রাখলে পরে কাকে ধ'রে ঠুকরে মারে ॥
চিল বেড়াচ্ছে পাশে পাশে
তোমায় ছোঁ মেরে নিয়ে বসবে ডালে
খাবে দুই চক্ষু খুলে মনের দুঃখ বলবো কারে ॥
তোমার সকল মধু নিঙরে লবে
বিগড়ে দেবে একেবারে ॥
চালের বাতায় রাখি যদি
হয় চামচিকে টিকটিকি বাদী
চেটে খায় রত্ননিধি চোখের কাজল চুরি করে ॥
তোমায় বাঁশবাগানে রাখলে পরে
মশায় খেয়ে অঙ্গ জারে ।
মনের জালায় যাবো কোথা
সব প্রতিবেশীর নাই মমতা দিয়ে অন্তরে ব্যথা
কথায় কথায় জ্বালিয়ে মারে ॥
আমি মন মরমে মরে থাকি
কুবির বলে চরণ ধরে ॥

৮৪

চাঁদ গৌর হে আজ দেখবো তোমার
বিচার কেমন ।
আমি ধরেছি আর ছাড়বো কেন
আমার মন প্রাণ নয়ন আছে মিলন ॥
তুমি দুঃখ দিলে বুক পেতে লব
আমার যতক্ষণ আছে জীবন ॥

ছেঁড়া কাঁথা নিলাম গলে
জাত দিলাম পেট ভরবে ব'লে
কোথায় যাবে আমায় ফেলে।
আমি দেখবো তোমার সীমার মুড়ো
শ্রীচরণ ক'রে সাধন ।।

দুখের বোঝা আমার মাথায়
বইতে নারি ঘাড় ভেঙে যায়
তবু আমি ভুলবো না তোমায়।
আমার নাই তাতে ভয় পাষাণ হৃদয়
করবো না নড়ন চড়ন ।।

তোমার প্রেমে যে হয় মাতাল
কর তারে হাল যে বেহাল
তার ভিটেতে চড়াও ঘুঘুর পাল।
জলপড়ার ভূত নয়কো কুবির
বাঞ্ছা কেবল শ্রীচরণ ।।

৮৫

আর কতদিন করবে লুকোচুরি।
ঘরের থেকে বাহিরে এসো রূপদরশন করি ।।
ঘরের কোণে কারখানা করো সদা আনাগোনা
কোথা স্থিতি বাসমখানা বুঝতে তো না পারি ।।
অঙ্গে অঙ্গ লুকাইয়ে রূপেতে রূপ মিশাইয়ে
রয়েছ এক আত্মা হয়ে দুগ্ধে যেমন বারি।
দাও হে দেখা প্রাণসখা জন্ম সফল করি ।।
বসে রত্নসিংহাসনে কথা কও তা সবাই শোনে
দেখতে পাইনে দুনয়নে সদা ঝরে বারি ।।
ছায়াবাজী যে প্রকারে কাপড়ের কাণ্ডারি করে
পুতুল নাচায় কলের তারে সকলি চাতুরি।
তোমার তেমনি ধারা বাজী করা লুকিবিষ্ণে ভারী

কপাট দিয়ে নবদ্বারে বিরাজ করছ তার মাঝারে
দেখতে পাইনে নেহার করে এই দুখেতে মরি ॥
সাকারা কি নিরাকারা পুরুষ কি হে নারী
মেঘাশ্রিত সৌদামিনী গর্জনে হয় দীপ্ত জানি
উদয়চন্দ্র চূড়ামণি দিবস শর্বরী।
তুমি উদয় হওনা সাধ পুরাও না কুবির বলে চরণ ধরি ॥

৮৬

তোরা দেখ সে গৌরভজা সাধুর হাটে যাচ্ছে।
কেরো করোয়া মালা কাঁধে ঝোলা আনন্দে গৌর গুণ গাচ্ছে
তারা কটিতটে কোপনী এঁটে প্রেম ভরে নাচছে ॥

মহা অনুরাগী মেয়ে রূপো সোনা তেয়াগিয়ে
মোটা কাঁথা তাপ্পি দিয়ে গায়ে
তারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে সাধু সেবা দিচ্ছে ॥

কোন সাধু মণ্ডল হারি তিলক সেবায় শোভা ভাবি
নারী দেখে বলে হরি হরি
তাদের আনো শস্য নিরামিত্য খাতপ অন্ন খাচ্ছে ॥

কোন সাধু নবকেশি দশ বারোজন সেবাদাসী
ভাবে ভোর আছে দিবানিশি
তারা গাছের তলে গৌর বলে গাঁজার বোজা খাচ্ছে ॥

গৌরপ্রেমে যে ডুবিবে মাতাজী বাবাজী হবে
জাতে কুলে তেঁতুল গুলে দেবে
পাবে ভিক্ষাতে চাল কারানো ডাল আহ্লাদে লাফ মারছে ॥

গোঁসাই কুবিরচাঁদের মুটে যাদুবিন্দু ভদরকুটে
হতভাগা যায় না সাধুর হাটে
সে ফ্যানেভাতে পায়না খেতে পায়েস অন্ন চাচ্ছে ॥

নিশিভোরে বাঁশি কে বাজায় কুঞ্জের দ্বারে
ললিতে জেনে আয় ত্বরায় ক'রে ।
যদি হয় সে চিকনকাল, বলবি কালা কান
কালা মুখ ঢেকে কাল থাক্ ঘরে ।
আমি নিশি জেগে মনবিয়োগে বসে আছি মান ভরে ॥
শুনবো না আর শ্যামের বাঁশি সাধ করে হবো না দুষি
ভালো জিনিষ হলে বাসী নেয়না লোকে চক্ষে হেরে ·
ও তার গন্ধ ছোটে বেগু ঘটে পচ. ক্ষীর খেলে পরে ॥
কৃষ্ণতে কি মিষ্ট আছে একেবারে পচে গেছে
কেনে মিছে আমার কাছে বেড়াতেছে ঘুরে ঘুরে ।
আমি পচা প্রেম করব না সখী প্রাণে যদি যাই মরে ।
কাল যেখানে ছিলে কালো সে রমণী রসিক ভালো
সর মোহে ননী তুলিল ঘোল ফেলে দিয়েছে দূরে
আমি টোকো ঘোল নেব না সখী টাটকা মাখনের দরে ॥
কালোভ্রমর গোবর খেলে থাকে গুবরেপোকার দলে
কোমদিনী (কুমুদিনী) কোনকালে বসিক বলে চায় না ফিরে
গোঁসাই কুবির বলে বিন্দুযাদু থাক যুগলচরণ ধরে ॥

৮৮

ও কালোসোনা
যাও চলে বাই কুঞ্জে এসো না
তুমি করে রঙ্গ হয়ে ত্রিভঙ্গ
শুকনো হাসি হেসো না ।
এখন নতুন প্রেমে মত্ত হয়ে
রাধাবে ভালোবেসো না ॥
কতজন ভূমণ্ডলে দুগ্ধ ঘি গন্ধ বলে
দূর করে দেয় সে ফেলে
তারে কাছেতে ঘেঁষে না ।

পেলে শাকের গোড়া ছেঁচকি পোড়া
তুষ্ট হয় তার রসনা ॥
বলে যাই মোটামুটি   শ্যাম তুমি তারই জুটি
খেয়ে সেই আমড়ার আঁটি
রাই আম্রপাকা মধুমাখা
তার প্রেমেতে মেশো না ॥

কানা বক শুকনো নদী মিলন করেছে বিধি
এখন আর গুণনিধি
রাধার দ্বারে বসো না।
গোঁসাই কুবিরচাঁদের রাঙাচরণ
যাদুবিন্দুর নিশেনা ॥

৮৯

আমি বুঝলাম মনে গৌর সনে পিরীত করা হয়নি।
ও সেই গৌর নামে গৌরপ্রেমে আমি তো মোহিত হয়ে রইনি
সরল মনে সাধুর সনে আমি তো গৌরকথা কই নি ॥

গৌর ভাবে ভাবি হতে পারলাম না তো কোনমতে
ঘুরে ঘুরে বেড়াই পথে পথে—
আমার মনের মলা বিষম ঘোলা জ্ঞান-সাবানে ধুইনি ॥

সুখের আশা ষোলআনা ক্ষীর নবনী মাখন খানা
খাবার তরে লোভ করে রসনা।
আমি আপ্তসুখী বলবো বা কী এক রতি দুখ সইনি ॥

যাদের আছে নিষ্ঠা রতি দূর করেছে কুল জাতি
গৌর পতি গৌর মুক্তি গতি।
তারা গৌর পাবে সাধ পুরাবে সামান্য সুখ নেয়নি ॥

যাদুবিন্দু উরোনপেকে কুবির নাম বলে না মুখে
ব'সে ব'সে গুরুক তামাক ফোঁকে
গোঁসাই কুবিরচাঁদের যুগলচরণ হৃদ-মাঝারে থোয় নি ॥

৯০

গৌর তোর পিরীতে মজে আমার জন্ম গেলো কানতে
আমার হাতে খোলা গাছের তলা এখন আর পারো নাকে চিনতে।
তোমায় ডাকতে ডাকতে দিন ফুরালো পাওনা কানে শুনতে ॥

সাধু মহাজনে বলে কতো পাপী তরাইলে
দয়াল গৌর ব্যক্ত ভূমণ্ডলে—
তুমি আমায় নিদয় হওনা সদয় পেরেছি তা জানতে ॥

ভব-ঘোরে বেড়াই ঘুরে সুখ পেলাম না তিলের তরে
মনের কথা বলবো কি আর তোরে।
আমি পেলাম না প্রেম-ভক্তি-লতায় তোর দুটি পায় বানতে।

বহুদিন তোর দোহাই দিলাম
জাতি কুলে মাথা খেলাম লাভের মধ্যে কলঙ্কিনী হলাম
আমি গৌর-ভজায় পাচ্ছি সাজা দুখের বোঝা টানতে ॥

কাঙাল যাদুবিন্দুর কথা গোঁসাই কুবির রইলেন কোথা
আমার ভজনসাধন হল বৃথা
আমি গুরুবাক্য অন্ধ করে পারলাম না তা মানতে ॥

নির্দেশিকা